

বাড়গ্রাম-গ্রন্থপ্রকাশ-ভবনিলের অর্ধে মুদ্রিত

ভূতোম প্যাঁচার নক্শা

ও অন্যান্য সমাজচিত্র

সম্পাদক

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আপার পীরকুলার রোড

কলিকাতা-৬

ହତୋମ ପ୍ୟାଠାର ନକ୍ଷା

ଓ ଅନ୍ତ୍ୟାନ୍ତ ସମାଜ-ଚିନ୍ତା

হাতাম প্যাটার নকশা, সমাজ কুটির
পল্লীগ্রামস্থ বারুদের দুর্গেংসব

সম্পাদক :

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কলিকাতা

প্রকাশক
ত্ৰিগনংকুমার ভট্ট
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ অপর সাকুলার রোড, কলিকাতা

৮৪.২
২৪.৩।১

নূতন সংস্করণ ... বৈশাখ ১৩৫৫

পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৩৬০

মূল্য ~~২৪.৩।১~~ ১০.০০

~~ত্ৰিগনংকুমার ভট্ট~~
শক্তি প্রেস, ২৭৩বি ব্রিটিশ ট্রাট, কলিকাতা।

ভূমিকা

১

‘হতোম প্যাঁচার নকশা’

বাংলা-সাহিত্যে ব্যঙ্গবিজ্ঞপ ও হাস্যরসপূর্ণ সামাজিক চিত্র অঙ্কনের একটা ধারা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। গল্পে তাহার প্রথম প্রকাশ—১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক সমাচারপত্র ‘সমাচার দর্পণে’ প্রকাশিত “বাবুর উপাখ্যানে” (‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা,’ ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। এই সময় হইতেই সামাজিক চিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ‘সমাচার চন্দ্রিকা’-সম্পাদক তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই শ্রেণীর রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক; তাঁহার রচিত ‘কলিকাতা কমলালয়’ (ইং ১৮২৩) ও ‘নববাবুলীলাস’ (ইং ১৮২৫) সে যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বাংলা-গল্পে অনেকগুলি সামাজিক চিত্র জন্মলাভ করে; ইহার কয়েকখানির নাম উল্লেখ করিতেছি :—

‘আলালের ঘরের ছলান’	... টেকচাঁদ ঠাকুর	... ইং ১৮৫৮
	(প্যারীচাঁদ মিত্র)	
‘হতোম প্যাঁচার নকশা’	... হতোম প্যাঁচা	... ১৮৬২
	(কালীপ্রসন্ন সিংহ)	
‘আপনার মুখ আপনি দেখ’	... ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	... ১৮৬৩
‘কাকভূষুড়ীর কাহিনী’	... ক্ষেত্রমোহন ঘোষ	... ১৮৬৫
‘সমাজ কুচিত্র’	... নিশাচর	... ১৮৭৫
	(ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)	
‘আস্মানের নকশা—		
পল্লীগামস্ব বাবুদের দুর্গোৎসব’	... শ্রীযুত দশ অবতারের এক অবতার	১৮৬৮, ১৬ ডিসেম্বর
	(রামসর্কস্ব বিজ্ঞানভূষণ)	
‘কলিকাতার হুকোচুরি’	... টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার	... ১৮৬৯, ২৩ এপ্রিল
	(প্যারীচাঁদের মধ্যম পুত্র, চুনিলাল মিত্র)	
‘সচিত্র গুলজারনগর’*	... তাঁড়	... ১৮৭১
‘আনন্দ-লহরী’। (বিকল্পে) সমাজ সংস্কার এ. সি. লা (অবতারচন্দ্র লাহা)		১৮৮৯, ২৮ ডিসেম্বর

* “বিজ্ঞাপন।—সচিত্র গুলজার নগর। তাঁড় প্রণীত। হাস্যরসের আশ্চর্য উপাখ্যান। যাহাতে কলিকাতা নগরের কয়েক বৎসর পূর্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম ও শাসন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম বাক্যের মূল্য দা. মাত্র। সকল পুস্তকালয়ে ও নং ৪৪ মালিক বস্তুর খাট স্ট্রাট ভবনে তত্ত্ব করিবেন।”—‘মূলত সমাচার,’ ২২ কার্তিক ১২৭৮।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ এই সকল সামাজিক চিত্রের কোন কোনটি পুনর্মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ের প্রামাণিক ও সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; এক্ষণে ‘হতোম প্যাঁচার নকশা’ প্রচারিত হইল।

ইতিহাস : ১৭৮৩ শকে (ইং ১৮৬২) ‘হতোম প্যাঁচার নকশা’ প্রথমে খণ্ডঃ প্রচারিত হয়। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড—“চড়ক” (পৃ. ১৬) দেখিয়াছি; উহার আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

হতোম প্যাঁচার কলিকাতার নকশা। চড়ক। প্রথম খণ্ড। “উৎপত্তিতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা। কালো হয়ং নিরবধির্নিপুলা চ পৃথ্বী ॥” ভবভূতি। আশ্মান।

রামপ্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হকো রাম বসুর ইষ্টীট। মূল্য পয়শায় দুখানা।

পুস্তিকায় ভূমিকা-স্বরূপ এই অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন। হতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নকশা প্রস্তুত করবেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছু দিন পরে বুজ্জতে পারবেন। হতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগ্য হতোমকে দিনের ব্যালা দেখতে পেয়ে কাক ও ফরাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোট ও বাঁস দিয়ে, ধোঁচা খুঁচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি দিকার কি ধন্তবাদ হতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।

এই পুস্তিকায় দুইখানি রেখাচিত্র আছে। উহা বর্তমান সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইল।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধ্বে ‘হতোম প্যাঁচার নকশা,’ প্রথম ভাগ (পৃ. ৬+১৭৬) প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

Sketches by Hootum illustrative of Every Day Life and Every Day People.
Vol. I “By heaven, and not a master thought,” “Mislike me not for my complexion.”
Shakespeare. Calcutta, Bose and Company, Printers & Publishers 1862.

হতোম প্যাঁচার নকশা। (প্রবন্ধ কল্পনা।) প্রথম ভাগ। স্বর্গাদিদমুপ্রাপ্তং নাচার্য্য মুখ কন্দরাং। প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্ত্বস্তান্নন স্তথা। চিত্তবুদ্ধেচ দস্তায়ে প্রতিভা পরিমার্জিতা। কলিকাতা। রাম প্রেস বহু কোম্পানী কর্তৃক প্রচারিত। দরজী পাড়া। ১৭৮৪।

‘হতোম প্যাঁচার নকশা’র দ্বিতীয় ভাগ ১৮৬৩ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮৬৪ সনে ১ম সংস্করণের দুই ভাগ ‘হতোম’ একত্রে বাঁধাইয়া (পৃ. ২+১৮০+৫৪) প্রচারিত হইয়াছিল।

মৌলিকতা : বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ‘আলালের ঘরের দুলাল’কে বিশেষ গৌরবের আসন দিয়াছিলেন এবং রুচি-বিচার করিয়া ‘হতোম প্যাঁচার নকশা’র নিন্দা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রতিপাত্ত এই ছিল যে, ‘আলালের ঘরের দুলাল’ই

সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা সংস্কৃতের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তিকার্য করিয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ ‘আলালে’র লেখক প্রচলিত লেখ্য রীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, কথ্য ভাষা প্রয়োগের দিকে একটা বোঁক তাঁহার ছিল এই মাত্র। আমরা এই ভাষার প্রথম সার্থক প্রয়োগ দেখিতে পাই হতোমের ‘নকশা’র। এই প্রয়োগ এমনই যথাযথ যে, আজও পর্যন্ত কোথায়ও তাঁহার পরিবর্তন সম্ভবে না।

সামাজিক চিত্র হিসাবেও ‘নকশা’র বৈশিষ্ট্য অসাধারণ। ‘আলালে’র লেখক টেকচাঁদ বহু ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন, অর্থাৎ গল্প লিখিয়াছিলেন; তাই তিনি আধুনিক উপন্যাসের প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃকও কীর্তিত হইয়াছিলেন। হতোম সে কালের সমাজের নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা ফটোগ্রাফধর্মী। গল্প তাঁহার নিকট গোপ, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার সামাজিক রূপবর্ণন। তাঁহার রচনাকৌশল এমনই অপূর্ব যে, পড়িতে পড়িতে সেই কলিকাতাকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। টেকচাঁদ লিখিয়াছিলেন গল্প, হতোম লিখিয়াছিলেন নকশা। এই নকশা-রচনায় হতোম প্রথম এবং প্রধান।

ভাষা ও ভঙ্গীর দিক্ দিয়া হতোম আজও পর্যন্ত অনুরক্ত হইয়া আসিতেছেন, অর্থাৎ তিনি একটি ধারার প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, যাচা আজিও প্রবহমান। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বিশ্বত হইলে টেকচাঁদও বিশ্বত হইবেন, কিন্তু চলতি ভাষা ও সামাজিক নকশা যত দিন প্রচলিত থাকিবে, তত দিন হতোমের মৃত্যু নাই।

সমসাময়িকের দৃষ্টিতে ‘হতোম’ : সাময়িক-পত্র ও পুস্তক-পুস্তকায় প্রকাশিত আলোচনা ও প্রশস্তির মধ্যে কয়েকটি আমরা নিয়ে মুদ্রিত করিলাম।

পণ্ডিত হারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ তৎসম্পাদিত ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রে (২০ অক্টোবর ১৮৬২) লেখেন :—“হীহাতে আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।”

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর-বৎসর সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিমত প্রকাশ করেন :—

Kali Prasunno Singh, or 'Hutam', was one of the most successful writers in the style first introduced by Tekchand. In early youth he made several translations from the Sanskrit, and in particular he is the author of a translation of the *Mahabharata*, which may be regarded as the greatest literary work of his age. But it is not as a translator that he is known to fame, and familiar to almost every Bengali, but as the author of *Hutam Pyancho*, a collection of sketches of city-life, something, after the manner of Dickens' *Sketches by Boz*, in which the follies and peculiarities of all classes, and not seldom of men actually living, are described in racy vigorous language, not seldom disfigured by obscenity." ("Bengali Literature": *The Calcutta Review* for 1871.)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ‘বঙ্গ-ভাষার লেখক’ (১৩১১) গ্রন্থে মুদ্রিত “পিতা-পুত্র” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

পঠদশায় আর একখানি পুস্তকে আমাকে আলোড়িত করিয়াছিল। আনন্দও পাইয়াছিলাম। সেখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের হতোম প্যাঁচার নকশা। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ও অনেক স্থানে নকশা বা ফটো তুলিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লী-সমাজের চিত্র যেমন পরিশুদ্ধ হইয়াছে, কলিকাতার অলি-গলির নকশা তেমন ফুটন্ত হয়

নাই। তেপায়্যা উচ্চ টুলের উপর কাচের বাস বসাইয়া, দু পয়সা দাও, দু চক্ষু দিয়া দেখ বলিয়া যেমন মেলার মধ্যে নানাবিধ ফটো দেখায়, অপূর্ণ ভাষার গাঁথুনিতে সেইরূপে কলিকাতার নানাবিধ নকশা তুলিয়া প্যাঁচা দেখাইতে লাগিল ও ফুলো গাল টিপিয়া বলিতে লাগিল, 'ইয়ে রাজবাড়ীকি নকশা, বড় মজাদার হায়, ইয়ে শোভাবাজারকি গাজন, বড় তামাশা হায়, ইয়ে হাইকোটকা বিচার, আঙ্গব তাজ্জব হায়।' আমরা তখন নিতান্ত বালক, তাহার ভাষার ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গিতে, একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। মনে করিলাম, আমাদের বাজালা ভাষাতে বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। মনে করিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সর্বোত্তম রঙ্গময়ী। (পৃ. ৫২৮)

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কালীপ্রসঙ্গের সমবয়স্ক ছিলেন; ১৫-১৬ বৎসর বয়সে কালীপ্রসঙ্গের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তিনি কালীপ্রসঙ্গ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন এবং সভায় বাংলা প্রবন্ধাদিও পাঠ করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় 'হতোম প্যাঁচার নকশা' সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

হতোম প্যাঁচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাস-রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পাথুরিয়াঘাটার কোনও ধনী প্রবীণ বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসঙ্গের বিজ্ঞপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল; নক্সায় পাথুরিয়াঘাটা 'হুড়িঘাটা'র রূপান্তরিত হইল। মাহেশে রথের সময় বাচখেলা, মেয়ে মানুষ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশগোপাল দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি তিনি নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। ইংরাজেরা ঠাট্টাপ্রসঙ্গে যাহাকে 'Arry' বলে, অর্থাৎ যে সকল সামান্ত লোক ইয়ার্কির উপলক্ষে বেইন্টার হইয়া নানাপ্রকার বাদরামি করিয়া থাকে, সম্ভায় আমোদ করিবার চেষ্টা করে, নক্সায় সেই প্রকৃতির লোকদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বঙ্গসমাজে এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে।

Satire হিসাবে হতোম প্যাঁচা যে খুব effective হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। But as an early specimen of that type of writing it deserves not to be forgotten; এবং রুচি হিসাবে হতোম দীক্ষার গুণের ও 'গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য'র লেখার চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৮২-৯০)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৮৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "বাজালা সাহিত্য" প্রবন্ধে 'হতোম প্যাঁচার নকশা' সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

হতোম পেঁচাও এই পরিবর্তন সম্বন্ধে একটি মহার্ঘ রত্ন; ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সূক্ষ্ম চিত্র আছে, হতোম হতোমীয় ভাষার প্রবর্তক এবং বঙ্গসংখ্যক হতোমী পুস্তকের আদিপুরুষ। বোধ হয়, মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরোস্থানীয়।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্য-রসিক প্রথম চৌধুরীর অভিমতও উদ্ধৃত করিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন :—

‘হতোম প্যাঁচার নকশা’...হচ্ছে তখনকার সমাজের আগাগোড়া বৈজ্ঞানিক এবং আর্থ চমৎকার লেখা। এ বই সে কালের কলিকাতা সহরের চকুটি ভাষায় লেখা। এ লোক চতুর এই বাজলা ভাষায় আর বিত্তীয় নেই।...যারা এ পুস্তক পড়েন নি, তাঁদের জা পড়তে অস্বস্তি করি। (১৯৪৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ‘বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,’ পৃ. ১২)

গ্রন্থকারের জীবনী : ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার এক ধনী জমিদার-ঘংশে কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ জুলাই, মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে, যখন তিনি পরলোকগমন করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন ‘ললিতা ও মানসে’র কাব্যবিলাস এবং বৈদেশিক বাণীসাধনা ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক ‘দুর্গেশনন্দিনী,’ ‘কপালকুণ্ডলা’ ও ‘মৃণালিনী’ রচনা শেষ করিয়াছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেই স্বল্পকালের জীবনেই সমাজে, রাষ্ট্রে এবং সাহিত্যে এমন সকল কীর্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহার আলোচনা ও বিবৃতি এ-বুগেও আমাদের অপরিণীম বিশ্বাসের উদ্বোধক করে। তাঁহার বিচিত্র জীবনকথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা”র প্রথম গ্রন্থ ‘কালীপ্রসন্ন সিংহে’ বিবৃত হইয়াছে।

বর্তমান সংস্করণের পাঠ : গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় ‘হতোম প্যাঁচার নকশা,’ ১ম ভাগের আর একটি সংস্করণ হয়—১৫ অক্টোবর ১৮৬৮ তারিখে। সঙ্গে সঙ্গে ১ম ভাগ (২২-সং) ও ২য় ভাগ একত্রে বাঁধাইয়া (পৃ. ১৩৮ + ৫৪) প্রচারেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের ‘হতোমে’ (১ম ভাগ) বহু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বর্তমান সংস্করণে প্রথম ভাগের প্রারম্ভে টপ্পা গানের যে দুই পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে ১ম সংস্করণের পুস্তকে মধুসূদনের অসুসরণে অমিত্রাকর ছন্দে এই কবিতাটি ছিল :—

হে শারদে ! কোন্ দোষে ছুবি দাসী ও চরণতলে ?

কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সম্বান ?

এ কুৎসিতে ! কোন্ লাজে সপত্নী সমাজে পাঠাইব,

হেলিলে যা এ কুরুপে—দুর্বিবে জগৎ—হাঁসিবে

সতিনী পোড়া ; অপমানে উভরারে কাঁদিলে

কুসার—সে সময় মনে ব্যান থাকে ; চির অসুগত লেখলীরে ।

আমরা ১৮৬৮ সনে গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণকেই মূল আদর্শ ধরিয়া পুস্তক মুদ্রণ করিয়াছি ; কারণ, গ্রন্থকার জীবিত থাকিয়া যে পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য। তবে এই সংস্করণের যে যে স্থলে শব্দ ও পংক্তি পরিবর্তিত হইয়াছে, প্রথম সংস্করণের পাঠ বহিরা তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

সামাজিক নকশার দিক্ হইতে গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্য হত্যোন্মের রচনার সঙ্গে ‘সমাজ কুচিহ্ন’ ও ‘পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব’ সম্মিষিষ্ট হইল ; এগুলি হত্যোন্মের রচনা না হইলেও হত্যোন্মাকারী দুই জন শক্তিশালী লেখকের রচনা ।

‘সমাজ কুচিহ্ন’

১৮৬৫ সনের জাহুয়ারি মাসে নিশাচর-প্রণীত ‘সমাজ কুচিহ্ন’ প্রকাশিত হয় । পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৮ ; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

THE EVILS OF OUR SOCIETY. In Bengals. For Drawing attention of the young Bengals over their mother county. By A Midnight-Traveller, Published by B. Mook, Pen and Co.

সমাজ কুচিহ্ন। মাতৃভূমির প্রতি বঙ্গীয় যুবকগণের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত নিশাচর প্রণীত অমরাবতী সজীবনীযন্ত্র । ১৮৬৫ সাল । মূল্য ১০ আট আনা ।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ২৩ বৎসর পরে—১৮৮৯ সনের জাহুয়ারি মাসে এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয় ; প্রকাশক—মুলিয়ান-নিবাসী অম্বকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “গ্রন্থকারমহাশয়ের অভিমত গ্রহণপূর্বক উপযুক্ত স্থলবিশেষে কতক কতক সংযোজন এবং কোন কোন অংশ পরিভাষ্য করিয়া, এই দ্বিতীয় সংস্করণ [পৃ. ৭২] প্রকাশ” করেন । আমরা গ্রন্থকারের মূল সংস্করণের পাঠই অনুসরণ করিয়াছি ।

✓ ‘সমাজ কুচিহ্ন’ের লেখক “নিশাচর” কে, এ সম্বন্ধে বতঃই কৌতূহল হইতে পারে । তিনি সে কালের অপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । উল্লিখিত অম্বকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা, সে কালের সব-রেজিষ্টার ও ‘রেজিষ্টারী দর্পণ’ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা (‘জন্মভূমি,’ পৌষ ১৩০৩, পৃ. ১৬-১৭) । ‘সমাজ কুচিহ্ন’ের আখ্যাপত্রে আছে : “Published by B. Mook. Pen and Co” এই “B. Mook.” “ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়” নামেরই সংক্ষিপ্ত রূপ । ভুবনচন্দ্রই যে ‘সমাজ কুচিহ্ন’ের লেখক, তাহার স্পষ্ট উল্লেখও আমরা পাইয়াছি । “বয়ঃ ভুবনচন্দ্রের মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ” করিয়া, তাঁহারই জীবিতকালে বতীন্দ্রনাথ দত্ত তৎসম্পাদিত ‘জন্মভূমি’তে (ভাদ্র ১৩১০) তাঁহার যে জীবনী প্রকাশ করেন, তাহাতে প্রকাশ :—১৮৭০-৭১ সনে ষষ্ঠঃ প্রকাশিত “[এই এক নূতন : আমার] গুপ্তকথা লিখিবার অগ্রে সমাজ কুচিহ্ন নামে তিনি একখানি সামাজিক নক্সা প্রণয়ন করেন, সেখানি হত্যোন্মের ভাষায় অনুবরণ, বিজ্ঞ লোকে তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃত চিত্র বলেন, হত্যোন্ম নিজেও প্রশংসা করিয়াছিলেন ।” বতীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে বর্জিতাকারে ভুবনচন্দ্রের যে জীবনকাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন (‘প্রবর্তক,’ ভাদ্র ১৩৪৩), তাহাতেও ‘সমাজ কুচিহ্ন’ের রচয়িতা সম্বন্ধে অল্পরূপ উক্তি আছে ।

২০ জুলাই ১৮৪২ (৬ শ্রাবণ ’ ১২৪২) তারিখে ভুবনচন্দ্রের জন্ম হয় । ২৪-পরশুয়ারি

অন্তর্গত দক্ষিণ-বাকর্ষপুত্রের সম্বন্ধিত শাসন গ্রন্থে তাঁহার মাতামহাশ্রম। শৈশবাবধি মাতৃভাবার তাঁহার পড়ার অঙ্গুরাগ ছিল। ১৮৬১ সনের জুলাই মাসে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামীর সম্পাদনায় দৈনিক ‘পরিদর্শক’ প্রকাশিত হইলে ভুবনচন্দ্র তাহাতে কবিতা লিখিতেন। পর-বৎসর ১৮৬২ নবেম্বর কালীপ্রসন্ন সিংহ ‘পরিদর্শক’র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হন; তিনি জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও তাঁহার সুপারিশে ভুবনচন্দ্রকে সহকারী-রূপে গ্রহণ করেন। ‘পরিদর্শক’ তিন মাস সগৌরবে চলিয়া লুপ্ত হয়। ভুবনচন্দ্র কালীপ্রসন্নের সুনজরে পড়িয়াছিলেন; ‘পরিদর্শক’ লুপ্ত হইলেও সদাশয় কালীপ্রসন্ন তাঁহাকে নিকটেই রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাক্ষরণ ‘সোমপ্রকাশ’র অন্য এক জন যোগ্য সহকারীর সন্ধান করিতেছিলেন। ভুবনচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী হন। দেড় বৎসর ‘সোমপ্রকাশ’র সম্পাদকীয়-বিভাগে কার্য্য করিবার পর তিনি রামচন্দ্র গুপ্তের অধীনে ‘সংবাদ প্রভাকরে’র সহকারী সম্পাদক হন এবং এই পদে অধীর্ণ ২২ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। ‘সংবাদ প্রভাকরে’ কার্য্যকালে তিনি ছইখানি মাসিকপত্র পরিচালন করিয়াছিলেন; উহার একখানি—১২৭৭ সালের অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর ১৮৭০) মাসে প্রকাশিত রহস্ত-পত্রিকা ‘বিদূষক,’ অপরখানি—১৮৭৩ সনের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত ‘পূর্ণশশী’। ১৩০৩ সালের ২৫এ শ্রাবণ, শনিবার (৮ আগস্ট ১৮৯৬) সাপ্তাহিক ‘বনুমতী’ প্রকাশিত হইলে প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে ভুবনচন্দ্র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার লিখিত অনেক গ্রন্থ বনুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৭ সালে প্রকাশিত নবপর্য্যায় (২য় ভাগ) ‘জন্মভূমি’র সহিত তিনি ওতপ্রোত ছিলেন। তাঁহার বহু রচনা—কবিতা, গল্প, প্রবন্ধাদি ‘জন্মভূমি’তে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ১১শ ভাগের (১৩০৯) প্রথম কয়েক সংখ্যার সম্পাদক-রূপে তাঁহার নাম বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকার মুদ্রিত হইয়াছে। ‘জন্মভূমি’র দত্ত-পরিবারের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ছিল। গঙ্গান্নানের সুবিধা হইবে বলিয়া ১৩০৩ সাল হইতে যত্নের দুই মাস পূর্ক পর্য্যন্ত তিনি দত্ত-পরিবারেই অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থার পূর্কেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল।

ভুবনচন্দ্রের গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে। তিনি কাব্য, উপভাষা, সামাজিক নকশা, প্রহসন, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনি—এক কথার বাংলা-সাহিত্যের সকল বিভাগেই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দ্বিতীয় রাজকৃষ্ণ রায় বলা চলে। তিনি অহুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; রেনল্ডসের জোসেফ উইলমট, যারি কোরেলীর *Sorrows of Satan* (‘সন্তপ্ত সরতান’), গালিভাস ট্রাভল্‌স্ প্রভৃতি স্থললিত বাংলায় অহুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ‘এই এক নুতন : আমার গুপ্তকথা’ বা ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ (মে ১৮৭৩) আমাদের নিকট সমধিক পরিচিত।

ভুবনচন্দ্র নামের কাঙাল ছিলেন না। তাঁহার লিখিত অনেক পুস্তকে গ্রন্থকার-নামেই তাঁহার নাম মুদ্রিত হয় নাই। উদীয়মান লেখকগণের উৎসাহদাতা-রূপে তিনি অনেকের

রচনা সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। “কুষ্টিয়া-নিবাসী সৈয়দ মীর মশারুফক হোসেন নামক এক মুসলমান যুবক ছইখানি বাজালা পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতে আসেন, তিনি তাহা উত্তমরূপে শোষণ করিয়া বিস্তৃত বক্তাব্যয় সম্বিষ্ট করেন, একখানির নাম ‘বসন্তকুমারী,’ দ্বিতীয়খানির নাম ‘বিবাদসিদ্ধ’।” (জগদ্বৃন্দ, ভাদ্র ১৩১০, পৃ. ৬১)

১৮ জুলাই ১৯১৬ (২ শ্রাবণ ১৩২৩) তারিখে, ৭৪ বৎসর বয়সে, ভুবনচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত ‘নারকে’ (২০ ভাদ্র) লিখিয়াছিলেন :—

“বাজালের সময় হইতে যিনি বাজালার গল্প পদ্ম লেখক, বাইকেলের সহচর, বাহার লিখিত পুস্তকরাশির সংখ্যা করা যায় না; বাহার পাঠকগণেরও সংখ্যা হয় না—সেই সরল সোজা, দেশী বাজালা গল্পের লেখক ভুবনচন্দ্রের মতন অনুবাদক বাজালার আর ছিল না—বোধ হয় আর হইবে না। আর...তুমি ভুবনচন্দ্রের মনীষা বেচিয়া এত অর্থ পাইয়াছ, তুমি সেই বুড়ার মরণে কি করিলে? কি করিবে? নাটুকে রামনারায়ণের সময় হইতে যে ভুবনচন্দ্রের প্রতিভা একটানা গজাশ্রোতের মত সমানভাবে ষাট বৎসরকাল বাজালা সাহিত্যক্ষেত্রে বহিয়া গিয়াছে, সেই ভুবনবাবুর দলের একজন ছিল না বলিয়া আজ বিশ্বতিসাগরে ডুবিল।”

‘পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের চূর্ণোৎসব’

১২৭৫ সালে (ইং ১৮৬৮) এই পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

আস্মানের নক্সা। পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের চূর্ণোৎসব। বর্জীর বোধন হইতে মহা-নবমীর কাদা পর্যন্ত। ত্রিযুক্ত দশ অবতারের এক অবতার কর্তৃক প্রণীত।

“————— ভূধর-দরী-লীনা মুনীনং গিরঃ,

বজ্জং স্নেহ-মতং জনান্তদহুগাঃ কা নাম ধর্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।

মত্তং হৃদমতীব।—————”

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ।

কলিকাতা। ত্রিযুক্ত দ্বৈধরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ট্যান্মহোপ-বন্দ্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৫ শাল।

পুস্তিকায় লেখক আগ্রগোপন করিয়া নিজকে “ত্রিযুক্ত দশ অবতারের এক অবতার”-রূপে পরিচয় দিয়াছেন। বেন্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকায় তাঁহার আসল নাম “রামসর্কষ বিজ্ঞাতুষণ” এবং পুস্তিকার প্রকাশকাল “১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৮” পাওয়া বাইতেছে।

১২৬০ সালে (ইং ১৮০৩) ২৪-পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে রামসর্কষের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—রামগোপাল বিজ্ঞাবাগীশ। দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণধর্মের

মধ্যে বাগ্‌দাদ-প্রথা প্রচলিত থাকায় বাগ্‌দাদেই রামসর্কর পরিণয়-কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল ; তিনি কবিবর ভায়াবুখার কবিরত্নের ভগিনীকে বিবাহ করেন।

রামসর্কর সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিয়া “বিজ্ঞানভূষণ” উপাধি লাভ করেন। তাঁহার ছাত্র-জীবন কৃত্তিকে সমৃদ্ধল। সংস্কৃত কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের পণ্ডিত হন। অতঃপর তিনি বিভাগাগর-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজ ও বউবাজার শাখা-বিভাগে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সনে প্রকাশিত ‘সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রবেশিকা’র বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন :—“প্রায় ষাট বৎসর অতীত হইল, তৎকালে আমি প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বিভাগাগর মহাশয়ের বিভাগে ও তাঁহার নিজের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম। তিনিও আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন।” বিভাগাগরের মৃত্যুর (ইং ১৮৯১) পর রামসর্কর পাঁচ বৎসর বঙ্গবাসী কলেজে ও ১৫ বৎসর রিপন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া ১৩১৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

রামসর্কর অমায়িকপ্রকৃতি, আমোদপ্রিয় ও সুরসিক ছিলেন। সাধারণের নিকট তাঁহার নাম রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-শিক্ষক হিসাবেই সমধিক পরিচিত। কিন্তু তিনি যে সে কালের একজন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ছিলেন, ইহা আজ অনেকেরই নিকট অবিস্মৃত। ১৮৬৮ সনের ২৮এ ডিসেম্বর ‘কল্পলতিকা’ নামে পাক্ষিক পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, নজীর উদ্ধৃত করিতেছি :—

কল্পলতিকা। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত রামসর্কর ডট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক। ১৫ই পৌষ অবধি নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে, মাসিক মূল্য চারি আনা। (‘সংবাদ প্রভাকর,’ ২৩ পৌষ ১২৭৫)

কল্পলতিকা। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসর্কর বিজ্ঞানভূষণ ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ইহার দুই সংখ্যা দেখিরা বোধ হইতেছে...। (‘সোমপ্রকাশ,’ ২০ মাঘ ১২৭৫)

১২৮২ সালের বৈশাখ (ইং ১৮৭৫) মাসে রামসর্কর ‘প্রতিবিম্ব’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ (ভাদ্র ১৭৯৭ শক) লিখিয়াছিলেন :—

প্রতিবিম্ব। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, পুরাতত্ত্ব, বার্তাশাস্ত্র, জীবনযুক্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরামসর্কর বিজ্ঞানভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, তিত্তোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৮২। এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম মূচনা, ২য় মন্ত্র ও তাঁহার রাজনীতি, ৩য় উদাসীন বোগী বেশে সাজারে আমার, ৪র্থ বিজ্ঞান, ৫ম আলঙ্কারিক শিল্প, ৬ষ্ঠ প্রকৃতির খেদ, ৭ম পৌরাণিক জু-ব্রহ্মত, ৮ম আয়ুর্কেন্দ। খ্রী লেখকগণের নাম যোগা বিষয়ে

প্রতিবিম্বের কোন আঁড়ের নাই কিন্তু আমরা তুলিতে গাই এই মাসিক পত্র প্রণ
 কার্যে উত্তম উত্তম লেখক ত্রুটি আছেন। “আলঙ্কারিক শিল্প”র জার গড় প্রকাশ
 “প্রকৃতির খেদের” জার কবিতা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহা সাধারণ
 সমাদরভাজন না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। আমরা তুলিয়া পরলোক
 ভ্রাতার শ্রীমান মহাশয় আলঙ্কারিক শিল্প ও পৌরাণিক কু-বৃত্তান্ত এই প্রস্তাব
 লিখিয়াছেন। তাঁহার জার বীর, অসামান্য, শিল্পাভিজ ব্যক্তি অল্পই পাওয়া যায়।

“প্রকৃতির খেদ” রবীন্দ্রনাথের রচনা। ‘প্রতিবিম্ব’র ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) হই
 বিজ্ঞাননাথের লিখিত “পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র” বারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে গা
 ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকাখানি ‘জানাকুরে’র সহিত সম্মিলিত হা
 ‘জানাকুর ও প্রতিবিম্ব’ নাম ধারণ করে।

২৪ জুন ১৯১২ (১০ আষাঢ় ১৩১৯) তারিখে, ৬৯ বৎসর বয়সে, পণ্ডিত রামসব
 বিজ্ঞানভূষণ পরলোকগমন করিয়াছেন (‘গৃহস্থ,’ কার্তিক ১৩১৯ দ্রষ্টব্য)।

সূচীপত্র

‘ছড়োম,’ ১ম ভাগ

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
চড়ক	১
বারোইয়ারি	১৪
হজুক	৪৮
ছেলে ধরা	৪৮
প্রতাপচাঁদ	৪৮
মহাপুরুষ	৪৯
লালা রাজাদের বাড়ি দালা	৫২
কুশানি হজুক	৫৩
মিউটিনি	৫৪
মরাকেরা	৫৬
আমাদের জাতি ও নিম্নকেরা	৫৯
নানা সাহেব	৬০
সাতপেয়ে গরু	৬০
দরিয়াই ষোড়া	৬০
লক্ষ্মীর বাদসা	৬১
শিবকক বন্দোপাধ্যায়	৬২
ছাঁচোর ছেলে বুঁচো	৬২
অষ্টিন ওয়েল্‌স্	৬৩
টেক্টাদের পিসী	৬৪
পাহ্লি লং ও নীলদর্পণ	৬৪
রমাপ্রসাদ রায়	৬৬
রসরাজ ও বেমন কর্ত্ত তেমনি ফল	৭২
বুজুকি	৭৪
হোসেন ঐ	৭৪
কুন্ত নাবানো	৭৫
লাককাটা বক	৭৯

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
বাবু পদ্মনোচন দত্ত	
ওরফে হঠাৎ অবতার	৮৪
দ্বানযাত্রা	৯৮
‘হুতোম,’ ২য় ভাগ	
বধ	১১১
দুর্গোৎসব	১১৩
রামলীলা	১২৩
রেলওয়ে	১৩০
‘সমাজ কুচিহ্ন’	১৪৫-৯১
‘পল্লীগ్రামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব’	১২৩-২০৪

ହତୋମ ପ୍ୟାଠାର ନକ୍ସା
ପ୍ରଥମ ଭାଗ

সহদয় কুলচূড় শ্রীল শ্রীযুক্ত মূলক চাঁদ শর্মা
বাল্যলী সাহিত্য ও সমাজের প্রিয়চিকীর্ষা নিবন্ধন
বিনয়বনত

বাল
শ্রীহতোম প্যাঁচা কর্তৃক
(তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম)
শ্রীচরণে
অঞ্জলি প্রদত্ত হইল ।

ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা

আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত বুদ্ধিমান কবিদের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে, বেওয়ারিস লুটির মরদা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিকণা ছেলেমাজেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খালা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচেন; যদি এর কেও ওয়ারিসান্ থাকতো, তা হলে ইঙ্গুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাতা নাবুদ হতে পেতো না—তা হলে হয় ত এত দিন কত ঐহিকার কঁাসি যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাকতেন, সুত্তরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস নাই যে, আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন—বেশির ভাগই অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নকশাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়লো। কথায় বলে “এক জন বড়মামুষ, তাঁরে প্রত্যাহ নতুন নতুন মস্তরামো জাধাবার জন্ত এক জন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন, সে প্রত্যাহ নতুন নতুন ভাঁড়ামো করে বড়মামুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কভো, কিছু দিন যায়, অ্যাক দিন সে আর নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না, শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক বাঁকামুটে ভাড়া করে বড়মামুষ বাবুর কাছে উপস্থিত, বড়মামুষ বাবু তাঁর ভাঁড়কে বাঁকামুটের ওপর বসে আসতে দেখে বলেন, ভাঁড়! এ কি হে? ভাঁড় বলে, “ধর্ম্মাবতার, আজকের এই এক নতুন।” আমরাও এই নকশাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক নতুন বলে দাঁড়ালেম—এখন আপনাদের স্বৈচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।

কি অভিপ্রায়ে এই নকশা প্রচারিত হলো, নকশাখানির ছু পাত দেখলেই সহস্রর মাজেই তা অমূল্যব কস্তে সমর্থ হবেন, কারণ এই নকশায় একটি কথা অলীক বা অমূল্য ব্যবহার করা হয় নাই—সত্য বটে অনেকে নকশাখানিতে আপনাকে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বলতে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নকশায় মধ্যে থাকিতে ছুলি নাই।

নকশাখানিকে আমি এক দিন আরসি বলে পেশ করলেও কভো পাড়েন, কারণ পূর্বে জালা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না, বরং বাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হাজার দেখে শুনে—ভয়ানক আনোয়ারদের মুখের কাছে তরঙ্গা বেঁধে আরসি খেতে আর সাহস

হয় না, স্তম্ভরাং বুড়ে বয়সে সং সেজে রং কভে হলো—পুজলীর পাঠকগণ বেয়াববি বাক্
করেন ।

আশ্রয়ান

১৭৮৪ শকাব্দা

}

দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা

পাঠক ! হতোমের নক্শার প্রথম ভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হলো। যে সময় এই বইখানি বাহির হয়, সে সময় লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙ্গালী সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশে) পড়বেন। ধারা সম্ভব, সর্ব সময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কার্যরত কামনা করেন, তাঁরা হতোমের নক্শা আদর করে পড়ে সর্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন। যেগুলো হতভাগা, হতোমের লক্ষ্য, লক্ষীর বরষাজ, পাঞ্জীর টোকা ও বজ্জাতের বান্শা, তারা “দেখি হতোম আমার গাল দিয়েছে কি না ? কিবা কি গাল দিয়েছে” বলেও অন্তত লুকিয়ে পড়েচে ; সুস্থ পড়া কি,—অনেকে সুস্থরেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েছে ও প্রকাশ্য বেলেঙ্গাগিরি বদমাইশি ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েছে। এ কথা বলাতে আমাদের আপনা আপনি বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটি সাধারণের ঘরকন্নার কথা *Household words*.

পাঠক ! কতকগুলি আনাড়িতে রটান, হতোমের নক্শা অতি কদর্য্য বই, কেবল পরনিষ্ঠা পরচর্চা খেঁড়ি ও পচালে পোরা ও শুদ্ধ গায়ের আলা নিবারণার্থ কতিপয় ভুল্ললোককে গাল দেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম ; অ্যাকবার ক্যান, শতক বার মুক্ত কর্ত্তে বলবো—ভ্রম ! হতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হতোম তত দূর নীচ নন যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার ক্ষমতা কলম ধরেন। জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হতোমের নক্শা প্রসব করেছে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র চিন্তাৎকর্ষবিধায়ক মুমুক্ সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্ত-অবলম্বন-বরূপ গ্রন্থের অল্পবাদক ; সুতরাং এটা আপনি বিলক্ষণ জানবেন যে, অজাগর স্মৃতিত হলে আরম্ভলা ধায় না ও গায়ে পিপড়ে কামড়ালে ডক ধরে না। হতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।

তবে বলতে পারেন, ক্যানই বা কল্কেতার কতিপয় বাবু হতোমের লক্ষ্যভবর্ত্তা হলেন, কি দোষে বাগাধর বাবুরে প্যালানাথকে পদ্বলোচনকে মজলিসে আনা হলো, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মজ্লিকের নাম করে, কোন্ দোষে অজ্ঞানারজন বাহাদুর ও বর্ধমানের হজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজ্জা থাকতে আসরে এলেন ? তার উত্তর এই যে, হতোমের নক্শা বঙ্গসাহিত্যের নূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি ; যদি ভাল করে চ'কে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কতে পারেন না ও হতোমের উদ্দেশ্য বিকল হতো। অ্যামস কি, এত ঘরখ্যাঁবা করে এনেও অনেকে আপনাকে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নক্শার চিন্তে পারেন না ও কি ক্ষমতা কোন্ জনে তাঁদের মজলিসে আনা হলো, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষগুলি যেমানুষ বিস্মৃত হয়ে যান।

ময়ূরভঞ্জন মহারাজার যোক্তার মহারাজার সঙ্গে মেহোবাওয়ার হতে উৎকৃষ্ট জন্মের লপেটা জুতো পাঠান, মহারাজ চিরকাল উড়ে জুতো পারে দিয়ে এসেছেন, লপেটা পেয়ে মনে কল্লেন, সেটি পাগড়ির কলগী ও জামাতিখির দিন মহা সমারোহ করে ঐ লপেটা পাগড়ির ওপর বেঁধে মজলিসে বার দিলেন। সুতরাং পাছে স্বকপোলকল্পিত নারক হত্যোমের পাঠকের নিতান্ত অপরিচিত হন, এই ভয়ে সমাজের আত্মীয় অন্তরঙ্গ নিয়ে ও স্বয়ং সং সেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। বিশেষত “বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে ক্যান নাই?” বাঙ্গালী সমাজে বিশেষত সহরে ব্যামন কতকগুলি পাওয়া যায়; কল্পনার অনিয়ত সেবা করে সরস্বতীরও শক্তি নাই যে, তাঁদের হতে উৎকৃষ্ট জীবের বর্ণন করেন।

হত্যোমের নক্শায় অহঙ্করণ করে বটুতলার ছাপাখানাওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারি চটী বই ছাপান, ও অনেকে হত্যোমের উত্তোর বলে “আপনার মুখ আপনি দেখেন ও জাখান”। হুম্মান লজ্জা দখ্ব করে সাগরবারিতে আপনার মুখ আপনি দেখে জাতিমাত্রেয়ই যাতে এরূপ হয়, তার বর প্রার্থনা করেছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দশা ও দরের লোক। কিন্তু কত দূর সফল হলেন, তার ভার পাঠক! তোমার বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তবে এটা বলা উচিত যে, পত্রদ্বারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে পরপরিবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্তব্য নয়।

ফলে “আপনার মুখ আপনি দেখ” গ্রন্থকার হত্যোমের বমন অপহরণ করে বামনের চন্দ্র গ্রহণের জায় হত্যোমের নক্শার উত্তর দিতে উত্তত হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হত্যোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু দিন ঐ ব্যাব্‌সা চলো না। সাত পেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোড়া ও হোসেন খাঁর জিনির মত সপ্তদশ সমাজে জানতে পাঞ্জন যে, গ্রন্থকারের অভিসন্ধি কি? এমন কি, ঐ গ্রন্থকার খোদ হত্যোমকেই তাঁরে সাহায্য কন্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন, সে পত্র এই—

জগদীশ্বরের নমঃ।—

মহাশয়! “আপনার মুখ আপুনি দেখ” পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া পাঠক-সমাজে যে তাহা গ্রহণীয় এবং আদরণীয় হইবেক পূর্বে এমত ভরসা করি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় অনেকানেক পাঠক মহাশয়েরা উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া “দেশাচার সংশোধন পক্ষে পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে” এমত অনেকেই বলিয়াছেন; তাহাতেই শ্রম সফল এবং পরম লাভ বিবেচনা করা হইয়াছে।—

প্রথম খণ্ডে “বিত্তীয় খণ্ড আপনার মুখ আপুনি দেখ” প্রকাশিত হইবেক এমত লিখিত হওয়ার অনেকেই ‘তদ্বর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন (উঁহারা পাঠক এবং গ্রাহক সাম্প্রদায়িক এই মাত্র)। উপস্থিত মহৎকার্য্য পরিশ্রম অর্থব্যয় এবং দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ মহাশয় মহোদয়দিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান ব্যতীত কোনরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। আপনার নিঃস্ব ভাব, ধনব্যয় করিবার কন্যতা নাই, এ

কারণ এই মহৎকার্য্য মহাজ্ঞানের কৃপাবশে না দণ্ডায়মান হইলে কোনক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না। আর সাধারণ লোকের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এ বিষয় সমাধা হইবার নহে। ধনী, ধীর, অদেশীয় ভাবার শ্রীবুদ্ধিকারক এবং দেশের হিতৈষীকই এই মহৎ কার্য্যে উৎসাহদাতা এ বিষয় মহাশয় ব্যতীত এ বিষয়ের সাহায্য আর কেহই হইতে পারেন না। আপনার দাক্ষ্যতা পরোপকারিত্বতা ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুবশ সৌরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে, ভারত আপনার যশরূপ বশ ধারণ করিয়াছে। দেশাচার সংশোধন পক্ষে মহাশয় বাজালা ভাবার প্রথম গ্রন্থকর্তা, বর্তমানে মহাশয়ের মতামুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার কৃপাবশে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলাম মহাশয় কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাহিয়া সাহায্য প্রদান করিলে সঙ্করেই দ্বিতীয় খণ্ড “আপনার মুখ আপনি দেখ” পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি। নিবেদন ইতি সন ১২৭৪ সাল তারিখ—২০ জ্যৈষ্ঠ—

পু

লিপিখানিতে, ডাক ষ্ট্যাম্প দিয়া প্রদান করা বিধেয় বিবেচনা করিলাম না। না দেওয়ার অপরাধ মার্জনা করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ। অমুজ্জার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম কৃপাবলোকন যে রূপ অমুজ্জা হইবেক লিখিয়া বাধিত করিবেন।—

কা, রা রূপ কারাবাসে : কা, লে কালে আয়ু নাশে : ভো, লা মন ভাবে না ভুলিয়ে।

ব লি, তারে সুবচনে : চ লি, তে সুজন সনে : হে লা, করে খেলায় মাতিয়ে ॥

সদ প্র, মদেতে মত্ত : ত্যজি প্র, সজের তত্ত্ব : নিত্য না, চে কুসজের সনে।

তত্ত্ব র স, পরিহরি : বুখা র স, পান করি : মনম থ, অহুকণ মনে ॥

ভারতে ত র, তা করি : অভেদ তি র, তা হরি : দেখাইছে যু, জির সোপান।

মন যদি ব সি, ভায় : ত্যজে পাপ ম সি, হায় : শুনি যুনি যু খো, গুণ গান ॥

ভারত বেদের অ ং, শ : শ্রবণে কলুস ধ্ব ং, স : ভারতে ভারত পা, প হরে।

হরিগুণ সদত্ ক হ, ভারত লইয়া র হ, ভাগবতে কর আ ধ্যা, নরে ॥

হতোমের চিরপরিচিত রীতামুসারে এই ভিক্ষুকের পত্রখানি অপ্রচারিত রাখা কর্তব্য ছিল, কিন্তু কতকগুলি স্থলবয় ও আনাড়িতে বাস্তবিকই স্থির করে রেখেচেন যে, “আপনার মুখ আপনি দেখ” বইখানি হতোমের প্রকৃত উদ্ভব, ও বটতলার পাইকেররাও ঐ কথা বলে হতোমের নক্শার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বইখানি বিক্রী করেন বলিয়াই ঐ হতভাগ্য ভিক্ষুকের পত্রখানি অবিকল ছাপান গেল।—এখন পাঠক। তুমি ঐ পত্রখানিই পাঠ করে জানতে পারবে, হতোমের নক্শার সঙ্গে “আপনার মুখ আপনি দেখ” গ্রন্থকারের কিরূপ সম্পর্ক।

শঙ্করপুর }

শ্রীতামা হুন্‌ রায়-ইয়ার।

১লা এপ্রেল }

প্রকাশক।

কলিকাতার চড়কপার্ক

“কই টুনোয়া—

সহর সিখাওরে কোতোয়ালী”—টুনোয়ার টুনা।

কলিকাতা সহরের চার দিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে, চড়কীর পিঠি সড়, সড়, কচে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বাঁটি প্রস্তুত কচে ; সর্বদা গয়না, পায়ে নুপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেথরে ছোবান গামছা হাতে, বিহুপত্র বাঁদা সূতা গলায় বত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—“আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন।”

কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের কাঁসি হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সে কালে নিমকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল ; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড় মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদী বড় মানুষ কব্লাতে গেলে বাজালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈষ্ণব, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিত্যন্ত অনুগত—বাড়িতে ক্রিয়েকর্ম কাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে ; আর ভজাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচির নিত্যসেবা হয়ে থাকে।

এদিকে হুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাণ্ডারা নুপুর পায়ে উত্তরি সূতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরভ্রতের ও মহেশ্বের শুভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে বেঞ্চালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের সজতে নেচে ব্যাড়াচ্ছে। চাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুড়ুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ধ্যাসী সংগ্রহ কচে ; গুরু মশায়ের পাঠশাল বন্ধ হয়ে গিয়েছে—ছেলোরা গাজনডলাই বাড়ি করে তুলেচে ; আহা নাই, নিদ্রা নাই ; ঢাকের পেচোনে পেচোনে রস্টে রস্টে ব্যাড়াচ্ছে ; কখন “বলে ভদেধরে শিবা মহাদেব” চাঁৎকারের

সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে, কখন ঢাকের পেছনটা ছুম্ ছুম্ করে বাজাচ্ছে—বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যায়রাম কল্লো হয়।

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটাঝাঁপ। আমাদের বাবুর চার পুরুষের বড়ো মূল সন্ন্যাসী কাণে বিষপত্র গুঁজে, হাতে এক মুটো বিষপত্র নিয়ে, ধুকতে ধুকতে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো ; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েছে, স্ততরাং বাবু তারে নমস্কার কল্লেন ; মূল সন্ন্যাসী এক পা কাঁদা শুদ্ধ ধোব ফরাশের উপর দিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন,—বাবু তটস্থ !

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজলো, সুর্যের উত্তাপের ছাস হয়ে আসতে লাগলো। সহরের বাবুরা কেটিং, সেল্‌ফ্‌ড্রাইভিং, বগি ও ব্রাউছামে করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্র লোক, বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরলেন, কেউ বাগানে চল্লেন—দুই চার জন সহদয় ছাড়া অনেকেই গিছনে মালভরা মোদাগাড়ি চল্লো, পাছে লোকে জানতে পারে এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সইস কোচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন—কেউ লোকপবাদ তৃণজ্ঞান, বেস্তাবাজী বাহাধুরির কাজ মনে করেন ; বিবিজ্ঞানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারৎ!—কুঠিওয়ালারা গহনার ছকড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কল্লেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ঢাক বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্ছে, কেহ ভক্তিয়োগে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে—শিবের বামুন কেবল গজাজল ছিটুচ্ছে, প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না ; কি হবে। বাড়ির ভিতরে খবর গেলো ; গিম্মিরা পরস্পর বিষণ্ণ বদনে “কোন অপরাধ হয়ে থাকবে” বলে একেবাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা “বোধ হয়, মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাকবে, সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়” ; এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লো ; অবশেষে গুরু পুরুত, ও গিম্মির ঐক্য মতে বাড়ির কর্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। এক জন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লো—“মোশায়কে একবার গল্প ফুলে শিবতলায় যেতে হবে,” “ফুল ত পড়ে না।” সন্ধ্যা হয়—বাবুর ফিট্‌ন প্রস্তুত, পোশাক পরা, রুমালে বোকো মেখে বেরুচ্ছিলেন—তুনেই অজ্ঞান ! কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়েকাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা পারনাপেলের চাপুকান পরে, সাজগোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আসতে দেখে

দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সার গৈতে চল্লো ; মোলাহেবেরা বাবুর সমূহ বিপদ মনে করে বিষম বদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে বেতে লাগলো ।

গাজনডলায় সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠলো, সকলে উচ্চস্বরে “ভদ্রেশ্বরে শিবো মহাদেব” বলে চীৎকার করতে লাগলো ; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ।—বড় বড় হাতপাখা ছপাশে চলতে লাগলো, বিশেষ কারণ না জানলে অনেকে বোধ কতে পারতো যে, আজ্জ্ বুদ্ধি নরবলি হবেন । অবশেষে বাবুর দ্বহাত একত্র করে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কঁাদ কঁাদ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরোহিত শিবের কাছে “বাবা ফুল দাও,” “ফুল দাও,” বারংবার বলতে লাগলো, বাবুর কল্যাণে এক ঘটি গজাজল পুনরায় শিবের মাতায় ঢালা হলো, সম্ম্যাসীরা সজোরে মাতা দ্বুকেতে লাগলো, আধ ঘণ্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাতা থেকে এক বোঝা বিষপত্র সরে পড়লো ! সকলের আনন্দের সীমা নাই “বলে ভদ্রেশ্বরে শিবো” বলে চীৎকার হতে লাগলো, সকলেই বলে উঠলো, না হবে কেন—কেমন বংশ !

ঢাকের ডাল ফিরে গেলো । সম্ম্যাসীরা নাচতে নাচতে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ক্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আনলেন । গাজনডলায় বিশ আঁটি বিচালি বিছানো ছিল, কঁাটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠাঙ্গান হলো, ক্রমে সব কঁাটাগুলি মুখে মুখে বসে গেলে পর পুরুত তার উপর গজাজল ছড়িয়ে দিলেন, ছজন সম্ম্যাসী ডবল গামছা বেঁদে তার ছদিকে টানা ধলে,—সম্ম্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর কাঁপ খেয়ে পড়তে লাগলো ; উঃ ! “শিবের কি মাহাত্ম্য !” কঁাটা ফুটলে বলবার যো নাই ! এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে হু এক জন কুটেল চোরা গোপ্তা মাচ্চেন । অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েছেন, মনে কচ্চেন বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জানতে পারেন না । ক্রমে সকলের কাঁপ খাওয়া ফুরলো ; এক জন আপনার বিক্রম জানাবার জন্ত চিৎ হয়ে উল্টো কাঁপ খেলে ; সজোরে ঢাক বেজে উঠলো । দর্শকেরা কঁাটা নিয়ে টানাটানি কতে লাগলেন—“গিম্মিরা বলে দিয়েছেন, কাঁপের কঁাটার এমনি গুণ, যে, ঘরে রাখলে একসঙ্গে বিছানার ছারপোকা হবে না ।”

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসোর ঘণ্টার শব্দ থামলো । সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে । “বেলফুল !” “বরফ !” “মালাই !” চীৎকার শুনা যাচ্ছে । আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েছে অথচ খন্দের ফিটে না—ক্রমে অন্ধকার গাঢ়াকা হয়ে এলো ; এ সময় ইংরাজী

জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনি আর সিম্‌লের খুতির কল্যাণে রাজার ছোট লোক তন্দর লোক আর চেনবার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গরু ও ইংরাজী কথার ফরার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় চু মেরে মেরে বেড়াছেন—এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেকুলেন আবার ময়দা পেবা দেখে বাড়ি কিব্বেন। মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা—চোরবাগানের মোড়, বোড়াসাঁকোর পোন্ধারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোনাগাজীর গলি ও আহিরিটোলার চৌমাথা লোকারখা—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্ছেন কেউ তাঁরে চিন্তে পারবে না ; আবার অনেকে চেষ্টিয়ে কথা করে, কেশে, হেঁচে, লোককে জানান দিচ্ছেন যে, “তিনি সন্ধ্যার পর ছু দণ্ড আয়েস করে থাকেন !”

সৌখীন কুঠিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেছেন। পাশের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করে বিদ্যেসাগরের বর্ণপরিচয় পড়চে। শীল ইয়ার ছোকরারা উড়তে শিখচে। স্নাকরারা দুর্গাপ্রদীপ সামনে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেছে। রাজার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ কাটরা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েছে, রোকোডের দোকানদার পোন্ধর ও সোনারবেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাটচে। শোভাবাজারে রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেচুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিস নিয়ে ফ্রেতাদের—“ও গামচাকাঁদে, ভালো মাচ নিবি ?” “ও খেংরাগুঁপো মিন্‌সে, চার আনা দিবি” বলে আদর কছে—মধ্যে মধ্যে দুই এক জন রসিকতা জানাবার জন্তু মেচুনী বেঁটিয়ে বাপাস্ত থাকেন। রেশমহীন গুলিখোর, গঁজেল ও মাতালরা লাটি হাতে করে কানা সেজে “অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ” বলে ভিক্ষা করে মৌভাতের সম্বল কছে ; এমন সময় বাবুদের গাজনতলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠলো, “বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো” চীৎকার হতে লাগলো ; গোল উঠলো, এবারে ঝুল সন্ন্যাস। বাড়ির সামনের মাঠে ভারী টারা বাঁধা শেষ হয়েছে ; বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে হবু ছজুরেরা দরওয়ান, চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজনতলায় ঘুর ঘুর কছেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জ্বলে ভারার নীচে থলে—এক জনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুড় ধুনো কেঁলতে লাগলো, ক্রমে একে একে ঐ রকম করে ছলে, ঝুল সন্ন্যাস সমাপন হলো ; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্বের মত সেতার বাজতে লাগলো, “বেলফুল” “বরফ” “মালাই” ও যথামত বিক্রী করবার অবসর পেলে, শুক্রবারের রাস্তির এই রকমে কেটে গ্যাজো।

আজ নীলের রাস্তির ! তাতে আবার শনিবার ; শনিবারের রাস্তিরে সহর বড় গুল্ফার থাকে—পানের খিলির দোকানে বেল-লঠন আর দেওয়ালগিরি জলচে । ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরিয়ে যেন সহর রাস্তিরে তুলচে । রাস্তার ধারের ছুই একটা বাড়িতে খ্যামটা নাচের তালিমি হচ্ছে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিরার কনু কনু শব্দ শুনে স্বর্গস্থ উপভোগ কচ্চেন । কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্ছে । কোথাও পাহারাওয়ালারা এক জন চোর ধরে বেঁদে নে যাচ্ছে—তার চারি দিকে চার পাঁচ জন চোর হাসচে আর মজা দেখচে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্ছে ; তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়বে তায় আশঙ্কপ নাই ।

আজ অমুকের গাজেনতলায় চিংপুরের হর । ওদের মাটে সিংগির বাগানের প্যালা । ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালি । আজ সহরের গাজেনতলায় ভারি ধুম,—চৌমাথার চৌকিদারদের পোহাবারো ! মদের দোকান খোলা না থাকলেও সমস্ত রাস্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন যে—“ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটটি পাচ্ছে না,” “পালেদের একধামা পেতলের বাসন গ্যাচে ও গন্ধবেগেদের সর্বনাশ হয়েছে” ! আজ কার সাধ্য নিজা যায়—থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাজি, সম্মানসীর হোররা ও “বলে ভদেধয়ে লিবো মহাদেব” চীৎকার ।

এদিকে গির্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং, টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফটকা বাবুরা ঘরমুখে হয়েছে । উড়ে বায়ুনরা ময়রার দোকানে ময়দা পিষতে আরম্ভ করেছে । রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই । ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে । বেঙ্গালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাকতে আরম্ভ করেছে ; ছ এক বার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোকশূন্য । ক্রমে দেখুন—“রামের মা চলতে পারে না” “ওদের ন বোঁটা কি বজ্জাত মা,” “মাগি যে জকী” প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে ছুই এক দল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কস্তে বেরিয়েছেন । চিংপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেচে । পুলিশের সার্জন, দারোগা, জমাদার, প্রভৃতি গরিবের মমেরা রোঁদ সেরে মস্ মস্ করে থানায় ফিরে যাচ্ছেন ; সকলেরই সিকি, অস্ত্রলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট পরিপূর্ণ—হজুরদের কাছে চ্যালা কাঠিখানা, ভামাক ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গস্ গস্ কচ্ছে, মনে মনে নতুন ফিকির

আঁটতে আঁটতে চলেচেন, কাল সকালেই এক জন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দিনি ও ক্যারামত জাহির করবেন—সুপারিগেণ্টেণ্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেণ্ড নিয়তই কাছে থাকে, “হারমোনিয়ম” ও “পিয়ানো” বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান—সুতরাং ইনস্পেক্টর মহলে একাদশ বৃহস্পতি !!!

গুপ্ত করে তোপ পড়ে গ্যালো! কাকগুলো “কা কা” করে বাসা ছেড়ে উড়বার উজ্জুগ কল্লো। দোকানীরা দোকানের ঝাপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হাঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কল্লো। ক্রমে ফরসা হয়ে এলো—মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেচে—মেচুনীরা ঝকড়া কস্তে কস্তে তার পেচু পেচু দৌড়েচে। বদ্বিবাটীর আন্সু, হাসনানের বেগুন, বাজরা বাজরা আসচে। দিশি বিলিভী যমেরা অবস্থা ও রেগুমত গাড়ি পাল্কি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন—অর বিকার ওলাউঠোর প্রাভুর্ভাব না পড়লে এদের মুখে হাসি দেখা যায় না—উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাও বিলক্ষণ সজ্জিত করে নেছেন; কলিকাতা সহরেও দুচার গো-দাগাকে প্রাক্টিস কস্তে দেখা যায়, এদের অমৃধ চমৎকার, কেউ বলদের মতন রোগীর নাক ফুঁড়ে আরাম করেন; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে সারেন। সহরে কবিরাজরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেশ, সকল রকম রোগেই “সত্তা মৃত্যুধর” ব্যবস্থা করে থাকেন—অনেকে চাঞ্চ্য শ্লোক ও দাতাকর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেচেন!

টুলো পুজুরি ভট্টাচ্ছিরে কাপড় বগলে করে স্নান কস্তে চলেচে, আজ তাদের বড় ছরা, যজ্ঞমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে। আদবুড়ো বেতারা মর্শিং-ওয়ারকে বেক্ষেচেন। উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে করে স্নান কস্তে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিক্স, এঞ্জচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েছে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাজালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকরা পান না—ইংরাজি কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফাস্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যিক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেক্সন-লেখা কেরাণীর মত কলুর ঘানির বলদ বদলি হলে—পাগড়িবাঁধা দলের প্রথম ইন্সটলমেন্টে—সিপ্‌সরকার ও বুকিংক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপ্লকর্ষ বেক্ষেলেন। আজ গবর্মেণ্টের আগিস বন্ধ, সুতরাং আমরা ক্লার্ক, ক্যারানী, বুক্‌ক্লিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখতে শেলাম না।

আজকাল ইংরাজি লেখা পড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে আধিক্যে যান—পাগড়ি প্রায় উঠে গ্যাল—ছুই এক জন সেকলে কেরাণীরাই চিরপরিচিত পাগড়ির মান রেখেছেন, তাঁরা পেঙ্গন্ নিলেই আমরা আর কুঠিওয়াল বাবুদের মাথার পাগড়ি দেখতে পাবো না ; পাগড়ি মাথার দিলে আলবার্ডকেসানের বীকা সিতেটি ঢাকা পড়ে এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ষ ও পরমাণিকদের পাগড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েছে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েচে, হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হক না চোটাখোর বেণের ঘরে ও টাকা-ওয়াল বাবুদের বাড়িতে একবার যেতেই হবে—“কার বাড়ি বিক্রি হবে,” “কার বাগানের দরকার,” “কে টাকা ধার করবে,” তাহারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার বেণে সহরে বাবু দালাল চাকর রেখে থাকেন, দালালেরা শিকার ধরে আনে—বাবু আড়ে গেলেন।

দালালি কাজটা ভাল, “নেপো মারে দইয়ের মতন” এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্র লোকেব ছেলেকে গাড়িঘোড়ায় চড়ে দালালি কস্তে দেখা যায়, অনেক “রেস্তাহীন মুচ্ছন্দী” “চার বার ইন্সাল্ভেন্ট” হয়ে এখন দালালি ধরেছেন। অনেক পদ্মলোচন দালালির দৌলতে “কলাগেছে থাম” কেঁদে ফেলেন—এঁরা বর্ণচোরা ঈঁব, এঁদের চেনা ভার, না পারেন হেন কর্তব্যই নাই। পেশাদার চোটাখোর বেণে—ও ব্যাভার বেণে বড় মানুষের ছলনারূপ নদীতে বেঁউতি জাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন, স্মৃতরাং মনের মতন কটাল হলে চুনোপুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জার ঘড়িতে চং চং চং করে সাতটা বেজে গ্যাল। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চার দিকে ঢাকের বাজি, ধূনের ধোঁা, আর মদের তুর্গন্ধ। সম্রাসীরা বাণ, দশলকি, স্মৃতোশোন, সাপ, ছিপ ও বাঁশ ফুড়ে একবারে মরিয়া হয়ে নাচতে নাচতে কালীঘাট থেকে আসচে। বেঙ্গালয়ের বারাণ্ডা ইয়ারগোচের ভদ্র লোকে পরিপূর্ণ, সকের দলের পাঁচালি ও হাপ্ আখড়ায়ের দোয়ার, গুলগার্ডেনের মেস্বরই অধিক,—এঁরা গাজোন জাখবার জন্ত ভোরের ব্যালা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুখে বড় মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্ছে। কেউ মিভিলিফেশনের অল্পরোধে চড়কহেট করেন। কেউ কেউ নিজে ভ্রাস্ত হয়েও—“স্নাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড” বলেই চড়কে আমোদ করেন ; বাস্তবিক তিনি এতে

বড় চট্টা, কি করেন, বড় দাদা, সেজো, গিসে বর্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনো কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণফোঁড়া, তরওয়ার ফোঁড়া দেখতে ভালবাসেন; প্রতিমা বিসর্জনের দিন পৌস্তুর, ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখতে বেরোন। অনেকে বুড়ো মিন্সে হয়েও হীরে বসান টুপি, বৃকে জরির কারচোপের কর্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তার মালা, হীরের কণ্ঠি, দুহাতে দশটা আংটি পরে “খোকা” সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয় ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর—ভাগ্নের চুল পেকে গ্যাছে।

অনেক পাড়ার্গেয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ করে থাকেন। নেজামত আদালতে নস্বরওয়ারী ও মোৎফরেকার তদ্বির কত্তে হলে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়ার্গেয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্বে পাড়ার্গেয়ে কলিকাতায় এলে লোনা লাগত, এখন লোনা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিষ লেগে থাকে—অনেকে তার দক্ষণ একবারে জাঁকে পড়েন—ঘাগিগোচের পাল্লায় পড়ে শেষ সর্বস্বাস্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাড়ার্গেয়ে দুই এক জন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান। ছুকুরবালা ফেটিং গাড়ী চড়া, পাঁচালি বা চণ্ডীর গানের পেলদের মতন চেহারা, মাথায় ফ্রেনের চাদর জড়ানো, জন দশ বারো মোসাহেব সঙ্গে, বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা—দেখলেই চেনা যায় যে, ইনি এক জন বনগাঁর শিয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহন্দ—বিজ্ঞায় মূর্ত্তিমান্ মা! বিসর্জন, বারোইয়ারী, খ্যামটা নাচ আর বুয়ের প্রধান ভক্ত—মধ্যে মধ্যে খুনী মামলার গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দক্ষণ গা ঢাকা দেন। রবিবার, পালপার্বণ বিসর্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে গুজে গাড়ি চড়ে বেরোন!

পাড়ার্গেয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ, দুই এক জন জমিদার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোনাগাজীতে বাসা করেও সে সঙ্গে বিভ্রত হন না; বরং তাঁদের চালচল দেখে অনেক সহরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর, বোড়স্তা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে, চকিষ ঘট। সোনাগাজীতেই কাটান, লোকের বাড়ি চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়ভার হাত ধরে যুগলবেশে জ্যাটা খুড়া বারান্ সঙ্গে পুলিশে হাজির হন, ধারে হাতী

কেমন? পেয়েচেন সময় ঠাণ্ডাঠাণ্ডি উপস্থিত হয়—পেড়াপেড়ি হলে দেশে সরে পড়েন,—সেখায় রামরাজ্য !

আজকে থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে সেই রকম পাড়ারগেয়ে বড় মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল পেশ ছন। দালাল, বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ির যোগাড় করা, খায়াট্টা নাচের বায়না করা প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটিকেল এজেন্টের কাজ করেন। সাড়পুতুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম—বাগির ত্রিঙ্গ, —বাগবাচারের খালের কলের দরজা—রকমওয়ারি বাবুর সাজান বৈঠকখানা,—ও ছুই এক নামজাদা বেশার বাড়ি নিয়ে বেড়ান। কোণ বুঝে কোণ ফেলতে পারলে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্সি কর্মে মকরর হন।

আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা ছুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল ‘উচুকেতা সাহেবের গোবরের বট’। দ্বিতীয় ‘ফিরিজীর জঘন্ত প্রতিরূপ’। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকার্টের ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাকনি, সাবু মোড়া,—হরকরা, ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পোলিটিয় ও বেই নিউস অব দি ডে নিয়েই সর্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কন্মোডে হাগেন এবং কাগজে পৌদ পৌচেন। এঁরা সহদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদগুণে ভূষিত, কেবল সর্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, জীর দাস,—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একবারে হৃদয় হতে নির্বাসিত হয়েছে ; এঁরাই ওন্ড ক্লাস !

দ্বিতীয়ের মধ্যে—বাগাবুর মিত্র প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র ; বলতে গেলে এঁরা এক রকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কতে গেলে মদ চৌটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ কেবল স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। ‘ক্যামন করে আপনি বড় লোক হব,’ ‘ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাকবে,’ এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পায়ের মাঝার কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার—চার আনার বেশী দান নাই।

সকাল বেলা সহরের বড় মানুষের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকীলের গাড়ির হেড কেরান্সী তীর্থের কাকের মত্ব বলে আছেন। তিন চারটি

“ইকুটি,” দুটি “কমন্ লা” আদালতে বুলচে। কোথাও পাওনারি, বিলম্বকার, উটনোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠি নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আঙ্গ না কাল কছেন। “শমন,” “ওয়ারিন,” “উকীলের চিঠি” ও “সকিনে” বাবুর অলঙ্কার হয়েছে। নিন্দা, অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা, মনে করে অন্তর্দাহ কচে “গ্যায়সা দিন নেহি রহেগা,” অঙ্কিত আংটি আঙ্গুলে পরেচেন ; কিন্তু কিছুতেই শাস্তি লাভ কস্তে পাচ্ছেন না।

কোথাও এক জন বড় মানুষের ছেলে অল্প বয়সে বিষয় পেয়ে কান্নে-খেকো খুঁড়ির মত ঘুচ্ছেন। পরশু দিন “বউ বউ” “লুকাচুরি” “ঘোড়া ঘোড়া” খেলেচেন, আজ তাঁকে দাওয়ানজীর কুটকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধস্তে হবে, উকীলের বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর রেখে সরে বসতে হবে, নইলে ওঠসার কিস্তিতেই মাৎ ! ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ হার,—কেউ “স্বর্গীয় কর্তার পরম বন্ধু,” কেউ স্বর্গীয় কর্তার “মেজো পিসের মামার খুড়োর পিস্তুতো ভেয়ের মামাতো ভাই” পরিচয় দিয়ে পেশ হচ্ছেন, “উমেদার” “কম্বাদায়” (হয় ত “কম্বাদায়ের” বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুটুচেন ; আসল মতলব স্বৈপায়ন হুদে ডোবান রয়েছে—সময়ে আমলে আসবে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েছে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পুরে গ্যাছে। নানা রকম রকম বেশ—কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, কপোর বগলস আঁটা শাইনিং লেদর, কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গাড চেন গলায়, আলবার্ট ফ্যাশানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই ; রাস্তার দু পাশে অনেক আমোদ গৌড়ে মহাশয়েরা দাঁড়িয়েচেন ; ছোট আদালতের উকীল, সেক্সন রাইটর, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে, তেলী, ঢাকাই কামার আর ফলারে বজ্রমেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে—কারু তিনটে ছেলে।

কোথাও পাদরি সাহেব বুড়ি বুড়ি বাইবেল বিলুচ্ছেন—কাচে ক্যাটিকুই ভান্স —স্ববর্ধন চৌকিদারের মত পোশাক—পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথার কাল রঙের চৌজাকাটা টুপি। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্মের মহাজ্ঞা ব্যক্ত কছেন—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো কাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা একমনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকুই কি বলছেন কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না ! পূর্বের বওয়াটে ছেলেরা বাপ খাঁর সঙ্গে বকড়া করে পশ্চিম পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হতো, কিন্তু রেলপথের

হুজুরাতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে—তার দিকী খ্রীষ্টানদের চুকশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয় !

চিংপুনের বড় রাস্তা মেঘ করে কাদা হয়—খুলোয় খুলো, তার মধ্যে ঢাকের পট্টরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে । প্রথমে ছুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা বড়ি বাঁশে বেঁধে কাঁদে করেচে—কতকগুলো ছেলে মুণ্ডরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে—তার পেচোনে এলোমেলো নিসেনের জ্ঞেণী । মধ্যে হাড়িরা দল বেঁধে ঢোলের সঙ্গতে “ভোলা বোম্ ভোলা বড় রজিলা লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা,” ভজন গাইতে গাইতে চলেচে । তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরওয়ান, হরকরা, সেপাই । মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং । তার পেচনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকী ফুঁড়ে খুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচতে নাচতে চলেচে । পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেচে । লম্বা লম্বা ছিপ্, উপরে শোলার চিড়িমাছ বাঁধা । সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ করে রং বাজাচ্ছে । পেচনে বাবুর ভাগ্নে, ছোট ভাই বা পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ী চড়ে চলেচেন—তারা রাত্রি তিনটির সময় উঠেচেন, চোক লাল টক্ টক্ কছে, মাখা ভবানীগুরে ও কালীঘেটে খুলোয় ভরে গিয়েছে । দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখেচেন, মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেপেচে—ছড়মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পড়চেন, রোজ্রে মাখা ফেটে যাচ্ছে—তথাপি নড়চেন না ।

ক্রমে পুলিশের হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল । সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেটঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উত্তরে গ্যাচে ; অমনি মার্শল ল জারি হলো, ঢাক বাজালে খানায় ধরে নিয়ে যাবে । ক্রমে ছই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কৌৎকা পড়বামাত্রই সহর নিস্তক হলো । অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কস্তে কস্তে বাড়ি ফিরে গেলেন ।

সহরটা কিছুকালের মত জুড়ুলো । বেণোরা বাণ খুলে মদের দোকানে চুকলো । সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাতপাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে কেলে । গাজনভলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো—এ বছরের মত বাণকৌড়ার আমোদও ফুরুলো । এই রকমে রবিবারটা দেখতে দেখতে গুটালো ।

আজ বৎসরের শেষ দিন । সুবহু কালের এক বৎসর গ্যালো দেখে সুবক

স্বভীরা বিষন্ন হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দিষ্ট কালের এক বৎসর কেটে গ্যাল দেখে আহ্লাদের পরিসীমা রইল না। আজ বুড়োটি বিদেশে নিলেন, কাল বুড়ি আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড়ো বৎসরের অধীনে আমরা যে সব কষ্ট ভোগ করেছি, যে সব ক্ষতি স্বীকার করেছি—আগামীর মুখ চেয়ে, আশার মন্ত্রণায় আমরা সে সব মনে থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জন দিলেম। ভূত কাল যেন আমাদের জ্যাংচাতে জ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্তমান বৎসর স্থূল মাষ্টারের মত গভীর ভাবে এসে পড়লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিম্মিত। জেলার পুরাণ হাকিম বদলি হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুকপুক করে, স্থূলে নতুন ক্লাসে উঠলে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুন্স গুন্স করে—মড়ুকে পোয়াতীর বুড়ো বয়েসে ছেলে হলে মনে যেমন মহান সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ইংরেজরা নিউ ইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ করে শ্রান—নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাজালিরা বছরটি ভাল রকমেই যাক আর খারাবেই শেষ হক, সঙ্গে খাড়া চিবিয়ে চাকের বান্ধি আর রাত্তার ধুলো দিয়ে পুরাণকে বিদায় শ্রান। কেবল কলসী উচ্ছৃগুণ্ড কর্তারা আর নতুন খাড়াওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কলসী উচ্ছৃগুণ্ড করবেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধুম করে কালাপূজা করেছিলেন ও বিশ্বাবিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি ত্রিবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ক্রটি করেন নি। আজকাল ব্রাহ্মধর্মের মর্ষ বোঝা ভার, বাড়িতে জুর্গোৎসবও হবে আবার ফি বৃধবারে সমাজে গিয়ে চকু মূজিত করে মড়াকাল্লা কাঁদতেও হবে। পরমেশ্বর কি খোঁটা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ তিন অঙ্ক ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বৃজতে পারবেন না—আড্ডা থেকে না ডাকলে শুনুতে পাবেন না; ক্রমে কুশানী ও ব্রাহ্মধর্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্ছে।

চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেছে মাখায় বিকলা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে। ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো। ময়মনসিংহ বাবুরা বড় বড় জুড়ি, কেটিং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানা রকম পোশাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েচেন, কেউ কাঁসারীদের সংয়ের মত পালকি গাড়ীর ছাত্তর উপর শবে চলেচেন—হোট লোক, বড় মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

আর ব্যার, ব্যার ব্যার, বললে বলে আমিও যাই—বায়ুন কারেডরা ক্রমে লক্ষ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ করলেন, ক্রমে ছোট ছোটের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদেশাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো—সন্ধ্যার পর হুগাহী আটা ও একটু জাবড়ানের বললে—কাউলকরী ও রোল্ ক্রটি ইন্ট্র ডিউস হলো। বস্ত্র-বাড়ি আহাৰ করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হলো, দেখে বোতলের দোকান, কড়িগণা, মাকুঠেলা ও ভালুকের লোম ব্যাচা কল্কেতায় থাকতে লক্ষিত হতে লাগলো। ধরকামান চৈতন্য ফকর জায়গায় আলবার্ট ফ্যাশান ভর্তি হলেন। চাবির থলো কাঁদে করে টেনা খুতি পরে দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না, সুতরাং অবস্থাগত জুড়ি, বগি ও ব্রাউহাম্ বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের হু এক জন ভদ্র লোক মোসাহেব, তকমা আরম্ভলী ও হরকরা দেখা যেতে লাগলো। ক্রমে কলে, কোশলে, বেগেতী বেসাতে, টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোট লোক বড় মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুন ওড়া, বাজি ও ষোড়ার নাচ এঁরাই রেখেচেন—প্রায় অনেকেরই এক একটি পোবা পাশ বালিস আছে—“যে আছে” ও “হজুর আপনি যা বলচেন, তাই ঠিক” বলবার জন্তে দুই এক গণ্ডমূর্থ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিঃশূল রয়েছে। শুভ কর্মে দানের দকার নবডকা! কিন্তু প্রতি বৎসরের গার্ডেন কিস্টের খরচে চার পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শিগ্গির ফুরায় না, বারোইয়ারি পূজোর প্রতিমা পূজো শেষ হলেও বারো দিন ক্যালা হয় না। চড়কও বাসী, পচা, গলা ও থলা হয়ে থাকে—সে সব বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় ও ক্রমে ভেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাটকা চড়ক টাটকা টাটকাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কডলার টিনের ঘুরঘুরি, টিনের মুহুরি দেওয়া তল্ভা বাঁশের বাঁশী, হলদে রং করা বাঁশারির চড়কগাছ, ছেঁড়া শাকড়ার তৈরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেলাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি বিক্রি কস্বে বলচে, “ড্যানাক ড্যানাক ড্যানাং ড্যান চিলিড়ি মাহের দুটো ঠ্যাং” চাকের বোল বাজে, গোলাপি থিলির দোনা বিক্রি হচ্ছে। এক জন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচতে নাচতে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি করে—মইয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চোঁয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে বাড়ি ধরে কখন ছেড়ে, পানি নেড়ে ফুটে লাগলো।

কেবল “দে পাক দে পাক” শব্দ। কার সর্বনাশ, কার পৌষ মাস! এক জনের পিঠ ভুঁড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোকে মজা দেখছেন।

পাঠক! চড়কের যথাকথঞ্চিৎ নকশার সঙ্গে কলিকাতার বর্তমান সমাজের ইন্সাইট জানলে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে, ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে, “সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালী”।

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা

“And these what name or title e’er they bear,

——I speak of all——”

Beggars Bush.

সৌখীন চড়কপার্বণ শেষ হলো বলেই যেন দুঃখে সম্মুখে খাড়া কেটে গেলেন। রাস্তার ধুলো ও কাঁকরেরা অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগলো। ঢাকীরা ঢাক কেলে জুতো গড়তে আরম্ভ করলে। বাজারে ছুদ সস্তা হলো (এত দিন গয়লাদের জল মেশাবার অবকাশ ছিল না), গন্ধবোনে ভালুকের রেঁ। বেচতে বসে গেলেন। ছুতরেরা গুলদার ঢাকাই উড়ুনিতে কাঠের কুচো বাঁধতে আরম্ভ করলে। জম্মফলারে যজ্ঞমেনে বায়ুনেরা আত্মশ্রদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাঁকতে লাগলেন—তাই দেখে গরমি আর থাকতে পারেন না, “ঘরে আগুন” “জলে ডোবা” ও “ওলাউঠা” প্রভৃতি নানা রকম বেশ ধরে চার দিকে ছড়িয়ে পড়লেন।

রাস্তার ধারের ফোড়ের দোকান, পচা নিচু ও আঁবে ভরে গ্যালো। কোথাও একটা কাঁটালের ভুঁতড়ির উপর মাচি ভ্যান ভ্যান করে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আঁটি ছড়ান রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘসে ভেঁপু করে বাজাচ্ছে। মধ্যে এক পসলা বিষ্টি হয়ে যাওয়ায় চিংপুরের বড় রাস্তা ফলারের পাড়ের মত ভাখাচ্ছে,—কুটিওয়ালারা জুতো হাতে করে বেশালয়ের বারাগুর নীচে আর রাস্তার ধারের বেগের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন,—আজ ছকড় মহলে পোহাবারো।

কলকেতার কেরাফি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক, (গ্যালব্যানিক শব্দের) কাজ করে। সেকলে আসমানি দোলদার ছকড় যেন হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে কলকেতা থেকে গাটকা হয়েছে—কেবল ছই একখানা আজও খিদিরপুর,

ভবানীপুর, কালীঘাট আর বারামতের মায়া ভাষ্য কহে পারে নি বলেই আমরা কখন কখন দেখতে পাই।

“চার আনা!” “চার আনা!” “লালদিকি!” “ভেরজুরী!” “এসো গো বাবু ছোট আদালত!” বলে গাড়োয়ানরা সৌধীন সুরে চীৎকার কহে,—নবজাগমনের বউয়ের মত দুই এক কুটিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আছেন—সঙ্গী জুটে চেনা। দুই এক জন গবর্নেন্ট আপিসের ক্যারানী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কছেন। অনেকে চটে হেঁটেই চলেচেন,—গাড়োয়ানরা হাসি টিটকিরি সঙ্গে “তবে কীকা মুটেয় বাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্তব্য নয়!” কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে!

দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কহে কহে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জম্‌চেন। হেটো ব্যাপারীরা বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। কলকাতা সহর বড়ই গুলজার,—গাড়ির হুদা, সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাক্তির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।

বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিমখালা রকমের ছকড়ু ভাড়া করে বারোইয়ারি পুজার বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন।

বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবলচাঁদ দাঁর পুস্ত্রিপুস্তুর, হাটখোলায় গদি; দশ বারোটা খল্ল মালের আড়ত, বেলেঘাটার কাটের ও চুণের পাঁচখান গোলা, নগদ দশ-বারো লাক টাকা দানন ও চোটায় খাটে! কোম্পানির কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেন দেন হয়ে থাকে, বারো মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল পুজোর সময় দশ বারো দিনের জন্ত বাড়ি যেতে হয়; একখানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোলাহেব, গড়পারে বাগান ও হ-র্ডেডে এক ভাউলে ব্যাত্যার, আয়েস ও উপাসনার জন্তে নিয়ত হাজির।

বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্রামবর্ণ, বেঁটে বেঁটে রকমের মাজুখ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, হাতে সোনার তাগা, কোমরে মোটা সোনার গোট, গলায় এক ছড়া সোনার হু-নর হার, আহ্নিকের সময় খ্যাল্‌বার তাসের মত চ্যাটালো সোনার ইটিককচ পরে থাকেন, গজান্নানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কাণে ফোটাও কাঁক বাস না। দাঁ মহাশয় বাঙলা ও ইংরাজি নাম সই কহে পারেন ও ইংরেজ খদ্দেরের আলা বাওয়ার ও ছ চার ইংরাজি কোম্পানির কনট্রাইবুট “কম” আইন, “গো” বাও

প্রকৃতি দুই এক ইংরাজি কথাও আসে, কিন্তু দী মহাশয়কে বড় কাজকর্ম দেখতে হতো না, কানাইধন দত্তই তাঁর সব কাজকর্ম দেখতেন, দী মহাশয় তাঁনা পাখার বাতাস খেয়ে, বগি চড়ে, আর এসবাজ বাজিয়েই কাল কাটান।

বারো জনে একত্র হয়ে কালী বা অশ্ব দেবতার পূজা করার প্রথা মরক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি “মা” ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার, দোকানদার ও হেটোরাই বারোইয়ারি পূজার প্রধান উভোগী। সত্বৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়, মণ পিছু এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসরের দস্তুরি বারোইয়ারি খাতে জমলে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ারগোচের সৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বারোইয়ারি পূজার অধ্যক্ষ হন—অশ্ব চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্ত ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রংতোমাসার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।

এবার টাকার বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সুতরাং দী মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন দত্তই বারোইয়ারির বার্ষিক সাদা ও আর আর কাজের ভার পেয়েছিলেন।

দস্ত বাবুর গাড়ি কন্স কন্স ছুন্স ছুন্স করে হুড়িঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড় মানুষের বাড়ির দরজায় লাগলো। দস্ত বাবু তড়াক করে গাড়ি থেকে লাগিয়ে পড়ে দরওয়ানদের কাছে উপস্থিত হলেন। সহরের বড় মানুষের বাড়ির দরওয়ানরা খোদ হজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক! “হোরির বকসিস” “দুর্গোৎসবের পার্বসী” “রাখি পূর্ণিমার প্রণামী” দিয়েও মন পাওয়া ভার! দস্ত বাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কবলে এক জন দরওয়ানকে বাবুকে এংলা ঘিটে সম্মত কল্লেন। সহরের অনেক বড় মানুষের কাছে “কর্জ দেওয়া টাকার সুদ” বা তাঁর “পৈতৃক জমিদারী” কিন্তে গেলেও বাবুর কাছে এংলা হলে, হজুরের হুকুম হলে লোক যেতে পায়; কেবল দুই এক জারগায় অব্যাহত যার! এতে বড় মানুষদেরো বড় দোষ নাই, “ব্রাহ্মণ পণ্ডিত” “উমদার” “কস্তাদার” “আইবুড়ে” ও “বিদেশী ব্রাহ্মণ” ভিক্কুদের আলায় সহরে বড় মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এঁদের মধ্যে কে মোতাজের চানাটানির আলায় বিব্রত, কে যথার্থ দারওয়ান, এপিডেনটি কল্লেনও বিশ্বাস হয় না! দস্ত বাবু আথ ঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, এর মধ্যে দশ বারো জনকে পরিচয় দিতে হলো, তিনি কিসের জন্তে হজুরে এসেছেন—ও দুই একটা বেরাড়া রকমের দরওয়ানি ঠাঠা খেয়ে গরম

হরিহরেন, এমন সময় তাঁর চার আনা দাছনে দরওয়ান চিকুতে চিকুতে এসে তাঁর সঙ্গে করে নিয়ে হজুরে পেশ করলে।

পাঠক! বড় মানুষের বাড়ির দরওয়ানের কথায় এইখানে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে গ্যালো, সেটি না বলেও থাকা যায় না।

বছর দশ বারো হলো, এই সহরের বাগবাজার অঞ্চলের এক জন ক্ষত্র লোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকতক ক্রেণ্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের মিমন্ত্রণ করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয়, আমরা পুরুষপরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুধ খেয়ে, তিল বুন, মাছ ছেড়ে, (যার বেধন প্রথা) নতুন কাপড় পরে, প্রদীপ জ্বলে, শাঁখ বাজিয়ে, আইবুড় ভাত খাবার মত—কুটুখ বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজ কাল সহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতরগোছের আমোদ করে থাকেন। কেউ যেটের কোলে বাট বৎসরে পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের একশেষ করেন; অভিপ্রায় আপনারা আশীর্বাদ করুন, তিনি আর ষাট বছর এমনি করে আমোদ কস্তে থাকুন, চুলে ও গোঁপে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠি পরে নাচ দেখতে বসুন,—প্রতিমে বিসজ্জন—স্নানযাত্রা ও রথে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তুল্লদের গা সার্তে আপিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগবাজারের বাবু সে রকমের কোন দিকেই যান নি, কেবল গুটিকতক ক্রেণ্ডকে ভাল করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এদিকে ভোজের দিন নেমন্তুল্লেরা এসে একে একে জুটলেন, খাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সে দিন সকালে বাদলা হওয়ায় মাছ পাওয়া যায় নি। বাজালিদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্মকর্তা মাছের জন্ত বড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন; নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া শেল না—শেষ এক জন জেলে একটা সের দশ বারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হলো। মাছ দেখে কর্মকর্তার খুসির আর সীমা রইলো না। জেলে যে দাম বলবে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বাপু, এটির দাম কি নেবে? ঠিক বল, তাই দেওয়া যাবে।” জেলে বলে, “মশাই! এর দাম বিশ ঘা জুতো!” কর্মকর্তা “বিশ ঘা জুতো!” শুনে অবাক হয়ে রইলেন, মনে করলেন, জেলে বাদলা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, না হয় ত পাগল, কিন্তু জেলে কোন ক্রমেই বিশ ঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না, এই তাঁর পণ

হলো। নিমন্ত্রণে বাড়ির কর্তা ও চাকরবাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য্য দাম শুনে তারে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা মস্করা কতে লাগলো, কিন্তু কোন রকমেই জেলের গৌঁ বুচ্‌লো না। শেষে কর্তৃকর্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আন্তে আন্তে জেলেকে বিশ ঘা জুতো মাতে রাজি হলেন, জেলেও অগ্নান বদনে পিঠ পেতে দিলে। দশ ঘা জুতো জেলের পিটে পড়বামাত্র, জেলে “মশাই! একটু থামুন, আমার এক জন অংশীদার আছে, বাকি দশ ঘা সেই থাকে, সে আপনার দরওয়ান দরজায় বসে আছে, তারে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ীর জিতর মাছ নিয়ে আসছিলাম, তখন মাছের অদেক দাম না দিলে আমারে চুকতে দেবে না বলেছিল, সুতরাং আমিও অদেক বকরা দিতে রাজি হয়েছিলাম।” কর্তৃকর্তা তখন বুঝতে পাল্লেন, জেলে কি জন্তু মাছের দমে বিশ ঘা জুতো চেয়েছিল। দরওয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বক্রার জন্তু প্রতীক্ষ করে থাকতে হলো না; কর্তৃকর্তা তখনি দরওয়ানজীকে জেলের বিশ ঘার অংশ দিলেন। পাঠক বড় মানুষেরা! এই উপস্থাসটি মনে রাখবেন।

হজুর দেড় হাত উঁচু গদির উপরে তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছেন, গা আছড়! পাশে মুনসি মশায় চস্‌রা চোকে দিয়ে পেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ কছেন—সামনে কতকগুলো খোলা খাতা ও এক বুড়ি চোতা কাগজ, আর এক দিকে চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবুকে “কৃষ্ণজন্মা” “যোগভ্রষ্ট” বলে তুষ্ট করবার অবসর খুঁজেন। গদির বিশ হাত অন্তরে ছ জন বেকার “উমেদার” ও এক জন বৃদ্ধ “কছাদায়” কাঁদ কাঁদ মুখ করে ঠিক “বেকার” ও “কছাদায়” হালতের পরিচয় দিচ্ছেন। মোসাহেবরা খালি গায়ে ঘুরঘুর কছেন, কেউ হজুরের কাণে কাণে ছচার কথা কছেন—হজুর ময়ূরহীন কার্ত্তিকের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন। দস্ত বাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন।

হজুর বারোইয়ারি পূজোর বড় ভক্ত, পূজোর কদিন দিবারাজি বারোইয়ারি-তলাতেই কাটান, ভাগ্নে, মোসাহেব, জামাই ও ভগিনীপতিরা বারোইয়ারির জন্তু দিনরাত শশব্যস্ত থাকেন।

দস্ত বাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা করে হজুরি সবিস্ক্রিপশন্ হাজার টাকা নিয়ে বিদেশে নিলেন, পেমেন্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা ছ টাকার হিসাবে দস্তুরি কেটে শ্রান, দস্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবে ও দাওয়ানজীকে ধুসি রাখবার জন্তু তাতে আর কথা কইলেন না। এদিকে বাবু বারোইয়ারি পূজোর ক রাত্তির কোন্‌কোন্‌ রকম পোশাক পরবেন, তারই বিবেচনায় বিভ্রত হলেন।

কানাই বাবু বারোইয়ারি বই নিয়ে না খেয়ে বেলা দুটো অবধি নানা স্থানে ঘুরলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও মস্ত টাকা সহই মাত্র হলো (আদায় হবে না, তার ভয় নাই), কোথাও গলা ধাকা, তামাশা ও ঠোনাটা ঠানাটাও মইতে হলো ।

বিশ বছর পূর্বের কলকাতার বারোইয়ারি চাঁদা সাদারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনা সাদার মত লোকের উনোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কতেন—অনেকে ছোটের কথা কয়ে বড় মানুষদের ছুট করে টাকা আদায় কতেন ।

একবার এক দল বারোইয়ারি একচক্ষু কাণা এক সোনারবেণের কাছে চাঁদা আদায় কতেন যান । বেণে বাবু বড়ই কুপণ ছিলেন, “বাবার পরিবারকে” (অর্থাৎ মাকে) ভাত দিতেও কষ্ট বোধ কতেন, তামাক খাবার পাতের শুকুনো নলগুলি জমিয়ে রাখতেন, এক বৎসরের হলে ধোবাকে বিক্রি কতেন, তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উশুল হতো । বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা বেণে বাবুর কাছে চাঁদার বই ধলে তিনি বড়ই রেগে উঠলেন ও কোন মতে এক পয়সাও বারোইয়ারিতে বেজায় খরচ কতেন রাজি হলেন না, বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা অনেক ক্ষণ ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন, কিন্তু বাবুর বেজায় খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না—তামাক গুলি পাকিয়ে কোম্পানির কাগজের সঙ্গে বাস্তমধ্যে রাখা হয়—বালিসের ওয়াড়, ছেলেদের পোশাক, বেণে বাবু অবকাশমত শহজেই সেলাই করেন—চাকরদের কাছে (এক জন বুড়ো উড়ে মাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেঁরার দিনে ছবার নিকেশ নেওয়া হয়—ধূতি পুরণো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন—বেণে বাবুর ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, এ সওয়ায় তার সুদ ও চোড়ায় বিলক্ষণ দশ টাকা আসতো, কিন্তু তার এক পয়সা খরচ কতেন না । (পৈতৃক পেশা) খাঁটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কতেন, তাতেই সংসার নির্বাহ হতো ; কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটা চক্ষু, কিন্তু চসমায় ছুখানি পরকোলা বসান ; তাই দেখে বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন, “মশাই ! আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েছে, হয় চসমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন ।” বেণে বাবু এ কথায় খুসি হলেন, শেষে অনেক কষ্টে দুটি সিকি পরীক্ষা দিতে সম্মত হয়েছিলেন ।

আর একবার এক দল বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ সহরের সিংগি বাবুদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত, সিংগি বাবু সে সময় আগিমে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষরা তার

পাঁচ জনে তাঁকে ঘিরে ধরে “ধরেছি” “ধরেছি” বলে চোঁচাতে লাগলেন। রাস্তায় লোক জমে গ্যালো। সিংগি বাবু অবাক—ব্যাপারখানা কি? তখন এক জন অধ্যক্ষ বল্লেন, “মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গার বারোইয়ারি পূজোয় যা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাস থেকে আসছিলেন, পথে সিংগির পা ভেঙ্গে গ্যাছে; সুতরাং তিনি আর আসতে পাচ্চেন না, সেইখানেই রয়েছেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েচেন যে, যদি আর কোন সিংগির যোগাড় কতে পার, তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না; আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েছি, কোন মতে ছেড়ে দেবো না—চলুন! যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্বির করবেন।” সিংগি বাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।

এ ভিন্ন বারোইয়ারি চাঁদা সাধার বিষয়ে নানা উত্তট কথা আছে, কিন্তু এখানে সে সকল উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। পূর্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি পূজো আর কোথাও হতো না, “আচাভো” “বোম্বাচাক” প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো; সহরের ও নানা স্থানের বাবুর বোট, বজ্রা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখতে যেতেন; লোকের এত জনতা হতো যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিলো, চোরেরা আঙুল হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু গরিব ছুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়ে নি। গুপ্তিপাড়া, কাঁচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকাতার নিকটবর্তী পল্লীগ্রামে ক বার বড় ধুম করে বারোইয়ারি পূজো হয়েছিলো। এতে টকরাটকরিও বিলক্ষণ চলেছিলো। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পূজো করেন; সাত বৎসর ধরে তার উজ্জ্বল হয়, প্রতিমেধানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন কতে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা “মার” অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁদে এক বারোইয়ারি পূজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

এখন আর সে কাল নাই; বাজালি বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েছেন। গোলাপজল দিয়ে জলশোচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তভঙ্গের চূর্ণ দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েয় লাক টাকা খরচ, যাত্রায় মোট প্যালা, ডেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ী চড়ে ভেঁগু বাজিয়ে স্নান কতে যাওয়া সহরে অতি কম হয়ে পড়েছে। আজ্ঞা হজুর, উঁচুগতি, কার্তিকের মত বাউরি চুল,

এক পাল বরাথুরে মোসাহেব, রক্তিত বেস্তা আর পাকান কাছা—জলন্ত আর তুমিকম্পোর মত “কখনোর” পাল্লায় পড়েছে !

কান্না শু ব্রাহ্মণ বড় মানুষ (পাড়ার্গেয়ে ভুতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে করা মোসাহেব রাখেন না ; কেবল সহরে দু চার বেগে বড় মানুষই মোসাহেবদের ভাগ্যে স্ত্রুপসন্ন । বুক ফোলান, বাঁকা সিঁতি, পইতের গোচ্ছা গলায়, কুঁচের মত চক্ষু লাল, কাণে তুলোয় করা আতর, (লেখা পড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিশ্বভিক্রমে বর্ণপরিচয়টি হয় নাই) আমরা খালি সোনারবেগে বড় মানুষ বাবুদের মজলিশে দেখতে পাই ।

মোসাহেবী পেশা উঠে গেলেই, “বারোইয়ারি” “খ্যামটা” “চোহেল” ও “কব্বার” লাঘব হবে সন্দেহ নাই !

সন্ধ্যা হয় হয় হয়েছে—গয়লারা ছুদের হাঁড়া কাঁদে করে দোকানে যাচ্ছে । মেচুনীরে আপনাদের পাটা, বাঁটি ও চুবড়ি ধুয়ে শ্রদীপ সাজাচ্ছে । গ্যাসের আলো আলা যুটেরা মই কাঁদে করে দৌড়ছে—খানার সামনে পাহারাওলাদের প্যারেড (এঁরা লড়াই করবেন, কিন্তু মাতাল দেখে ভয় পান) হয়ে গিয়েছে । ব্যাক্সের ভেটো কেরাণীরে ছুটি পেয়েচেন । আজ এ সময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড় ধুম—অধ্যক্ষেরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারই নমুনো দেখাবেন ; কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে ; দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত ।

ফৌজদারী বালাখানা থেকে ভাড়া করে এনে কুড়িটি বেল লানঠন (রং বেরং—লাদা, গ্রিন, লাল) টাঙ্গান হয়েছে । উঠোনে প্রথমে খড়, তার উপর দরমা, তার উপর মাদ্রাজী খেরোর জাজিম হাস্চে । দাঁড়িপাল্লা, চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে, গণি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আশপাশ থেকে উঁকিঝুকি মাচ্ছে—আজ তারা ধরজামাই ও অন্নদাস ভাগ্নেদের দলে গণ্য !

বীরকৃষ্ণ বাবু ধূপছায়া ঢেলীর জোড় ও কলার কপ ও প্রেটওয়াল (বাড়ের গোলাপের মত) কামিজ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্ছেন, রুমালটি কোমরে বাঁদা আছে—সোনার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর বড়ির চেনের অকিসিয়েটিং হয়েছে !

পাঠক ! নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অন্ত গ্যালো । মেঘাস্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো । বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো । রক্তিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো । ‘নবো মুম্‌সি, ছিরে বেগে, ও

পুঁটে তেলি রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাব, ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত, রাস্তায় পাদাড়ে ও ভাণ্ডাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসব যেতে লাগলো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম, কবির মান, বিজ্ঞার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জঙ্গগ্রহণ কল্লে। সহরের বুঝদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদফরাস, কেঠা বাগদী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্কেতার কায়ত বামুনের মুকুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো। এই সময়ে হাফ আখড়াই ও ফুল আখড়াই সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি সহরের বড় মানুষরা হাফ আখড়াইয়ে আমোদ কল্লে লাগলেন। শামবাজার, রামবাজার, চক ও সাকোর বড় বড় নিষ্কর্মা বাবুরো এক এক হাফ আখড়াই দলের মুকুব্বী হলেন। মোলাহেব, উমেদার, পাড়া ও দলস্থ গেরন্তগোছ হাড়হাবাতেরা সৌখীন মোহরের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ আখড়াইয়ের পুণ্যে চাকরি জুটে গ্যালো। অনেকে পুজুরী দাদাঠাকুরের অবস্থা হতে একেবারে আমীর হয়ে পড়লেন—কিছু দিনের মধ্যে তক্কা, বাগান, জুড়ি ও বালাখানা বনে গ্যালো।

আমরা পূর্বের পাঠকদের যে বারোইয়ারি পূজোর কথা বলে এসেছি, বীরকৃষ্ণ দাঁর উজ্জুগে প্রথম রাস্তির বারোইয়ারিতলায় হাফ আখড়াই হবে, তবে উজ্জুগ হচ্ছে।

ধোপাপুর লেনের ছুইয়ের নদ্বর বাড়ীটিতে হাফ আখড়াইয়ের দল বসেচে—বীরকৃষ্ণ বাবু বগি চড়ে প্রত্যাহ আড্ডায় এসে থাকেন—দোয়াররা কুটী থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ করে রাস্তির দশটার পর একত্রে জমেয়াৎ হন—ঢাকাই কামার, চাষা ধোপা, পুঁটে তেলি ও ফলারে বামুনই অধিক। মুখুয্যেদের ছোট বাবু অধ্যক্ষ! ছোট বাবু ইয়ারের টেকা, বেস্তার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেশায় শিবের বাবা! শরীর ডিগডিকে, পইতে গোচ্ছা করে গলায়, দাঁতে মিশি, প্রায় আধ হাত চেটালো কালা ও লালপেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি পরে থাকেন। ডেড় তরি আফিম, ডেড় শ হিলিম গাঁজা ও এক জালা তাড়ি রোজ্জী মোতাতের উটুনা বন্দোবস্ত। পালপার্বণে ও শনিবারে বেশী মাত্রায় চড়ান।

অমাবস্তার রাস্তির—অন্ধকারে ঘুরঘুটি—গুড় গুড় করে ঘেঘ ডাকচে—থেকে থেকে বিছাৎ নলপাচ্ছে—গাছের পাতাটি নড়্চে না—মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্ছে—পথিকেরা এক একবার আকাশ পানে চাচ্ছেন, আর হন্ হন্ করে

চলেছেন। কুকুরগুলো খেটে খেটে কচ্চে—দোকানীয়ে কাপড়াকা বন্ধ করে ঘরে যাবার উদ্দেশ্য কচ্চে ;—গুড়ুম করে নটার ভোপ পড়ে গ্যালো। ধোপাপুকুর লেনের ছইয়ের নখরের বাড়ীতে আজ বড়ই ধুম। ঢাকার বীরকুকু বাবু, চক বাজারের প্যালানাথ বাবু, দলপতি বাবুরো ও ছচার গাইয়ে বাজিয়ে ওস্তাদদাও আসবেন। গাওনার সুর বড় চমৎকার হয়েছে—দোয়াররাও মিল ও ভাল-দোরস্ত।

সময় কাকুরই হাত ধরা নয়—নদীর শ্রোতের মত—বেস্তার ঘোবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত কাকুরই অপেক্ষা করে না। গির্জের ঘড়িতে টং টং টং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠলো—রাস্তার ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড়মড় কড়মড় ডাক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুতুলী পাকতে আরম্ভ করে—যুথলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।

এদিকে ছইয়ের নখরের বাড়ীতে অনেকে এসে জমতে লাগলেন। অনেকে সখের অমুরোধে ভিজ্ঞে ঢ্যাপঢ্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জলচে—মজলিশ জক্ জক্ কচ্চে—পান, কলাপাতের এঁটো নল ও থেলো ছাঁকোর কুরুক্ষেত্র! যুথুযোদের ছোট বাবু লোকের খাতির কচ্চেন—“ওরে” “ওরে” করে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। তেলি, ঢাকাই কামার ও চাষা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফিনি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেব্‌ডান লুসে করসা ধুতি চাদরে কিটু হয়ে বসে আছেন—অনেকের চক্ষু বুজে এসেচে—বাতির আলো জোনাকি পোকাকর মত দেখ্‌ছেন ও এক একবার ঝিমঝিমি ভাংলে মনে কচ্চেন যেন উড়্‌চি! ঘরটা লোকারণ্য—খাতায় খাতায় ঘিরে বসে আছেন—থেকে থেকে ফকুড়িতে টল্লাটা চলচে—অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতোজোড়াটি হয় পকেটে নয় পার নীচে রেখে চেপে বসেছেন—জুতো এমন জিনিষ যে, দোয়ার দলের পরম্পরে বিশ্বাস নাই! চকবাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্দ রয়েছে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। হু এক জন ধবুতা দোয়ার প্যালানাথ বাবুর আসবার অপেক্ষায় থাকতে বেজার হচ্চেন—হু এক জন “তাই,ত” বলে দাদার বোলে বোল দিচ্চেন ; কিন্তু প্যালানাথ বাবু বারোইয়ারির এক জন প্রধান ম্যানেজার, সৌধীন ও খোসপোশাকীর হদ্দ ও ইয়ারের প্রাণ! স্মৃতরাং কিছুক্ষণ তাঁর অপেক্ষা না কলে তাঁরে অপমান করা হয়—বড়ই হোক, বজ্রাঘাতই হোক, আর পৃথিবী কেন রসাতলে থাক না, তাঁর এসব বিষয়ে এমনি লখ যে, তিনি অবশ্যই আসবেন।

ধবুতা দোয়ার গোবিন্দ বাবু বিরক্ত হয়ে নাকী-সুরে “মনালে বঁদিয়া” জিকুর

টপা ধরেন—গাঁজার হাঁকো একবার এ থাকের পাশ মেরে ও থাকে প্যাঁলো। ঘরের এক কোণে হাঁকো থেকে আস্তন পড়ে যাওয়ায় সে দিকের থাকেরা রক্তা করে উঠে দাঁড়িয়ে কৌচা ও কাপড় ঝাড়ছেন ও কেমন করে পড়লো প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্ছেন—এমন সময় একখান গাড়ী গড়্ গড়্ করে এসে দরজায় লাগলো। যুথুযোদের ছোট বাবু মজলিস থেকে তড়াক্ করে লাপিয়ে উঠে বারান্দায় গিয়ে “প্যালানাথ বাবু! প্যালানাথ বাবু এলেন” বলে চৈঁচিয়ে উঠলেন—দোয়ারদলে ছব্রে ও রৈ রৈ পড়ে গ্যালো—টোলে রং বেজে উঠলো। প্যালানাথ বাবু উপরে এলেন—শেকহাণ্ড, গুড্ ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুকতে আদ ঘণ্টা লাগলো।

চকবাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখঁটে মানুষ, গত বৎসর পঞ্চাশ পেরিয়েছেন; বাবু বড় হিন্দু—একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোস ও উখান ও শয়নে নিজ্জলা করে থাকেন, বাবুর মেজাজ গরিব! সৌখীনের রাজা! ১৮১৯ সালে সারবর্ন সাহেবের নিকটে তিন মাস মাত্র ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছিলেন, সেই সম্বলেই এত দিন চল্চে—সর্বদা পোশাক ও টুপি পরে থাকেন; (টুপিটি এমনি হেলিয়ে হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে, বাবুর ডান কাণ আচে কি না হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়) লক্কো ফ্যাশানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমত পোশাক। প্যালানাথ বাবুর বাই ও খ্যাম্টা মহলে বড় মান! তাদের কোন দায় দফা পড়লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন ও বাইয়ের অনুরোধে হিন্দুয়ানি মাথায় রেখে কাছা খুলে ফয়তা দেন ও বারোইয়ারের নামে তসবি পড়েন। মোসলমান মহলেও বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। অনেক লক্কোয়ে পাতি ও ইরানী চাঁপদাড়ি বাবুর বৃক্ষকি ও কেরামতের অনিয়ত এনসাফ্ করে থাকেন! ইংরিজি কেতা বাবুর ভাল লাগে না; মনে করেন, ইংরিজি লেখাপড়া শেখা শুদ্ধ কাজ চালাবার জন্ত। মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবা রাত্তির থেকে ঐ কেতাই এঁর বড় পচন্দ! সর্বদাই নবাবী আমলের জাঁকজমক, নবাবী আমিরী ও নবাবী মেজাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া হয়।

এদিকে দোয়াররা নতুন সুরের গান ধরেন। ধোপাপুকুর রন্ রন্ কন্ডে লাগলো—সুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চম্কে উঠলো—কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠলো—বোধ হতে লাগলো যেন হাড়ীয়ে গোটাকতক গুলার ঠেকিয়ে মারচে। গাওনার নতুন সুর শুনে সকলেই বড় খুসি হয়ে সাবাস! বাহবা!

ও শোভাস্বরীর বৃষ্টি কস্তে লাগলেন—দোরাররা উৎসাহ পেয়ে বিত্তপ চোঁচাতে লাগলো, সমস্ত দিন পরিশ্রম করে খোপারা অঘোরে সুস্থিহিলো, পাঁচটার বেতরো আওয়ারে চমকে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়লো!—রাতিব ছুটো পর্যন্ত গাঙনা হয়ে শেষে সে রাত্তিরের মত বেদব্যাল বিজ্ঞান পেয়ে—দোয়ার, সৌখীন বাবু ও অধ্যক্ষরা অন্ধকারে অতি কষ্টে বাড়ি গিয়ে বিছানায় আড় হলেন!

এদিকে বারোইয়ারিডলার সং গড়া শেষ হয়েছে। এক মাস মহাভারতের কথা হচ্ছিলো, কাল তাও শেষ হবে; কথক বেদীর উপর বসে বুঝাৎসর্গের বাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কছেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্ছে, বস্তুত যা বলছেন, সকলি কাশীরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক। কথকতা পোশাটা ভাল—দিব্য জলখাবার, দিব্য হাতপাখার বাতাস, কেবল মধ্য মধ্য কোন কোন স্থলে আহার বিহারের আনুযজিক প্রহারটা সইতে হয়, সেইটেই মহান্ কষ্ট। পূর্বে কথক শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন; ক্রীধর অল্প বয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন। বর্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা, চাণক্যলোকের ছু আঁখর পাঠ, কীর্তন অঙ্গের ছুটো পদাবলী মুখস্থ করেই মজুরা কস্তে বেরোন ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন। কথ্য শোনবার ও সং জাখবার জন্তে লোকের অসম্ভব ভিড় হয়েছে—কুমোর, ডাকওয়ারা ও অধ্যক্ষরা খেলো ছাঁকোর তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও মিছেমিছি টেঁচিয়ে গলা ভাংছেন! বাজে লোকের মধ্যে ছু এক জন আপনার আপনার কর্তৃক জাখবার জন্তে “তকাৎ তকাৎ” কছে, অনেকে গোছালো গোছের মেয়েমানুষ দেখে সঙের তরজমা করে বোঝাচ্ছেন! সংগুলি বর্জমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত, বুঝিয়ে না দিলে মর্ষ গ্রহণ করা ভার!

কোথাও ভীষ শরশয্যায় পড়েছেন—অর্জুন পাতালে বাণ মেরে ভোগবতীর জল তুলে খাওয়াচ্ছেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে ছুর্যোধন ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে রয়েছে। সঙেদের মুখের হাঁচ ও পোশাক সকলেরই একরকম, কেবল ভীষ ছুদের মত সাদা, অর্জুন ডেমার্টিনের মত কালো ও ছুর্যোধন ধীন।

কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বক্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আকিমের দালালের মত পোশাক পরে বসে আছেন। কালিদাস, ঘটকর্ণ, বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চার দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সকলেরই

এক রকম খুতি, চাদর ও টিকি ; হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন এক দল অগ্রদানী ক্রিমাবাড়ি ঢোকবার জন্য দরওয়ানের উপাসনা কচ্ছে !

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোটালরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—শ্রীমন্তের মাথায় শালের শামলা হাক ইংরিজি গোছের চাপকান ও পায়জামা পরা ; ঠিক যেন এক জন হাইকোর্টের স্লিভার স্লিড কচ্চেন !

এক জারগায় রাজপুত্র যজ্ঞ হচ্ছে—দেশ দেশান্তরের রাজারা চার দিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম কচ্চেন, রাজাদের পোশাক ও চেহারা দেখলে হঠাৎ বোধ হয় যেন, এক দল দরওয়ান স্তাকুরার দোকানে পাহারা দিচ্ছে !

কোনখানে রাম রাজা হয়েচেন—বিভীষণ, জাম্বুবানু, হনুমান ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা সহরে মুচ্ছন্দী বাবুদের মত পোশাক পরে চার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেচেন—শক্রব্র ও ভরত চামর কচ্চেন—রামের বাঁ দিকে সীতে দেবী ; সীতের ট্যাড়চা সাড়ী, ঝাঁপটা ও ফিরিজি খোঁপার বেহুদ বাহার বেরিয়েছে !

“বাইরে কোঁচার পস্তন ভিতরে ছুঁচোর কেস্তন” সং বড় চমৎকার !—বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিকের ক্রমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন অথচ থাকবার ঘর নাই, মাসীর বাড়ি অল্প লুসেন, ঠাকুরবাড়ি শোন, আর সেনেদের বাড়ি বসবার আঁডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিকর্শেশনের জন্তে রাস্তিরে ঘুম হয় না। (মশারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ)। পুলিশ, বড় আদালত, টালার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্রবে হাঁক ছাড়েন—গোয়েন্দাগিরি, দালালি, খোসামুদি ও ঠিকে রাইটরি করে যা পান, ট্যাসলওয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কস্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায় ! সুতরাং মিনি মাইনের স্কুলমাষ্টারি কখন কখন স্বীকার কস্তে হয় !

কোথাও “অসৈরগ সৈতে নারি শিকের বসে কুলে মরি” সং—অসৈরগ সহিতে নারি মহাশয়, ইয়ং বাজালদের টেবিলে খাওয়া, পেন্টুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাভের বিলাতী কট চাপকান পরা ! (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চসমা ! রাস্তিরে খানায় পড়ে ছুঁচো ধরে খান ! দিনের ব্যালা রিকর্শেশনের স্পিচ্ করেন দেখে—শিকের কুলেচেন !

এ জওয়ার বারোইয়ারিকলাস “ভাল কস্তে পারবো না মন্দ করবো কি দিবি

তা দে” “বুক ফেটে দরোজা” “বুটে পোড়ে গোবর হাসে” “বাঁদা পুতের নাম পজলোচন” “মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপার” “হাড় হাবাতে মিহরির ছুরি” প্রভৃতি নানাবিধ সং হয়েছে ; সে সব আর এখানে উত্থাপন করার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রতিমের ছু পাশে “বকা ধার্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবে”র সং বড় চমৎকার হয়েছে। বকা ধার্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মত ছুছুর নাছুর—ছুঁড়িটি বিলাতী কুমড়োর মত—মাতায় কামান চৈতন্যকর। কুঁটি করে বাঁদা—গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গুটিকতক সোনার মাছলি—হাতে ইষ্টিকবচ—চুলে ও মৌপে কলপ দেওয়া—কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ—গত বৎসর আশী শেরিয়েচেন—অঙ্গ জ্বিতঙ্গ ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্ছে ! গেরস্তগোচের ক্ষু-লোকের মেয়েছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্ছেন—হরিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্ছেন। ঝুলির ভিতর থেকে গুটিকতক টাকা বেমানুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্ছে।

ক্ষুদ্র নবাব—ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে—হৃদে আলতার মত রং—আলবর্ট ক্যাশানে চুল ফেরানো—চীনের শুয়ারের মত—শরীরটি ঝাড়ে গদ্যানে—হাতে লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক—সিমুলের ফিনফিনে ধুতি মালকোচা করে পরা, হঠাৎ দেখলে বোধ হয় রাজারাজড়ার পোস্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেরোবে “হিদে জোয়ার নাতি” !

বারোইয়ারি প্রতিমেকানি প্রায় বিশ হাত উচু—ঘোড়ায় চড়া হাইল্যান্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো—মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রীমূর্তি—সিংগির গা রুপলী গিল্টি ও হাতী সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরেশের বিবিয়ানা মুখ—রং ও গড়ন আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইশ্বর দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে স্তব কছেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্ছে—হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওয়াল। কুইনের ইউনিকরন ও ক্রেট !

আজ বারোইয়ারির প্রথম পূজা শনিবার—বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাই দত্ত, প্যালানাথ বাবু ও বীরকৃষ্ণ বাবুর স্ক্রুও আহিরীটোলার রাধামাধব বাবুরো ব্যালা তিনটে পর্য্যন্ত বারোইয়ারিতলায় হামরাও হয়েছিলেন—তিনটে বড় বড় অর্গা ঘোষ, এক শ ভেড়া ও তিন শ পাঁটা বলিদান করা হয়েছে—মূল নৈবিড়ির আগা তোলা মোণ্ডটি ওজনে দেড় মণ ! সহরের রাজা, সিংগি, ঘোষ, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি বড় বড় দলহু কোঁটা, চেলীর জোড়, টিকি ও তেলকধারী উর্দি ও তক্মাওয়াল বত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদেয় হয়েছে—“সুপারিস” “অনাহুতে” “বেদলে” ও “ফলারেরা”

নিমন্তলার শকুনির মতো টেকে বসে আছেন—কাজলী, রেণু, অগ্নিদানী, ভাট ও ককির বিস্তার জমেছিল—পাহারাওয়ালারাই তাঁদের বিদেয় দেন—অনেক গরীব প্রেরণার হয়! শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কয়ে থানার দারোগা ও জমাদারের পুত্র বিবেচনায় সে বারের মত রেহাই পায়।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো—বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য। সহরের অনেক বাবু গাড়ি চড়ে সং দেখতে এসেছেন—সং ফেলে অনেকে তাঁদের দেখতে। ক্রমে মজলিশে দু'এক বাড়ি জেলে দেওয়া হলো—সঙেদের মাথার উপর বেল ল্যান্টন বাহার দিতে লাগলো। অধ্যক্ষ বাবুরো একে একে জমেয়াৎ হতে লাগলেন, নল করা খেলো হুকো হাতে ও পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চীৎকার ও “এটা কর” “ওটা কর” করে হুকুম দিচ্ছেন। আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের লড়াই হবে। দেড় মণ গাঁজা, দুই মণ চরস, বড় বড় সাত গামলা দুধ ও বারোখানি বেণের দোকান খেঁটিয়ে ছোট বড় মাঝারি এলাচ, কপূর, দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েছে—মিটে, কড়া, ভ্যালসা, অমুরি ও ইরানী তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েছে! এ সওয়ায় বিস্তার অন্তঃশিলে সরঞ্জামও প্রস্তুত আছে। আবশ্যক হলে দেখা দেবে।

সহরে টি টি পড়ে গ্যাচে আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজায় হাফ আখড়াই হবে। কি ইয়ার গোচের স্কুল বয়, কি বাহাস্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনেতে পাগল! বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কস্তে লাগলো। কৌচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ছুরে শান্তিপুর্নে উড়ুনির এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো! চারপুরুষে পাঁচপুরুষে ফ্রেপ্ ও নেটের চাদরেরা অকর্ষণ্য হয়ে নবাবী আমলে সিন্দুক আশ্রয় করে ছিলেন, আজ ভলটির হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুনসি ও চাবির শিকলি হঠাৎ বাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ করে, ঘড়ির চেনের অফিশিয়েটিং হলো—জুতোরা বেস্তার মত নানা লোকের সেবা কস্তে লাগলো।

বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো—এক দিকে কাঠগড়া ঘেরা মাটির সং—অন্য দিকে নানা রকম পোশাক পরা কাঠগড়ার ধারে ও মধ্যে জ্যাস্ত সং। বড়-মাঝখরা ট্যাস্‌লওয়ারা, টুপি, চাপকান, পোটি ও ইট্টিকে চালাচত্বের অনুর হতেও ঘেরাফা দেখাচ্ছেন। প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণ বাবু লকাই লাটুর (লাটিম) মত ছুরে বেড়াচ্ছেন, দু'কশ দিয়ে পাঁজির ছবির রক্তদস্তী রাক্সসীর মত পানের পিক্‌ গাড়িয়ে পড়ছে—চাকর, হরকরা, সরকার ক্যারাণা ও ম্যানেজারদের নিবেদন ক্যান্ডার অরকাশ নাই।

চং চং করে গির্জার ঘড়িতে রাস্তির ছুটো বেজে গ্যালো। খোপাপাড়ার দল ভরপুর নেশায় তেঁ। হয়ে টলতে টলতে আসরে নাবলেন। অনেকে আখড়া ঘরে (সাজঘরে) গুয়ে পড়লেন। বাঙ্গালির স্বভাবই এই, পরের জিনিষ পাতে পড়লে শীগ্গির হাত বন্ধ হয় না (পেট সেটি বোকে না বড় ছুঁখের বিষয়!) জেড় ঘণ্টা জেল, বেহালা, ফুলুট, মোচাং ও সেতারের রং ও সাজ বাজলো—গোঁড়ারা ছুঁ বাহবা ও বেশ দিলেন—শেষে একটি ঠাকুরগণবিষয় গেয়ে (আমরা গানটি বুঝতে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য হতে পারলুম না) উঠে গেলে চকের দল আসরে নাবলেন।

চকের দলেরাও ঐ রকম করে গেয়ে শোভাস্তরী! সাবাস! ও বাহবা! নিয়ে উঠে গ্যালেন—এক ঘণ্টার জন্ত মজলিশ খালি রইলো; চারনাকোট-ফ্রেপের, লেটের ও ডুরে ফুলদার ট্যারচা চাদরেরা—পিপড়ের তাক্সা সারের মত ছড়িয়ে পড়লেন। পানের দোকান শূন্য হয়ে গ্যালো। চুরোট তামাক ও চরসের ধুঁয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠলো যে, সে বারে “প্রোজেকশনের উপলক্ষে বাজিতে” বা কি ধোঁ। হয়েছিল! বড় বড় রিভিউয়ের তোপেও ত ধোঁ। জন্মে না! আদ ঘণ্টা প্রতিমেখানি দেখা যায় নি ও পরস্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিলো।

ক্রমে হঠাৎ বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াশার মত ও শরভের মেঘের মত ধোঁ। দেখতে দেখতে পরিষ্কার হয়ে গ্যালো! দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন, খোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। আদ ঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসর হতে দলবল সমেত আবার উঠে গ্যালেন। চকবাজারেরা নাবলেন ও খোপাপুকুরের দলের বিরহের উত্তোর দিলেন। গোঁড়ারা রিভিউয়ের সোলজারদের মত দল বেঁধে ছ থাক হলো। মধ্যস্থরা গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কস্তে আরম্ভ করলেন—এক দলে মিস্তির খুড়ো আর এক দলে দাদাঠাকুর বাদন্দার।

বিরহের পর চাপা কাঁচা খেঁউড়; তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচার ও শেষ (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারিও বাকি থাকবে না।

তোপ পড়ে গিরেচে, পূর্বদিক্ ফরসা হয়েচে, ফুব্বুরে হাওয়া উঠেচে—খোপাপুকুরের দলেরা আসর নিয়ে খেঁউড় ধল্লেন, গোঁড়াদের “সাবাস!” “বাহবা!” “শোভাস্তরী!” “জিতা রও!” দিতে দিতে গলা চিরে গ্যালো; এরই তামাশা দেখতে যেন সূর্য্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন! বাঙ্গালির আজো এমন ফুব্বসিত আবেদে মত্ত হন বলেই যেন—চাঁদ তরঙ্গমাঝে সুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন।

কুমুদিনী মাতা হেঁট কল্লেন। পাখীরা ছি! ছি! ছি! করে চৈচিয়ে উঠলো! পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাসতে লাগলেন! ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে খেঁউড় গাইলেন, সূতরাং চকের দলকে তার উত্তোর দিতে হবে। ধোপাপুকুর-ওয়ালারা দেড় ঘণ্টা প্রাণপণে চৈচিয়ে খেঁউড়টি গেয়ে থামলে চকের দলেরা আসরে নাবলেন, সাজ বাজতে লাগলো, ওদিকে আকড়াঘরে খেঁউড়ের উত্তোর প্রস্তুত হচ্ছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে উত্তোরের চোতা মজলিশে দেখা দিলেন—চকের দলেরা তেজের সহিত উত্তোর গাইলেন! গোঁড়ারা গরম হয়ে “আমাদের জিত!” “আমাদের জিত!” করে চ্যাচাচৈচি কতে লাগলেন—(হাতাহাতিও বাকি রইলো না) এদিকে মধ্যস্থরাও চকের দলের জিত সাব্যস্ত কল্লেন। হুও! হো! হো! হুরে ও হাততালিতে ধোপাপুকুরের দলেরা মাটির চেয়েও অধম হয়ে গ্যালেন—নেশার খোঁয়ারি—রাত জাগবার ক্রেশ ও হারের লজ্জায়—মুখুযোদের ছোট বাবু ও ছু চার ধবতা দোয়ার একেবারে এলিয়ে পড়লেন।

চকের দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে গাইতে গাইতে ঘরে চল্লেন—কারু শুধু পা—মোজা পায়; জুতো কোথায় তার খোঁজ নাই। গোঁড়ারা আমোদ কতে কতে পেছু পেছু চল্লেন—ব্যালা দশটা বেজে গ্যালো, দর্শকরা হাফ আখড়াইয়ের মজা ভরপুর লুটে বাড়িতে এসে সূত্ ঠাণ্ডাই জ্বোলাপ ও ডান্ডারের যোগাড় দেখতে লাগলেন। ভাড়া ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি চাদর জামা ও জুতোরাজ কাজ সেরে আপনার আপনার মনিববাড়ি ফিরে গ্যালো।

আজ রবিবার। বারোইয়ারিতলায় পাঁচালি ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জমলেন; এখনো অনেকের “চৌয়া ঢেকুর” “মাতা ধরা” “গা মাটি মাটি” সারে নি। পাঁচালি আরম্ভ হয়েছে—প্রথম দল ভঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন, পাঁচালি ছোট কেতার হাফ আখড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর ভাগ, সূতরাং রাত্তির একটার মধ্যে পাঁচালি শেষ হয়ে গ্যালো।

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাবুরি চুল, উকী ও কানে মাকড়ি। অধিকারী দূতী সঙ্গে গুটিবারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী লাজিয়ে আসরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন, তার পর বাসুদেব ও মণিগৌসাই গান করে গ্যালেন। সকেট সখী ও দূতী প্রাণপণে ডোর পর্যন্ত “কাল জল খাবো না!” “কাল মেঘ দেখবো না!” (সামিয়ানা খাটাইয়ে দিমু) “কাল কাপড় পরবো না!” ইত্যাদি কথাবার্তায় ও “নবীন বিদেশিনীর” গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন। খাল, গাড়ু, বড়া,

হেঁফা কাপড়, পুরাণো বনাত ও শালের গাধী হয়ে গ্যালো। টাকা, আছলি, সিকি ও পরসা পর্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে “বাবা দে আমার বিয়ে” ও “আমার নাম শুনুরে জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে” প্রভৃতি রকমওয়ারি সঙেরও অভাব ছিল না। ব্যালা আটটার সময় যাত্রা ভালো, এক জন বাবু মাতাল পাঁজ টেনে বিলক্ষণ পৌঁকে যাত্রা শুনছিলেন, যাত্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কতে গ্যালেন (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী-মূর্তি), কিন্তু প্রতিমার সিংগি হাতীকে কামড়াতে দেখে বাবু মহাশ্মার বড়ই রাগ হলো ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণা শুরে—

“তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ি।

মানুষ মেলে টেড্‌টা পেতে তোমায় যেতে হতো হরিণবাড়ি।

শুরকি কুটে সারা হতে, তোমার মুকুট যেতো গড়াগড়ি।

পুলিসের বিচারে শেষে সঁপ্তো তোমায় গ্র্যান্ডযুড়ি।

সিজি মামা টেবুটা পেতেন ছুটেতে হতো উকীলবাড়ি ॥”

গান গেয়ে, প্রণাম করে চলে গ্যালেন।

সহরের ইতর মাতালদের (মাতালের বড় ইতরবিশেষ নাই; মাতাল হলে কি রাজা বাহাদুর, কি প্যালার বাপ গোব্‌রা প্রায় এক মূর্তিই ধরে থাকেন) ঘরে ধরে রাখবার লোক নাই বলেই আমরা নর্কামায়, রাস্তায়, থানায়, গারদে ও মদের দোকানে মাতলামি কতে দেখতে পাই। সহরে বড়মানুষ মাতালও কম নাই, শুধু ঘরে ঘরে পুরে রাখবার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে মাতলামি কতে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে, অন্তরীক থেকে দেখলে পেটের ভেতর হাত পা সঁধিয়ে যায় ও বাঙ্গালি বড়মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। ছোটলোক মাতালের ভাগ্যে চারি আনা জরিমানা,—এক রাত্তির গারদে বাস—পাহারাওলাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই এক কৌংকা মাজ, কিন্তু বাঙ্গালি বড়মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে প্রের্ত। পাকি হয়ে উড়তে গিয়ে ছাত থেকে পড়ে মরা—বাবার প্রতিষ্ঠিত পুঁক্রে ডোবা, প্রতিমের নকল সিংগি ভেঙ্গে ফেলে আসল সিংগি হয়ে বসা, ঢাকীরে মার সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া, ক্যান্টনমেন্ট ফোর্ট, রেলওয়ে এস্টেশন্ ও অক্সনে মদ খেয়ে মাতলামি করে চালান হওয়া। এ সওয়ার করুণা, গান, বকসিস ও বক্তৃতার বেহুদ ব্যাপার।

একবার সহরের শামবাঙ্গার অকলের এক রনিদী বড়মানুষের বাড়িতে

বিভাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাড়ির মেজো বাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুরুতে বসেছেন; সামনে মালিনী ও বিত্তে “মদন আশ্রম জলুচে দ্বিগুণ কল্লো কি-গুণ ঐ বিদেশী” গান করে মুটো মুটো প্যালা পাচ্ছে—বহুর বোল বরসের ফুলো (টুডু ব্রেড) ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খ্যামটা নাচে। মজলিশে রূপোর গ্যাসে ত্রাণ্ডি চলচে—বাড়ির টিক্‌টিকি ও খালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত নেশায় চুরচুরে ও তেঁ।। জনমে মিলনের মজ্ঞা, বিভার গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোর ধরা ও মালিনীর যজ্ঞার পালা এসে পড়লো; কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাতে আরম্ভ কল্লো—মালিনী বাবুদের “দোহাই” দিয়ে কেঁদে বাড়ি সরগরম করে তুলে—বাবুর চমকা ভেঙ্গে গ্যালো; দেখলেন কোটাল মালিনীকে মাচে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্ছে অথচ পার পাচ্ছে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন “কোন্ বেটার সাধি আমার কাছে থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়” এই বলে সামনের রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ ত্যাগে ছুড়ে মাল্লেন—গেলাসটি কোটালের রগে লাগ্‌যামাত্র কোটাল “বাপ” বলে অমনি ঘুরে পড়লো, চারি দিক্ থেকে লোকেরা হাঁ। হাঁ। করে এসে কোটালকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গ্যালো—মুকে জলের ছিঁটে মারা হলো ও অস্থ অস্থ নানা তদ্বির হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—কোটালের পো এক ঘাতেই পঞ্চদ পেলেন।

আর একবার ঠনঠনের “র” ঘোষজা বাবুর বাড়িতে বিভাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পৌঁকে মজলিশে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুন্‌ছিলেন। সমস্ত রাত বেছঁসেই কেটে গ্যালো, শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ মশানে কোটালের হান্‌কামাতে বাবুর নিজা তঙ্গ হলো—কিন্তু আসরে কেট্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে “কেট্ট ল্যাও, কেট্ট ল্যাও” বলে ক্ষেপে উঠলেন। অস্থ অস্থ লোকেরা অনেক বুঝালেন যে, “ধর্ম অবতার! বিভাসুন্দর যাত্রায় কেট্ট নাই” কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝলেন না (কৃষ্ণ তাঁরে—নিভাস্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন।

আর একবার এক গোশ্বামী এক মাতাল বাবুর কাছে বড় নাকাল হয়েছিলেন, লেটিও না বলে থাকা গেল না। পূর্বে এই সহরে বেথেটোলার দ্বিপ্টাদ গোশ্বামীর অনেকগুলি বড়মামুষ শিশু ছিল। বাবু সিমলের বোস বাবুরা প্রভুর প্রধান শিশু ছিলেন। এক দিন আমতার রামহরি বাবু বোসজা বাবুরে এক পত্র লিখলেন যে, “ভেক নিতে তাঁর বড় ইচ্ছা, কিন্তু গুটিকতক প্রাণ আছে, সেগুলি বড় দিন পূরণ না হলে, তত দিন শাকুই খাবেন।” বোসজা মহাশয় পরম বৈষ্ণব; রামহরি

বাবুর পত্র পেয়ে বড় খুসি হলেন ও বৈক্যব ধর্মের উপদেশ ও প্রসন্ন পূরণ করবার জন্তে প্রভু নদেরচাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরি বাবুর সোনাগাজীতে বাসা। ছু চার ইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে; সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন—সকালে বাড়ি আসেন, মদও বিলক্ষণ চলে, ছু চার নিমগোচের দাঙ্গার দরুন পুলিশেও দুই এক মোহলেকা হয়ে গিয়েচে। সন্ধ্যার পর সোনাগাজীর বড় জাঁক, প্রতি ঘরে ধূনার ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গজাজলের ছড়ার দরুন হিন্দুধর্ম যেন মূর্ত্তিমন্ত হয়ে সোনাগাজী পবিত্র করেন। নদেরচাঁদ গোস্বামী বাবু বাবুর পত্র নিয়ে সন্ধ্যার পর সোনাগাজী চুকলেন। গোস্বামীর শরীরটি প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোটার মত চৈতন্যককা। সর্ব্বাঙ্গে हरिनामের ছাপা, নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপালে) এক ধ্যাবড়া চন্দন, বোধ হয় যেন কাগে হেগে দিয়েচে! গোস্বামীর কল্কেতায় জন্ম, কিন্তু কখন সোনাগাজীতে ঢোকেন নাই (সহরের অনেক বেড়া সিমলের মা গোসাইয়ের জুরিস্‌ডিক্সনের ভেতর)। গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরি বাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন।

রামহরি বাবু কুটি থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপী রকম নেশার তরু হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়ার সঙ্গতে “অব্‌ হজরত জাতে লগুন কো” গাচ্ছেন, আর এক জন মাতায় চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের উজ্জুগ কচ্ছেন; এমন সময় বাবু বাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী মশাই উপস্থিত হলেন। অমন আমোদের সময় একটা ব্রকদ গোসাইকে দেখলে কার না রাগ হয়? সকলেই মনে মনে বড় ব্যাজার হয়ে উঠলেন, বাবুজার অমুরোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার হতে পরিত্রাণ পান।

রামহরি বাবু বাবুজার পত্র পড়ে গোস্বামী মহাশয়কে আদর করে বসালেন। রামা বাবুনের হাঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক দিলে। (হাঁকোটি বাস্তবিক ঝাঁ সাহেবের)। মোসাহেবদের সঙ্গে চোক টেপাটেপি হয়ে গ্যালো। এক জন দোড়ে কাছের দরজীর দোকান থেকে হয়ে এলেন। এদিকে গাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্ত পোষ্টপন হলো—শাস্ত্রীয় তর্ক হবার উজ্জুগ হতে লাগলো। গোস্বামী মহাশয় তামাক খেয়ে হাঁকো রেখে নানাপ্রকার শিষ্টাচারী করলেন; রামহরি বাবুও তাতে বিলক্ষণ ভক্ততা করেছিলেন।

রামহরি বাবু গোস্বামীকে বল্লেন, “প্রভু! বটুয় তত্ত্বের কটি বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে, আপনাকে ব্রীমাংলা করে দিতে হবে: প্রথম,

কেউর সঙ্গে রাধিকার মামী-সম্পর্ক, তবে ক্যামন করে কেউ রাধারে ঐহণ কল্লেন ?”

দ্বিতীয়, “এক জন মানুষ (ভাল, দেবতাই হলো) যে বোল শত স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করেন, এ বা কি কথা ?”

তৃতীয়, “শুনেচি, কেউ দোলের সময় মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে আমাদের মর্টন চাপ্ খেতে দোষ কি ? আর বটুমদের মদ খেতে বিধি আছে ; দেখুন, বলরাম দিনরাত মদ খেতেন, কুকুও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।” প্রশ্ন শুনেই গোস্বামীর পিলে চম্কে গ্যালো, পালাবার পথ দেখতে লাগলেন ; এদিকে বাবুর দলে মুচ্কে হাসি, ইসারা ও রূপোর গেলাসে দাওয়াই চলতে লাগলো। গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পারলেন না বলে এক জন মোসাহেব বলে উঠলো, “হজুর ! কালীই বড় ; দেখুন—কালীতে ও কেউতে ক পুরুষের অন্তর, কালীর ছেলে কার্ত্তিক—তার বাহন ময়ূর—ময়ূরের যে ল্যাজ—তাই কেউর মাতার উপর, সুতরাং কালীই বড়।” এ কথায় হাসির তুফান উঠলো। গোস্বামী নিজ স্বভাবগুণে গৌরাব্টিমোয় গরম হয়ে পিট্টানের পথ দেখবেন কি, এমন সময় এক জন মোসাহেব গোস্বামীর গায়ে টলে পড়ে তিলক ও টিপ জিব দিয়ে চেটে ফেল্লে, আর এক জন “কি কর ! কি কর !” বলে টিকিটি কেটে নিলেন। গোস্বামী ক্রমে শ্রদ্ধা গড়ায় দেখে জুতো ও হরিনামের থলি ফেলে চোঁচা দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন ! রামহরি বাবু ও মোসাহেবদের খুসির সীমা রইলো না। অনেক বড়মানুষে এই রকম আমোদ বড় ভালবাসেন ও অনেক স্থানে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা হয়।

কল্কেতা সহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলামি দেখা যায় ; সকলগুলি সৃষ্টিছাড়া ও অসুত ! চোরবাগানে দহুকর্ণ মিস্তির বাবুর বাপ, জ্যাট ড্রাইব মনকিসন্ কোম্পানির বাড়ির মুচ্ছুরী ছিলেন, এ সওয়ায় চোটা ও কোম্পানির কাগজেরও ব্যবসা কল্লেন। দহু বাবু কালেজে পড়েন, একজামিন্ পাস করেচেন, লেকচার শোমেন ও মধ্যে মধ্যে ইংরাজি কাগজে আর্টিকেল লেখেন। সহরের বাঙ্গালি বড়মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেক বিবেচনায় গাধার বেহন্দ ও বুদ্ধি এমনি স্মরণ যে, সেই বন্ধেও বলা যায়, লেখাপড়া শিখতে আদবে ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারকির দিকে দৌড়ায়, স্কুল যাওয়া কেবল বাপ মার ভয়ে ওষুদগেলাগোহ ! সুতরাং একজামিন্ পাস করার পূর্বে দহুকর্ণ বাবু চার ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও এখন মেয়েটির বিবাহ পর্য্যন্ত হয়ে গিছলো। দহু

বাবুর ছ চার স্কুলফ্রেণ্ড সর্বদা আসছেন যেতেন, কখন কখন জুকিয়ে চুরিয়ে—চরসটা, মাজমের বরপীখানা, সিঙ্কিটে আস্টাও চলতো; ইচ্ছেখানা, এক আধ দিন শেরিটে, স্লামপিনটারও আখাধ নেওয়া হয়, কিন্তু কর্তা স্বকলমে রোজগার করে বড়মাহুব হয়েছেন, সুতরাং সকল দিকে ঢোক রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্বদা তাইস করে থাকেন, সেই দবদবাতেই ক্যাখাত পড়েছিল !

সমরভেকশনে কালেজ বন্দ হয়েছে—স্কুলমাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাচ ধরে ও বাজার করে বেড়াচ্ছেন। পণ্ডিতরা দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধরে চাষবাস আরম্ভ করেছেন (ইংরাজি স্কুলের পণ্ডিত প্রায় ঐ গোছেরি দেখা যায়)। দহু বাবু সন্ধ্যার পর দুই চার স্কুলফ্রেণ্ড নিয়ে পড়বার ঘরে বসে আছেন ; এমন সময় কালেজের প্যারী বাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ত্রাণ্ডি ও একটা শেরি নিয়ে অতি সম্ভরণে ঘরের ভিতর ঢুকলেন। প্যারী বাবু ঘরে ঢোক্বামাত্রই চার দিকের দোর, জান্না বন্দ হয়ে গ্যালো ; প্রথমে বোতলটি অতি সাবধানে খুলে (বেরাঙ্গে চুরি করে ছদ খাবার মত করে) অত্যন্ত সাবধানে চলতে লাগলো—ক্রমে ত্রাণ্ডি অন্তর্ধান হলেন। এদিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠলো ; দোর, জান্না খুলে দেওয়া হলো ; চেষ্টিয়ে হাসি ও গব্বা চলতে লাগলো। শেষে শেরিও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরাজি ইম্পিচ ও টেবিল চাপড়ানো চল্লো,—ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গ্যালো। এদিকে দহু বাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা ফিরোজিলেন, ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চীৎকার ও রৈ রৈ শুনে গিয়ে দেখলেন, বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎকার ও হৈ হৈ কচ্ছেন, সুতরাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও দহু বাবুকে যাচ্ছেতাই বলে গালমন্দ দিতে লাগলেন। কর্তার গালাগালে এক জন ফ্রেণ্ড বড়ই চটে উঠলেন ও দহু তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে কর্তাকে একটা ঘুষি মাজেন। কর্তার বয়স অধিক হয়েছিল, বিশেষত ঘুষোটি ইয়ংবেঙ্গালি (বাঁহুরের বাড়ী), ঘুষি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেন। বাড়ির অশ্রু অশ্রু পরিবারেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে পড়লো, গিল্লি বাড়ির ভেতর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগলেন। তিরস্কার, কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফ্রেণ্ডরা পুলিশের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন। এদিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলো ও মার কাছে গিয়ে বল্লেন, “মা, বিদ্দেশাগর বেঁচে থাক্ ! তোমার ভয় কি ! ও ওন্ড কুল ময়ে বাবু না কেন, ওকে আমরা চাই নি ; এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে, তুমি, বাবা ও আমি একত্রে

তিন জনে বসে হেল্‌থ [ড্রিক] করবো, ও ওল্ড ফুল মরে যাক্, আমি কোরাইট ব্রিকমড বাবা চাই।”

রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু সুপ্রিমকোর্টের মিস্ত্রাস', থিফ্‌ রোগ্ এণ্ড পিক্-পকেট উকীল সাহেবদের আগিসের খাতাঙ্গী। আগিসের ফেরতা রাধাবাজার হয়ে আসচেন ও দুধারি দোকানও ফাঁক যাচ্ছে না—পাগড়িতে এলিয়ে পড়েছে, ধুতি খুলে ছতুলি কুতুলি পাকিয়ে গ্যাচে, পাও বিলক্ষণ টল্‌চে, ক্রমে যোড়াসাঁকোর হাঁড়িহাটার এসে একেবারে এড়িয়ে পড়লেন, পা যেন খোঁটা হয়ে গেড়ে গ্যালো ; শেষে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ! ঠাকুর বাবুদের বাড়ির এক জন চাকর সেই সময় মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে যাচ্ছিল। রাম বাবু তাকে দেখে “আরে ব্যাটা মাতাল” বলে টলে সরে দাঁড়ালেন। চাকর মাতাল খেমে জিজ্ঞাসা কল্ল, “তুই শালা কে রে আমায় মাতাল বল্লি !” রাম বাবু বল্লেন, “আমি রাম।” চাকর বল্ল, “আমি তবে রাবণ।” রাম বাবু—“তবে যুদ্ধ দেহি” বলে যেমন তারে মাস্তে বাবেন, অমনি নেশার ঝাঁকে ধুপুস করে পড়ে গেলেন। চাকর মাতাল তাঁর বুকের উপর চড়ে বসলো। থানার সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব সেই সময় রোঁদ কিরে যাচ্ছিলেন। চাকর মাতাল কিছু ঠিক ছিল, পুলিশের সার্জন্‌ দেখে তাঁরে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্‌যোগ কল্ল। রাম বাবুও সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দেখেছিলেন, এখন রাবণকে পালাতে দেখে ঘৃণা প্রকাশ করে বল্লেন, “ছি বাবা, এখন রামের হুন্‌মান্‌কে দেখে ভয়ে পালালে ! ছিঃ !”

রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যালো, আজ সোমবার—শেষ পূজোর আয়োদ, চোহেল ও কব্বার শেষ, আজ বাই, খ্যাম্‌টা, কবি ও কেশবন।

বাইনাচের মজলিশ চূড়ান্ত সাজানো হয়েছে, গোপাল মল্লিকের ছেলের ও রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বের মজলিশ এর কাছে কোথায় লাগে ? চক্‌বাজারের প্যালানাথ বাবু বাই মহলের ডাইরেক্টরী, সুতরাং বাই ও খ্যাম্‌টা নাচের সমুদায় ভার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। সহরের নল্লী, লুল্লী, মুল্লী, খল্লী ও সল্লী প্রভৃতি ডিগ্রী, মেডেল ও সার্টিফিকেটওয়ালা বড় বড় বাইয়েরা ও গোলাপ, শাম, বিহু, খুত্‌, মণি ও চুলী প্রভৃতি খ্যাম্‌টাওয়ালীরা নিজ নিজ তোবড়া তুবড়ি সজে করে আসতে লাগলেন—প্যালানাথ বাবু সকলকে মা গোঁসাইয়ের মত সমাদরে রিসিভ্‌ কল্লেন— তাঁদেরও গরবে মাটিতে পা পড়্‌চে না।

প্যালানাথ বাবুর হীরের ওয়াচ, গার্ডে কোলান আধুলির মত মেকাবী হটিঙের কাঁটা নটা পেরিয়েচে। মজলিশে বাতির আলো শরদের জ্যোৎস্নাকেও ঠাট্টা কল্ল।

সারসের কৌরা কৌরা ও তবলার মন্দিরের কলকল তালে “আরে সাঁইয়া মোরারে তেরি মেরো জানিরে” গানের সঙ্গে এক তারকা মজলিশ রেখেচে। ছোট ছোট “ট্যাম্” “হামামা” ও “তাজিরা” “এ কোণ থেকে ও কোণ, এ চৌকি থেকে ও চৌকি” করে ব্যাড়াছেন (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা) এমন সময় একখানা চেরেট গুড়্ গুড়্ করে বারোইয়ারিতলায় “গড়্ সেত্ দি কুইন” লেখা গেটের কাছে থামলো। প্যালানাথ বাবু দৌড়ে গ্যালেন—গাড়ি থেকে জরি ও কিংখাপ মোড়া জরির জুতোসুদ্ধ একটা দশমুনী তেলের কুপো ও এক কুটে মোসাহেব নাবলেন, কুপোর গলায় শিকলের মত মোটা চেন ও আঙ্গুলে আঠারটা করে ছত্রিশটা আংটি।

প্যালানাথ বাবুর এক জন মোসাহেব “বড়বাজারের পচু বাবু তুলোর ও পিস্গুট্টের দালাল, বিস্তর টাকা! বেশ লোক” বলে চেষ্টায়ে উঠলেন। পচু বাবু মজলিশে ঢুকে মজলিশের বড় প্রশংসা কল্লেন, প্যালানাথ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উভয়ে কোলাকুলি হলো, শেষে পচু বাবু প্রতিমে ও মাতালো মাতালো সঙেদের (যথা কেট, বলরাম, হুম্মান্ প্রভৃতি) ভক্তিভরে প্রশংসা কল্লেন ও বাইজীকে সেলাম করে ছুখানি আমেরিকান চৌকি জুড়ে বসলেন। ছুটি হাত, এক কুড়ি পানের দোনা, চাবির খোলো ও রুমালের জন্তু আপাতত কিছু ক্ষণের জন্তু আর ছুখানি চৌকি ইজারা নেওয়া হলো, কুটে মোসাহেব পচু বাবুর পেছন দিকে বসলেন, সুতরাং তাঁরে আর কে দেখতে পায়? বড়মানুষের কাছে থাকলে লোকে যে “পর্বতের আড়ালে আছ” বলে থাকে, তার ভাগ্যে তাই ঠিক ঘটলো।

পচু বাবুর চেহারা দেখে বাই আড়ে আড়ে চেয়ে হাসচে, প্যালানাথ বাবু আতর, পান, গোলাব ও তোবরা দিয়ে খাতির কল্লেন; এমন সময় গেটের দিকে গোল উঠলো—প্যালানাথ বাবুর মোসাহেব হীরেলাল রাজা অঞ্জনরঞ্জন দেব বাহাদুরকে নিয়ে মজলিশে এলেন।

রাজা বাহাদুরের গিণ্টিকরা গালাভরা আশা সকলের নজর পড়ে এমন জায়গায় দাঁড়ালো। অঞ্জনরঞ্জন দেব বাহাদুর গৌরবর্ণ, দোহারী—মাথায় খিড়কীদার পাগড়ি—জোড়া পরা—পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদমাইসের বাহু ও স্ত্রাকার সন্ধ্যার। বাই, রাজা দেখে কাছ বাগে সরে এসে নাচতে লাগলো, “পূজোর সময় পরবস্তি হই যেন” বলেই তবলজী ও সারেসজীরা বড় রকমের সেলাম বাজালে, বাজে লোকেরা সং ও বাই ফেলে কোন অপকল্প জানোয়ারের মত রাজা বাহাদুরকে একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন।

ক্রমে রাস্তিয়ার সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগলো, সহরের অনেক বড়মানুষ রকম রকম পোশাক পরে একত্র হলেন, নাচের মজলিশ বনরন কতে লাগলো; বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজলিশের কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি কৃতার্থ হলেন, তাঁর বাপের আঁকতে বামুন খাইয়েও এমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

ক্রমে আকাশের তারার মত মাথালো মাথালো বড়মানুষ মজলিশ থেকে খসলেন, বুড়োরা সরে গ্যালেন, ইয়ারগোচের ফচকে বাবুরা ভাল হয়ে বসলেন, বাইরা বিদেয় হলো—খ্যামটা আসরে নাবলেন।

খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ। সহরের বড়মানুষ বাবুরা প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেকে ছেলেপুলে, ভাগে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান—কোনখানে কিস্ না দিলে প্যালা পায় না—কোথাও বলবার যো নয়!

বারোইয়ারিতলায় খ্যামটা আরম্ভ হলো, যাত্রার যশোদার মত চেহারা দুজন খ্যামটাওয়ালী ঘুরে ঘুরে কোমর নেড়ে নাচতে লাগলো, খ্যামটাওয়ালারা পেছন থেকে “ফণির মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি” গাচ্ছে, খ্যামটাওয়ালারা ক্রমে নিমন্তন্ত্রদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে এগিয়ে অগ্গরদানী ভিকিরীর মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন! রাস্তির দুটোর মধ্যেই খ্যামটা বন্দ হলো—খ্যামটাওয়ালীরা অধ্যক্ষমহলে যাওয়া আসা কতে লাগলেন, বারোইয়ারিতলা পবিত্র হয়ে গ্যালো।

কবি। রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রিন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রাম বনু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় কবিওয়াল জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখা-দেখি অনেক বড়মানুষ কবিতা মাতলেন। বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্ম গ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্তা) নবকৃষ্ণের একজন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের রিকর্পেশনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক—তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান। সুতরাং কিছু দিন বাগবাজারের সহরের টেকা হয়ে পড়েন। তাঁদের একখানি পাব্লিক আটচালা ছিল; সেইখানে এসে পাখি হাভেন, বুলি বাড়ভেন ও উড়ভেন—এ সওয়ার

বোসপাড়ার ভেতরেও ছ' চার গাঁজার আড্ডা ছিল। এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুথুরি ও কঁকমারির দলও অন্তর্ধান হয়ে গ্যাচে, পাখিরা বৃদ্ধা হয়ে মরে গেছেন, ছ' একটা আদমরা বৃড়োগোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দলভাঙ্গা ও টাঁকার থাকৃতিতে মনমরা হয়ে পড়েচে, সুতরাং সন্ধ্যার পর কুম্বর শুনে থাকেন। আড্ডাটি মিউনিসিপাল কমিশনরেরা উঠিয়ে দেছেন, অত্যাধন কেবল তার কুইন্স মাত্র পড়ে আছে। পূর্বের বড়মানুষরা এখনকার বড়মানুষদের মত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না; প্রায় সকলেরই একটি একটি রাঁড় ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আফ্রিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিল—দু' তিন ঘণ্টার কম আফ্রিক শেষ হত না, তেল মাখতেও বাড়া চার ঘণ্টা লাগতো—চাকরের তেল মাখানির শব্দে ভূমিকম্প হতো—বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল মাখতে বসতেন, সেই সময় বিষয়কর্ষ দেখা, কাগজ-পত্রে সই ও মোহর চলতো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব অস্ত যাতেন। এঁদের মধ্যে জমিদাররা রাস্তিও ছুটো পর্য্যন্ত কাছারি কতেন; কেউ অমনি গাওনা বাজনা জুড়ে দিতেন; দলাদলির তর্ক কতেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠতেন—গাইয়ে বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো, বাপাস্ত কল্লোও বক্সিস পেতো, কিন্তু তন্দরলোক বাড়ি ঢুকতে পেতো না; তার বেলা ল্যাঙ্গা তরওয়ারের পাহারা, আদব কায়দা! কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুতেন—সন্ধ্যার পর উঠে কাজকর্ষ কতেন—দিন রাত ছিল ও রাত দিন হতো! রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্ধান হতে আরম্ভ হলো, (বাজালির প্রথম খবরের কাগজ) সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হলো। তার বিপক্ষে ধর্ম্মসভা বসলো, রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্লেন। সতীদাহ উঠে গ্যালো। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। হেয়ার সাহেব প্রকাশ হলেন—ক্রমে সংকর্ষে বাজালিদের চোক ফুটে উঠলো।

এদিকে বারোইয়ারিতলায় জমিদারী কবি আরম্ভ হলো, ভালকোর জগা ও নিম্ভের রামা চোলে “মহিষাসুন্দর” “গঙ্গাবন্দনা” ও “ভেটুকিমাছের তিনখানা কাঁটা” “অগ্গরদীপের গোপীনাথ” “যাবি তো যা যা ছুটে ছুটে যা” প্রভৃতি বোল বাজাতে লাগলো; কবিওয়ালারা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চার গুণ উঁচু) গান ধলেন—

চিতেন।

বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা করে কাঁক।

এই বারে, গেরে, ডোয়ার কল্লো সূর্য্যদেব নাক।

।

ক্যামন সুখ পেলে, কন্ডলে শুলে, ব্রহ্মসত্তর, দেবসত্তর বড় নিতে জোর করে ।

এখন জারী গ্যালো, ভূর ভাংলো তোমার, আতো জুলুম্ চলেবে না !

পেনেলকোডের আইনগুণে মুখজ্যের পোর ভাংলো জাঁক ॥

বেআইনির দফারফা বদমাইসি হলো থাক্ ॥

মোহাড়া ।

কুইনরে খাসে, দেশে, প্রজার হুঃখ হবে না ।

মহামহোপাধ্যায় মধুরানাথ মুসড়ে গিয়েচেন ।

কংসধ্বংসকারী লেটোর, জেলায় এসেচেন ।

এখন গুমি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা ফোর্জ চলেবে না ॥

জমিদারী কবি শুনে সহরেরা খুসি হলেন, ছ চার পাড়াগেঁয়ে রায় চৌধুরী,
মুনসি ও রায় বাবুরা মাতা হেঁট কল্লেন, হজুরী আম-মোক্তাররা চোক রাজিয়ে
উঠলো, কবিওয়ালারা ঢোলের তালে নাচতে লাগলো ।

স্বাভেজ্ঞরের গাড়ি সার বেঁধে বেরিয়েচে । ম্যাথরেরা ময়লার গাড়ি ঠেলে
জক্সেনের ঘাটে চলেচে । বাউলেরা ললিত রাগে খরতাল ও খঞ্জরীর সঙ্গে
শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম ও

“ঝুলিতে মালা রেখে, জপ্পলে আর হবে কি ।

কেবল কাঠের মালার ঠক্ঠকী, সব ফাঁকি ।”

লোকের ছুয়ারে ছুয়ারে গান করে বেড়াচ্ছে । কলু ভায়া ঘানি জুড়ে দিয়েচেন ।
ধোপারা কাপড় নিয়ে চলেচে । বোঝাই করা গরুর গাড়ি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা
জুড়ে যাচ্ছে—ক্রমে ফরসা হয়ে এলো ! বারোইয়ারিতলায় কবি বন্দ হয়ে গ্যালো ;
ইয়ারগোছের অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিদেয় হলেন, বুড়ো ও আধবুড়োরা কেতনের
নামে এলিয়ে পড়লেন ; দেশের গৌসাই, গৌড়া, বৈরাগী ও বষ্টম একত্র হলো—
সিমলের শাম ও বাগবাজারের নিস্তারিণীর কেতন !

সিমলের শাম উত্তম কিন্তুুনী—বয়স অল্প—দেখতে মন্দ নয়—গলাখানি যেন
কাঁসি খনখন্ কচ্ছে । কেতন আরম্ভ হলো—কিন্তুুনী “তাথইয়া তাথইয়া নাচত
কিরত গোপাল ননি চুরি করি খাঞীছে, আরে আরে ননি চুরি করি খাঞীছে
তাথইয়া তাথইয়া” গান আরম্ভ করে, সকলে মোহিত হয়ে পড়লেন ! চার দিক্
থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগলো, খুলিরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে
লাগলো ! কিন্তুুনী কখন হাঁটু গেড়ে, কখন ঠাড়িয়ে মধু বিটি কস্তে লাগলেন—

হরিপ্রভে এক জন গৌসাইয়ের দশা লাগলো, গৌড়ারা তাঁকে কোলে করে নাচুড়ে লাগলো। আর যেখানে তিনি পড়েছিলেন, জিব দিয়ে সেইখানের ধূলা চাটুড়ে লাগলো!

হিন্দুধর্মের বাপের পুণ্য কাকি দে খাবার যত কিকির আছে, গৌসাইগিরি সকলের টেকা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটা রোগা দুর্বল গৌসাই দেখুতে পাই নি! গৌসাই বলেই একটা বিকটাকার ধূম্মোচন হবে, ছেলেবেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গৌসাইদের যে রূপ বিয়ারিং পোটে আরেন ও আহার বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের পরস্যা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওঠবার যো নাই! গৌসাইরা স্বয়ং কেউ ভগবান্ বলেই অনেক ছলভ বস্তু অক্রেমে ধরে বসে পান ও কালিয়দমন পূতনাবধ গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, ব্রজবিহার প্রভৃতি ত্রীকুষের গোছালো গোছালো লীলেগুলি করে থাকেন। পেট ভরে মাংসপো ও ক্ষীর লোসেন ও রকমারি শিশু দেখে চৈতন্তচরিতামৃতের মতে—

“যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন।

গুরু তুটে কৃষ্ণ তুটে জানিবা প্রমাণ ॥

প্রেমারামাধ্যা রাধাসমা তুমি লো যুবতি।

রাখ লো গুরুর মান যা হয় যুক্তি ॥”

—প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ সওয়ায় গৌসাইরা অগুরটেকবের (মুদ্রকরাস্) কাজও করে থাকেন—পাঁচ সিকে গেলে মস্তুরও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস বেওয়া মলে এঁরাই তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন। একবার মেদিনীপুরে এক ত্রকোদ গৌসাই বড় জন্ম হয়েছিলেন। এখানে সে উপকথাটিও বলা আবশ্যক—

পূর্বের মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব তন্ত্রের গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল—নতুন বিবাহ হলে গুরুসেবা না করে স্বামিসহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্তী পাড়ারগাঁ অঞ্চলে এক জন বিশিষ্ট লোক। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আঙলাং ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ি, সকল ঘরগুলি পাকা, কেবল চতীমণ্ডল ও দেউড়ির সামনের বৈঠকখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সামনে দুটি নিজের মন্দির, একটি শান বাঁধানো পুকুরিনী, তাতে মাছও বিলক্ষণ ছিল। জিরেকর্ষে চক্রবর্তীকে মাছের জন্তে ভাবুড়ে হতো না। এ সওয়ার ১৯০০ বিঘা প্রমোত্তর জমি, চাষের জন্তে পাঁচখানা লাঙ্গল, পাঁচ জন রাশাল চাকর, পাঁচ জোড়া বঙ্গ

নিরস্ত নিযুক্ত ছিল। চক্রবর্তীর উঠানে দুটি বড় বড় ধানের মরাই ছিল, প্রাক্তন
কৃত্রিমলোক মাঝেই চক্রবর্তীকে বিলক্ষণ মান্ত কন্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা
খেলতেন। চক্রবর্তীর ছেলেগুলো কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যা মাত্র, সহরের
ব্রহ্মভানু চাটুয্যের মেজো ছেলে হরহরি চাটুয্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, বিয়ের সময়
বর কনের বয়স ১০।১১ বছরের বেশী ছিল না, স্মৃতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া, কি
মেয়ে আনা কিছু দিনের জন্তে বন্দ ছিল। কেবল পালপার্বণে, পিটে সংক্রান্তি ও
বস্তুবাটায় তত্ত্ব তাবাস্ চলতো।

ক্রমে হরহরি বাবু কালেক্স ছাড়লেন, এদিকে বয়সও কুড়ি একুশ হলো, স্মৃতরাং
চক্রবর্তী জামাই নে যাবার জন্ত অয়ং সহরে এসে ব্রহ্মভানু বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ
করেন। ব্রহ্মভানু বাবু চক্রবর্তীকে কয় দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়িতে রাখলেন,
শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরির সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। এক জন দরওয়ান, এক
জন সরকার ও এক জন চাকর হরহরি বাবুর সঙ্গে গ্যালো।

জামাই বাবু তিন চার দিনে বেতালপুরে পৌঁছিলেন। গাঁয়ে সোর পড়ে
গ্যালো চক্রবর্তীর সহরে জামাই এসেছে, গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম ফেলে ছুটো-
ছুটি জামাই দেখতে এলো। ছোঁড়ারা সহরে লোক প্রায় জাখে নি, স্মৃতরাং পালে
পালে এসে হরহরি বাবুরে ঘিরে বস্‌লো—চক্রবর্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কন্তে
লাগ্‌লো; এক দিকে আশ-পাশ থেকে মেয়েরা উঁকি মাছে; এক পাশে কতকগুলো
গোড়িমওয়ালা ছেলে জ্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েছে; উঠানে বাজে লোক ধরে না। শেষে
জামাই বাবুকে জলযোগ করাবার জন্ত বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্বের
জলযোগের যোগাড় করা হয়েছে—পিঁড়ের নীচে চার দিকে চারটি সুপুঁরি
দেওয়া হয়েছিল; জামাই বাবু যেমন পিঁড়ের পা দিয়ে বস্‌তে যাবেন অমন পিঁড়ের
গড়িয়ে গ্যালো; জামাই বাবু ধূপ করে পড়ে গেলেন! শালী শেলোজ মহলে
হাসির গব্বা পড়্‌লো। (জলযোগের সকল জিনিসগুলিই ঠাট্টাপোরা) মাটির
কালো জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়ির সন্দেশ, কাটের আক ও বিচালির জলের
চিনির পানা, জলের গেলাসে চাকুনি দেওয়া আরম্ভলো মাকোসাঁ, পানের বাটার
ছুঁতো ও ইছর পোরা। জামাই বাবু অভিকটে ঠাট্টার যজ্ঞা সহ করে বাইরে
এলেন। সময়সী দু চার শালা সম্পকের জুটে গ্যালো; সহরের গল্প, পাড়ার
জামাশা ও রঙ্গই দিনটি কেটে গ্যালো।

রজনী উপস্থিত—সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে—রাখালরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গল্প
গাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। এক একটি পরমা হুন্দরী ত্রীলোক কলসী কাকে

করে নদীতে জল নিতে আসতে—লম্পট-শিরোমণি কুয়ূদরজন যেন তাদের দেখবার জন্যই বাঁশঝাড়ের ও ভালগাছের পাশ থেকে উঁকি মাচ্ছেন। কিঁকিঁশোকা ও উইচিংড়িরা প্রাণপণে ডাকচে। ভামু, খটাস্ ও ভোঁদোড়রা শিবের ভাঙ্গা মন্দির ও গড়ো বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চামচিকে ও বাহুড়রা খাবার চেঁচায় বেরিয়েচে—এমন সময় এক দল শিয়াল ডেকে উঠলো—এক প্রহর রাত্তির হয়ে গ্যালো। ছেলেরা জামাই বাবুর বাড়ির ভেতর নিয়ে গ্যালো, পুনরায় নানা রকম ঠাট্টা ও আসল খেয়ে জামাই বাবু নির্দিষ্ট ঘরে গুতে গ্যালেন।

বিবাহের পর পুনর্বিবাহের সময়ও জামাই বাবু খুশিরালায়ে যান নাই; সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা জ্বর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন ছই জনেই বালক বালিকা ছিলেন; সুতরাং হরহরি বাবুর নিজে হবার বিষয় কি! আজ জ্বর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, জ্বরী মান করে থাকলে তিনি কলেজী এক্সকেশন ও ব্রহ্ম-জ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গবেন এবং এর পর যাতে জ্বরী লেখা পড়া শিকে তাঁর চিরহৃদয়তোমিকা হন, তার বিশেষ তত্বির কন্তে হবে। বাঙ্গালির জ্বরীরা কি বিত্তীয়া “মিস ষ্টো, মিস টমসন ও মিসেস বরুকরলি ও লেডী লিটন, বুয়্যার লিটন” হতে পারে না? বিলিভী জ্বরী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্মশীলা—তবে ক্যান বড়ি দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝড়ুড়া ও হিংসায় কাল কাটায়? সীতা, সাবিজী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল ফব্বনেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান, সে কেবল বাপ মা ও ভাতারবর্গের চেঁচা ও তত্বিরের ক্রটিমাত্র। বাঙ্গালি সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই জ্বরী পুরুষ উভয়ে কৃতবিন্দু দেখা যায় না। বিদেশাগরের জ্বরী হয় ত বর্ণপরিচয় হয় নাই; গঙ্গাজলের ছড়া—সাকারদের মাছলি ও বালুসির চর্চামেস্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। এ ভিন্ন জামাই বাবুর মনে নানা রকম খেয়াল উঠলো, ক্রমে সেই সব ভাবতে ভাবতে ও পথের ক্রেশে অধোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময় মেয়েদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গ্যালো—দেখেন যে ব্যালা হয়ে গিয়েচে—তিনি একলা বিছানায় গুয়ে আছেন।

এদিকে চক্রবর্তীর বাড়ির গিল্লিরা পরস্পর বলাবলি কন্তে লাগলেন যে, “তাই তো গা! জামাই এসেচেন, মেয়েও যেটের কোলে বহর পোনেরো হলো, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক।” সুতরাং চক্রবর্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন ছির করে প্রভুর বাড়ি খবর দিলে—প্রভু, তুরী, খন্ডি ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদীর আয়োজন হতে লাগলো।

হরহরি বাবু গুরুপ্রসাদীর কিছুমাত্র জানুতেন না, গোঁসাই দলকল নিয়ে উপস্থিত, বাড়ির সকলে শশব্যস্ত, স্ত্রী নতুন কাপড় ও সর্বালঙ্কারে ভূষিত হয়ে রেকাচে। তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীর সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। স্ত্রীরা এতে নিতান্ত সন্নিহিত হয়ে এক জন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, “ওহে আজ বাড়িতে কিসের ধুম?” ছোকরা বলে, “জামাই বাবু, তা জান না, আজ আমাদের গুরুপ্রসাদী হবে।”

“আমাদের গুরুপ্রসাদী হবে” শুনে হরহরি বাবু একেবারে তেলে-বেগুনে অলে গেলেন ও কি প্রকারে গুরুপ্রসাদী হতে স্ত্রী পরিগ্রহ পান, তারি তথ্যে ব্যস্ত রইলেন।

কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কস্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যথায় উপেক্ষা করে অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধু শাঁক স্বর্চা ও ঝিঁঝিপোকার মঙ্গল শব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কস্তে লাগলেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দুতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশানাথকে সম্বাদ দিতে গেলেন। নববধূর বাসরে আমোদ কব্বার জন্ত তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুটলেন—স্বপ্নয়রজনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোচ্ছত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই—কারণ, চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে, কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনিই অনন্তগতি। এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেয়ালরা যেন স্তব পাঠ কস্তে লাগলো—ফুলগাছেরা ফুলদল উপহার দিতে লাগলো দেখে আহলাদে প্রকৃতি সতী হাসতে লাগলেন।

চক্রবর্তীর বাড়ির ভিতর বড় ধুম। গোস্বামী বরের মত সজ্জা করে জামাই বাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন। হরহরি বাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার পরে ঘরে ঢুকলেন, মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাতে লাগলো।

হরহরি বাবু ছোঁড়ার কাছে শুনে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পুর্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন; এক্ষণে দেখলেন যে, স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। প্রভু খাটে থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গেলেন; কস্তাটি কি করে। “বংশপরম্পরানুগত ধর্মের অত্যাধা কল্পে মহাপাপ” এটি চিন্তনত আছে, স্ত্রীরা আর কোন আপত্তি করে না—সুড় সুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো। প্রভু কস্তার গারে হাত দিয়ে বলেন, “বল, আমি রাধা তুমি শ্যাম”; কস্তাটিও অল্পমতি মত “আমি রাধা তুমি শ্যাম” তিন বার বলেচে, এমন সময় হরহরি বাবু

আর থাকতে পারেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে এই “কানে বাড়ি বলরাম” বলে গোখামীকে কলসই কলসে লাগলেন ; ঘরের বাইরে জাড়া বই মরা খোল খড়াল নিয়ে ছিল—প্রভু প্রসাদীকৃত্য সেয়ে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খড়াল বাজাবে ; গোখামীর কলসইয়ের চীৎকারে তারা হরিবোলি ভেবে দেয়ার খোল বাজাতে লাগলো, মেয়েরা উলু দিতে লাগলো, কীসর বউ নাকের লম্বা ছলছল পড়ে গ্যালো। হরহরি বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেলে বলেন। দারোগা ভদ্রলোক ছিলেন (অতি কম পাওয়া যায়), তাঁরে অভয় দিয়ে সে দিম যথাসমাদরে বাসায় রেখে তার পর দিন বরকন্দাজ মোতায়ন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে সকলের তাক লেগে গ্যালো “যা, ইনি কেমন করে ঘরে ছিলেন।” শেষে সকলে ঘরে গিয়ে জাখে যে, গোখামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন, বিছানায় রক্তের নদী বচে। সেই অবধি গুরুপ্রসাদী উঠে গ্যালো, লোকেরও চৈতন্য হলো ; প্রভুরাও ভয় পেলেন। বর্তমানে যে যে গ্রামে গুরুপ্রসাদী চলিত আছে, প্রভুরা আর খয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্বাহ হয়।

আর এক বার এক সহরে গৌসাই এক বেণের বাড়ি কেউলীলা করে জন্ম হয়েছিলেন, সেটিও এই বেলা বলে নিই।

রামনাথ সেন ও শ্রামনাথসেন দুই ভাই, সহরে চার পাঁচটা হোসের যুচ্ছন্দী। দিনকতক বাবুদের বড় জলজল হয়ে উঠেছিল—চৌধুড়ি, ভেঁপু, মোসাছেব ও রাঁড়ের ছড়াছড়ি। উমেদার, বেকার, রেকমেণ্ড চিঠিওয়াল লোকে বৈঠকখানা খে খে কস্তো ; বাবুরা নিয়ত বাগান, চোহেল ও আমোদেই মস্ত থাকতেন, আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবেই বাবুদের কাজ কর্ম দেখতেন। এক দিন রবিবার বাবুরো বাগানে গিয়েচেন, এই অবকাশে বাড়ির প্রভু,—খন্ডি, খোল ও ভেঁপু নিয়ে উপস্থিত ; বাড়ির ভেতরে খবর গ্যালো। প্রভুকে সমাদরে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো, সকল মেয়েরা একত্র হলেন, চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতের মতে বেছে গোছালো গোছালো লীলে আরম্ভ করেন। ক্রমে লীলা শেষ করে গোখামী বাড়ি কিরে যান—এমন সময় ছোট বাবু এসে পড়লেন। ছোট বাবু কিছু সাহেবী মেজাজ, প্রভুকে দেখেই তেলে বেগুনে জলে পেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করে লিচ্ছাসা করেন, “কেমন প্রভু ! ভাগবতের মতে লীলে জাখাম হলো ?” প্রভু ভয়ে আমতা আমতা গোছের “আজ্ঞা হাঁ”

করে সেয়ে দিলেন। ছোট বাবুর কাছে এক জন সুখোড় গোছের কারখাঁ নোসাহেব ছিল, সে বলে, “হজুর! গোঁসাই সকল রকম লীলে করে চলেেন, কিন্তু গোবর্দ্ধনধারণটা হয় নি, অনুমতি করেন তো প্রভুকে গোবর্দ্ধনধারণটাও করে দেওয়া যায়, সেটা বাকি থাকে কেন?” ছোট বাবু এতে সম্মত হলেন, শেষে ময়ওয়ানদের হুকুম দেওয়া হলো—দরজার পাশে একখানা দশ বার মণ পাথর পড়ে ছিল, জন কতকে ধরে এনে গোস্থামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, পাথরের চাপানে গোস্থামীর কোমর ভেঙ্গে গ্যালো। সেই অবধি প্রভুরা ত্যামন ত্যামন স্থলে লীলা কস্তে আর স্থয়ং যান না—প্রয়োজন হলে রকমারি শিষ্টারা স্থয়ং প্রভুর বাড়ি পালকি চড়ে উপস্থিত হন।

এদিকে বারোইয়ারিতলায় কেতন বন্ধ হয়ে গ্যালো, কেতনের শেষে এক জন বাউল সুর করে এই গানটি গাইলে।

বাউলের সুর।

আজব সহর কল্কেতা।

রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।

হেতা বুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা ;

যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির কাঁদ পাতা।

পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ী সেমিরবেণের কড়ি,

খ্যামটা খান্‌কির খাসা বাড়ি, ভজ্রভাগ্যে গোলপাতা।

হদ্‌ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ংখানি,

পথে হেগে চোখরাঙ্গানি, লুকোচুরির ফের গাঁতা।

গিণ্টি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,

হতোম দাসে স্বরূপ ভাবে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

গানটি শুনে সকলেই খুসি হলেন। বাউলে চার আনার পরসা বক্‌সিস পেলে ; অনেকে আদর করে গানটি শিখে ও লিখে নিলেন।

বারোইয়ারি পূঁজো শেষ হলো, প্রতিমেখানি আট দিন রাখা হলো, তার পর বিলম্ব করবার আয়োজন হতে লাগলো। আমমোক্তার কানাইখন বাবু পুলিশ হতে পাস করে আনলেন। চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক-সোয়ার, নিখেন ধরা কিরিজি, আশারৌটা, ষড়ি ও পকাশটা চাক একত্র হলো। বাহাহরী কাঁট ভোলা চাকা একত্র করে গাড়ির সত করে তাতেই প্রতিমে ভোলা হলো ;

অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চলেন, ছু পাশে সড়েরা সার বেঁধে চলো। চিংপুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, রাঁড়েরা হাতের ও বান্ধার উপর থেকে রূপো-বাঁধান হাঁকোর তামাক খেতে খেতে তামাশা দেখতে লাগলো, রাস্তার লোকেরা হাঁ করে চলতি ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখতে লাগলেন। হাটখোলা থেকে বোড়াসাঁকো ও মেছোবাজার পর্যন্ত ঘোরা হলো, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জন করা হলো। অনেক পরিগ্রামে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল, আজ তারি আশু ফুরুলো। বীরকৃষ্ণ দাঁ ও আর আর অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে বাড়ি ফিরে গ্যালেন। বাবুদের ভিজে কাপড় থাকলে অনেকেই বিবেচনা কস্তো যে বাবুরো মড়া পুড়িয়ে এলেন !

বারোইয়ারি পুজোর সত্বৎসরের মধ্যেই বীরকৃষ্ণ দাঁর বাজার দেনা চেপে উঠলো, গদি ও আড়ত উঠে গ্যালো, শেষে ইন্সালভেন্ট নিয়ে ফরেনজালায় গিয়ে বাস করেন ; কিছু দিন বাদে হঠাৎ ঘর চাপা পড়ে মরে গেলেন। আমমোক্তার কানাইধন দত্তজা স্মৃতিমকোটে জাল সাক্ষী দেওয়া অপরাধে সর রবার্ট গিল সাহেবের বিচারে চোদ্দ বছরের জম্ম ট্রান্সপোর্ট হলেন, তাঁর পরিবাররা কিছু কাল অত্যন্ত হুঃখে কাল কাটিয়ে শেষে মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কস্তে লাগলো। মুড়িঘাটা লেনের হজুর কোন বিশেষ কারণে বারোইয়ারি পুজোর মধ্যেই কানী গ্যালেন। প্যালানাথ বাবু এক দিন কতকগুলি বাই ও মেয়েমানুষ নিয়ে বোট করে কোম্পানির বাগানে বেড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে আচম্কা একটা বড় ঝড় উঠলো, মাজিরে অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে বোটখানি একেবারে একটা চড়ার উপর উল্টে পরে চুরমার হয়ে ডুবে গ্যালো। বাবু বড়মানুষের ছেলে, কখন সঁাতার দেন নাই, সুতরাং জলের টানে কোথায় যে গিয়ে পড়লেন তার অজ্ঞাপি নির্ণয় হয় নাই। মুখ্যযোদের ছোট বাবু ক্রমে তারি গাঁজাখোর হয়ে পড়লেন, অনবরত গাঁজা টেনে তাঁর বন্দাকাশ জগালো, আরাম হবার জন্তে তারকেবরের দাড়ি রাখলেন, বালুসির চরণামৃত খেলেন, সাকরীদের মাহুলি ধারণ করেন ; কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না, শেষে বিবাহী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গ্যাছেন আজও তার ঠিকেনা হয় নাই। প্রধান দোয়ার গব্বারাম গাওনা ছেড়ে পৈতৃক পেশা গিলটি অবলম্বন করে কিছু কাল সংসার চালাচ্ছিলেন, গত পুজোর সময় পক্ষাঘাত রোগে মরেচেন। পচ্চু বাবু, অজ্ঞানরঞ্জন দেব বাহাদুর ও আর আর অধ্যক্ষ ও দোয়ারেরা এখনও বেঁচে আছেন ; তাঁদের বা হবে, তা এর পরে বক্তব্য।

হজুক

সাধারণে কথার বলেন, “হনরেটীন” ও “হজুতে বাজাল”; কিন্তু হত্যার বলেন “হজুকে কল্কেতা।” হেতা নিত্য নতুন নতুন হজুক, সকলগুলিই সৃষ্টি-ছাড়া ও আজগুব! কোন কাজকর্ম না থাকলে “জ্যাঠাকে গঙ্গাবাত্রা” দিতে হয়, স্ততরাং দিবারাত্র হাঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে ভাগ ও বড়ে টিপে বাতকর্ম কস্তে কস্তে নিরুদ্ধ্য লোকেরা যে আজগুব হজুক তুলবে, তার বড় বিচিত্র নয়! পাঠক! যত দিন বাজালির বেটর অকুপেশন না হচ্ছে, যত দিন সামাজিক নিয়ম ও বাজালির বর্তমান গার্হস্থ্য প্রশালীর রিকর্পেশন না হচ্ছে, তত দিন এই মহান্ দোষের মূলোচ্ছেদের উপায় নাই। ধর্ম্মনীতিতে বাঁরা শিক্ষা পান নাই, তাঁরা মিথ্যার যথার্থ অর্থ জানেন না, স্ততরাং অক্লেশে আটপৌরে ধুতির মত ব্যবহার কস্তে লজ্জিত বা লজ্জিত হন না।

ছেলে ধরা

আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুন্লেম, সহরে ছেলে ধরার বড় প্রাদুর্ভাব। কাবুলি মেওয়াওলারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়, সেখান নানাবিধ মেওয়া ফলের বিস্তার বাগান আছে, ছেলেটাকে তারি একটা বাগানের ভেতর ছেড়ে ছার, সে অনবরত পেট পুরে মেওয়া খেয়ে খেয়ে যখন একেবারে ফুলে ওঠে—রং হুদে আলতার মত হয়, এমন কি টুক্কি মাল্লে রক্ত বেরোয়, তখন এক কড়া ঘি চড়িয়ে ছেলেটাকে ঐ কড়ার উপর উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; ক্রমে কড়ার ঘি টপকিয়ে ফুটে উঠলে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে আরম্ভ হয় ও সেই রক্ত টোলা টোলা ঘিয়ের কড়ার উপর পড়ে; ক্রমে ছেলের সমুদায় রক্ত বেরিয়ে এলে নানাবিধ মেওয়া ও মিছরির ফোড়ন দিয়ে কড়াটি নাবান হয়। নবাব ও বড় বড় মোসলমানেরা তাই খান! আমরা এই ভয়ানক কথা শুনে অবশি একলা বাড়ির বাড়িরে প্রাণান্তেও যেতেম না ও সেই অবশি নেড়েদের উপর বিজ্ঞাতীয় যুগা জন্মে প্যালে।

প্রতাপচাঁদ

আমরা বড় হলেম, হাতে খড়ি হলো। একদিন গুরুমশায়ের ভরে চাকরদের কাছে জুড়িয়ে রয়েছি, এমন সময় চাকররা পরস্পর বলাবলি কছে যে, “বর্জমানের

রাজা প্রতাপচাঁদ একবার মরেছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসেছেন, বর্জমানের রাজত্ব নেবার জন্য নালিশ করেছেন, সহরের তাবৎ বড়মামুষরা তাঁকে দেখতে যাচ্ছেন—এবারে পরাণ বাবুর সর্বনাশ ; পুত্রিপুত্রুর নামজুর হবে !” নতুন জিনিষ হলেই ছেলেদের কোতুলক বাড়িয়ে ছায়, শুনে অবধি আমরা অনেকেই কাছে খুঁটরে খুঁটরে রাজা প্রতাপচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কস্তেম ; কেউ বলতো, “তিনি এক দিন এক রাত জলে ডুবে থাকতে পারেন” ; কেউ বলতো, “তিনি গুলিতেও মরেন নি—রাণী বলেছেন, তিনিই রাজা প্রতাপচাঁদ—ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে লকে কান কেটে গিয়েছিল, সেই কাটাতেই তাঁর ভগ্নী চিনে ফেলেন !” কেউ বলে, “তিনি কোন মহাপাপ করেছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরদের মত অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলেন ! বাস্তবিক তিনি মরেন নি, অস্থিকা কালনায় যখন তাঁরে দাহ কস্তে আনা হয়, তখন তিনি বাস্তবের মধ্যে ছিলেন না, শুধু বাস্তব পোড়ান হয় ।” সহরে বড় হজুক পড়ে গ্যালো, প্রতাপচাঁদের কথাই সর্বত্র আন্দোলন হতে লাগলো ।

কিছু দিন এই রকমে যায়—এক দিন হঠাৎ শোনা গ্যালো, সুপ্রিমকোর্টের নুসর বিচারে প্রতাপচাঁদ জাল হয়ে পড়েছেন । সহরের নানাবিধ লোক, কেউ সুবিধে কেউ কুবিধে—কেউ বলে, “তিনি আসল প্রতাপচাঁদ নন”—কেউ বলে, “ভাগি দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন, তাই জাল প্রব হলো ! তা না হলে পরাণ বাবু টেবুটা পেতেন ।” এদিকে প্রতাপচাঁদ জাল সাব্যস্ত হয়ে ববানগরে বাস কল্লেন । সেখায় বুজুরুক হন—খান্কা, দুস্কি ও গেরস্ত মেয়েদের ম্যালা লেগে গ্যালো, প্রতাপচাঁদ না পারেন হান কন্সই নাই । ক্রমে চলতি বাজনার মত প্রতাপচাঁদের কথা আর শোনা যায় না ; প্রতাপচাঁদ পুরোণো হলো,—আমরাও পাঠশালে ভর্তি হলেম ।

মহাপুরুষ

পাঠক ! পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাষ্টার যেন বাগ বিবেচনা হচ্ছে ! এক দিন আমরা স্কুলে একটার সময়ে ঘোড়া ঘোড়া খেল্টি, এমন সময় আমাদের জলতোলা বুড়ো মালী বলে যে, “ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি এক জন মহাপুরুষ এসেছেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড় বড় অলংকার ও উইয়ের চিপি হয়ে গিয়েচে—চোক বুজে ধ্যান কল্লেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুললেই সমুদ্র তরঙ্গ করে দেবেন ।” শুনে আমাদের বড় ভয় হলো । ইন্সুলে ছুটি হলো আমরা বাড়িতে এসেও মহাপুরুষের বিষয় ভাবতে লাগলেম ; লাটু, ঘুড়ী,

ককেট ও পায়রা পড়ে রইলো—মহাপুরুষ ছাখ্বার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হয়ে উঠলো ; শেষে আমরা দৌড়ে ঠাকুরমার কাছে গেলুম ।

আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্তিরে শোবার সময় “বেজমা-বেজুমী,” “পায়রা রাজা,” “রাজপুস্তুর, পাস্তরের পুস্তুর, সওদাগরের পুস্তুর ও কোটালের পুস্তুর—চার বন্ধু,” “তালপস্তরের খাঁড়া জাগে, ও পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে” ও “সোনার কাটি রূপোর কাটি” প্রভৃতি কত রকম উপকথা কইতেন । কবিকল্পণ ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন—আমরা শুন্তে শুন্তে ঘুমিয়ে পড়তুম ! —হায় ! বাল্যকালের সে সুখসময় মরণকালেও স্মরণ থাকবে—অপরিচিত সংসার হৃদয় কমলকুসুম হতেও কোমল বোধ হতো, সকলেই বিশ্বাস ছিল ; ভূত পেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর লোমাঞ্চ হতো—হৃদয় অশুভাপ ও শোকের নামও জান্ত না—অমর বর পেলেও সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কসে ইচ্ছা হয় না ।

আমরা শোবার সময় ঠাকুরমাকে সেই মালীর মহাপুরুষের কথা বল্লম— ঠাকুরমা শুনে খানিক ক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ও শেষে এক জন চাকরকে পরদিন সকালে মহাপুরুষের পায়ের ধুলো আনতে বলে দিয়ে মহাপুরুষের বিষয়ে আরো ছ এক গল্প বল্লেন ।

ঠাকুরমা বল্লেন,—বহর আশী হলো (ঠাকুরমার তখন নতুন বিয়ে হয়েছে) আমাদের বারাণসী ঘোষ কাশী যাবার সময় পথে জঙ্গলের ভেতর ঐ রকম এক মহাপুরুষ ছাখেন । সেই মহাপুরুষও ঐ রকম অচৈতন্য হয়ে ধ্যানে ছিলেন । মাজিরে ধরাধরি করে নৌকায় তুলে আনে । বারাণসী তাঁকে বড় যত্ন করে নৌকায় রাখলেন । তখন ছাপ্‌ঘাটীর মোহানায় জল থাকতো না বলে কাশীর যাত্রীরে বাদাবনের ভেতর দিয়ে আসতেন, সুতরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে আসতে হলো । এক দিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকো যাচ্ছে, মাজি ও অস্ত্র অস্ত্র লোকেরা অশ্রুমনস্ক হয়ে রয়েছে, এমন সময় জলের ধারে ঠিক ঐ রকম আর এক জন মহাপুরুষ এসে দাঁড়ালেন । এদিকে এ মহাপুরুষ নৌকোর গল্লুইয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন, ড্যান্ডার মহাপুরুষ এসে দাঁড়াবামাত্র চোখ চেয়ে দেখলেন, এরি মধ্যে ড্যান্ডার মহাপুরুষও হাসতে হাসতে নৌকোর উপর এসে নৌকোর মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গ্যালেন, মাজি ও অস্ত্র অস্ত্র লোকেরা হাঁ করে রইলো ! বারাণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু আর মহাপুরুষদের দেখতে পেলেন না, এঁরা সব সে কালের

হুঁকি খাবি, কেউ দশ হাজার কেউ বিল হাজার বৎসর ভগ্নিশ্বে কছেন, এঁরা মনে কল্পে সব কল্পে পারেন।

আর একবার বিলিপুরের দত্তরা সৌন্দর্যবন আবাদ কল্পে কল্পে ত্রিশ হাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখেছিল, তাঁর গায়ে বড় বড় অশখগাছের শেকড় জমে গিয়েছিল, আর শরীর শুকিয়ে চালাকাঠের মত হয়েছিল। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে বিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক মাস বিলিপুরে থাকেন, শেষে এক দিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গ্যালেন, কেউ তার ঠিকানা কল্পে পাল্লেন না।—শুনতে শুনতে আমরা হুঁমিয়ে পড়লেম। ঠাকুরমাও শুতে গ্যালেন।

তার পর দিন সকালে রামা চাকর মহাপুরুষের পায়ের ধুলো এনে উপস্থিত কল্পে ; ঠাকুরমা একটি বড় জয়তাকের মত মাহুলিতে সেই ধুলো পূরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, স্ততরাং সেই দিন থেকে আমরা ভূত, পেত্নী, শাঁকচুরী ও ব্রহ্ম-দত্তিদের হাত থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলেম।

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়লেম—কালেজে ভর্তি হলেম—সহাধ্যায়ী হুঁ চার সমকক্ষ বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো ; এক দিন আমরা একটার সময় গোলদীঘির মাঠে ফড়িং ধরে খালা করে ব্যাড়াচ্ছি, এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে বেড়াতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড়মানুষের বাড়ি রাঁধুনী বায়ুন ছিলেন, এডুকেশন কোলেলের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সেন বাবুর সুপারিসে ও প্রিন্সিপালের কুপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন ; পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড় ভালবাসতেন, স্ততরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য পান দিয়ে তুষ্ট কল্পে কল্পে না। পণ্ডিত মহাশয় মাটে আস্বামাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্পে ; আমরাও এক দোনা মিঠে বিলি উপহার দিলেম, পণ্ডিত মহাশয় মিঠে বিলি বড় পছন্দ কল্পেন, পান খেয়ে আমাদের নাম ধরে বলেন, “আরে ছতোম ! আর শুনেচো ? কুকৈলেসে রাজাদের বাড়ি যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনেছিল, ডাক্তার সাহেব তার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েচেন—প্রথমে রাজারা তার গায়ে গুলু পুড়িয়ে দেন, জলে ডুবিয়ে রাখেন, কিন্তু কিছুতেই ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। শেষে ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধলে তার চেতনা হলো ; এখন সেই মহাপুরুষ লোকের গা টিপে পরমা নিচে, রাজাদের পাকা টেনে বাতাস কল্পে, যা পাছে তাই থাকে, তার মহাপুরুষ-দুঃর ভেঙে গ্যাচে !”

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা তাক্ হয়ে পড়লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তিত্ব ছিল—মরিচবিহীন কপূরের মত—ষ্টপরহীন ইথরের মত একেবারে উবে গ্যালো। ঠাকুরমার মাহুলিটি তার পর দিনেই খুলে ফেলা হলো, ভূত, শাকচুরী, পেত্নীদের ভয় আবার বেড়ে উঠলো।

লালা রাজাদের বাড়ী দাকা

আমরা স্কুলে আর এক কেলাস উঠলেম, রাঁধুনী বামুন পণ্ডিতের হাত এড়ানো গ্যালো। এক দিন আমরা পড়া বলতে না পারায় জল খাবার ছুটির সময় গাধার টুপি মাথায় দিয়ে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কনফাইন্স হয়ে রয়েছি, মাষ্টার মশাই তামাক খাবার ঘরে জল খেতে গ্যাচেন (তাঁর ক্ষিদে বরদাস্ত হয় না, কিন্তু ছেলেদের হয়), এক বামুন বাবুদের বাড়ির ছোটবাবুর মুখে শ্রামা পাখির বোল— “বক বকম্ বক বকম্” করে পায়রার ডাক ডেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও পনি টাট্টু সেজে কদম ভাখাচ্ছেন ; এমন সময় কাশীপুর অঞ্চলের এক জন ছোকরা বলে যে, “কাল বৈকালে পাক্‌পাড়ার লালা বাবুদের” (শ্রীবিষ্ণু । আজকাল রাজা) “লালারাজাদের বাড়ি এক দল গোরামাতাল হয়ে এসে চার পাঁচ জন দরওয়ানকে বর্শায় বিঁদে গিয়েচে, রাজারা ভয়ে হাসন হোসেনের মত একটা পুরোধো পাত্‌কোর ভেতর লুকিয়ে প্রাণরক্ষা করেচেন।” (বোধ হয় কেবল গিরগিটির অগ্রভুল ছিল) আর এক জন ছোকরা বলে উঠলো, “আরে তা নয়, আমরা দাদার কাছে শুনিচি, রাজাদের বাড়ির সামনের গাছে একটা কাগ মেরেছিল বলে রাজাদের জমাদার সাহেবদের মাতে আসে,” আর একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের মুখের কাছে হাত নেড়ে বলে, “আরে না হে না, ও সব বাজে কথা ! আমারও বাড়ি টালাতে, রাজাদের বাড়ির পেছনে যে সেই বড় পগারটা আছে জান ? তারি পাশে যে পচা পুকুর, সেই আমাদের খিড়কি। রাজাদের এক জন আমলার ভাই ঠিক বানরের মত মুখ ; তাই দেখে এক জন সাহেব ভেংচেছিল, তাতে আমলাও ভেংচোর, তাতেই সাহেবরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে দল বল সমেত এসে গুলি করে।” অনেকে অনেক রকম কথা বল্‌চেন, এমন সময় মাষ্টার বাবু তামাক খাবার ঘর থেকে এলেন, ছোট বাবুর পনি টাট্টুর কদম্ ও “বক বকম্” বন্দ হয়ে গ্যালো, রাজারা বাঁচলেন—চং চং করে দুটো বাজলে কেলাস বসে গ্যালো, আমরাও জল খেতে ছুটি পেলেম। আমরা বাড়ি গিয়ে রাজাদের

ব্যাপার অনেকের কাছে আরো ভয়ানক রকম শুনলেন, বাজালা কাগজওয়ালারা “এক দল গোরা বাজনা বাজিয়ে বাচ্ছিল, দলের মধ্যে এক জনের জলতৃকা পাইল, রাজাদের বাড়ি যেমন জল খাইতে খাইবে, জমাদার গলা ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দেয়, তাহাতে সঙ্গের কর্ণেল গুলি করতে ছুকুম ছান” প্রভৃতি নানা আজগুবি কথায় কাগজ পোরাতে লাগলেন। সহরের পূর্বের বাজালা খবরের কাগজ বড় চমৎকার ছিল, “অমুক বাবুর মত দাতা কে!” “অমুক বাবুর মার আঁধে ক্রোর টাকা ব্যয়” (বাবু মুচ্ছদী মাত্র) “অমুক মাতাল জলে ডুবে মরে গ্যাচে,” “অমুক বেস্তার নং খোয়া গিয়েচে, সন্ধান করে দিতে পায়ে সম্পাদক তার পুরস্কারস্বরূপ তারে নিজ সহকারী করবেন” প্রভৃতি আলত পালত কথাতেই পত্র পুরুতেন, কেউ গাল দিয়ে পয়সা আদায় কতেন, কেউ পয়সার প্রত্যাশায় প্রশংসা কতেন—আজকালও অনেক কাগজে চোরা গোপ্তান চলে।

শেষে সঠিক শোনা গ্যালো যে, এক জন দরওয়ানকে এক জন ফিরিকী শিকারী বাকবিত্তায় ঝকড়া করে গুলি করে।

কুশ্চানি ছুকুম

পাকপাড়া রাজাদের হাঙ্গামা চুকতে চুকতে ছুকুম উঠলো, “রণজিৎসিংহের পুত্র দলিপ যিশুমত্রে দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সমুদায় শিখেরা কুশ্চান হয়েছেন, ও জন কতক ভাটপাড়ার ঠাকুরও কুশ্চান হবেন।” ভাটপাড়ার গুরুহুষ্টিরে প্রকৃত হিন্দু, তাঁরা কুশ্চান হবেন শুনে অনেকে চমকে উঠলেন, শেষে ভাটপাড়ার বদলে পাতুরেঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বেরিয়ে পড়লেন! সমর্থন্য কৃষ্ণমোহন কণ্ঠা উচ্ছুগুণ করে দিলেন, এয়েরও অভাব রইলো না। সহরে যখন যে পড়া পড়ে, শীগ্গির তার শেষ হয় না; সেই হিড়িকে এক জন ইন্সুল মাষ্টার কালীঘেটে হালদার, এক জন বেণে ও কায়স্থও কুশ্চান দলে বাড়লো—ছ চার জন বড় বড় ঘরের মেয়েমানুষও অঙ্কার থেকে আলায় এলেন। শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগলো, কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অহুতাপ ও ছরবস্তার সেবা কন্তে লাগলেন। কুশ্চানি ছুকুম রাস্তার চলতি লঠনের মত প্রথমে আশপাশ আলো করে শেষে অঙ্কার করে চলে গ্যালো। আমরাও ক্রমে বড় হয়ে উঠলেন—কুল আর ভাল লাগে না।

মিউটিনি

পাঠকগণ! একদিন আমরা মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় গুনুলেম, পশ্চিমের সেপাইরে ক্ষেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লীর ছেড়ে চীফ্ আবার “দিল্লীখরো বা জগদীখরো বা” হবেন—ভারি বিপদ! সহরে ক্রমে হলস্থল পড়ে গ্যালো, চুনোগলি ও কসাইটোলার মেটে হীদ্রুস, পিদ্‌রুস, গমিস্, ডিস্ প্রভৃতি ফিরিকীরে খাবার লোভে ভলিষ্টিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরো পাহারা বস্‌লো, নানা রকম অসুত হজুক উঠতে লাগ্‌লো—আজ দিল্লী গ্যালো,—কাল কানপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশা খ্যালার হারকেতের মত ইংরেজরা উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গ্যালো, “শ্রীবুদ্ধিকারী” সাহেবরা (হিঁদ্রু দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কস্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গবার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙ্গালির উপর বাড়তে লাগ্‌লেন। লার্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালিদের অস্ত্রশস্ত্র (বাঁটি ও কাটারিমাত্র) কেড়ে নিতে অগ্ররোধ কল্লেন! বাঙ্গালিরা বড় বড় রাজকর্ষ না পায় তারও তদ্বির হতে লাগ্‌লো, ডাকঘরের কতকগুলি ছেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গ্যালো, নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙ্গা ব্যাড়া) দাদন, গাদন ও শ্রামচাঁদ খ্যালাতে লাগ্‌লেন। শ্রামচাঁদ সামান্নি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না—সেপাই তো কোন্‌ ছার! লক্ষ্যেয় বাদসাকে কেয়লায় পোরো হলো, গোরারা সময় পেয়ে ছ চার বড় বড় ঘরে লুট্‌তরাজ আরম্ভ কলে, মার্শাল ল। জারি হলো, যে ছাপাষত্বের কল্যাণে হত্যার নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচেন, যে ছাপাষত্ব কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহারা—কি খোলার ঘর, সকলকে এক রকম জাখে, ব্রিটিশ কুলের সেই চিরপরিচিত ছাপাষত্বের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছু কাল শিকলি পব্‌লেন—বাঙ্গালিরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে, “যদিও এক শ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা মাড়া বাঙ্গালিই আচেন—বহু দিন ব্রিটিশ সহবাসে, ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্রিটিশ ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেন নি। (পাব্‌বেন কি না, তারও বড় সন্দেহ!) তাদের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকে তুখানের জয়ে গজায় নোকো চড়েন না—রাতিরে প্রস্তাব কস্তে উঠতে হলে স্ত্রীর বা চাকর চাকরাণীর হাত ধরে স্রের বাইরে যান, অন্তরের মধ্যে টেবিল ও পেন্‌নাইক

ব্যবহার করে থাকেন, যাঁরা আপনার ছায়া দেখে ভয় পান—তারা যে লড়াই করবেন এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। বলতে কি, কেবল আহার ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচারে তারা ইংরেজদের স্বেচ্ছায় করে নিয়েছেন। যদি গবর্ণমেন্টের হুকুম হয়, তা হলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে ছান—রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিভী বাবুরা কিব্‌তি ফলায়ে বসেন—ও ঘোষজা গাঁজা ধরেন, আর বাগান্‌দর মিত্র বনাতের প্যানটুলন ও বিলিভী বদমাইশি থেকে স্বতন্ত্র হন।”

ইংরেজরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—লার্ড ক্যানিংয়ের রিকলের জন্তে পালিয়ামেন্টে দরখাস্ত করলেন, সহরে হজুকের একশেষ হয়ে গ্যালা। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আসতে লাগলো—সেই সময় বাজারে এই গান উঠলো।

গান।

“বিলাত থেকে এলো গোরা,
মাথায় পর কুব্‌তি পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা,
হাইল্যাণ্ডনিবাসী তারা।
টানটিয়া টোপির মান,
হবে এবে খর্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়বে ধরা ॥”

বাকালিরা বোপ বুখে কোপ ফেলতে বড় পটু ; খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিমের বেলায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, “বিধবা-বিবাহের আইন পাস ও বিধবা-বিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে ক্লেপেচে। গবর্ণমেন্ট বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েছেন—বিস্তেসাগরের কর্ণ গিয়েচে—প্রথম বিধবাবিবাহ বর শিরীশের কাঁসি হবে!”

কোথাও হজুক উঠলো, “দলিপ সিংকে কুশান করাতে, নাগপুরের রাণীদের ক্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লক্কোয়ের বাদসাই যাওয়াতেই মিউটিনি হলো।”

নানা মূনির নানা মত ! কেউ বলেন, সাহেবরা হিন্দুর ধর্মে হাত ছান, তাতেই এই মিউটিনি হয়েছে। তারকেশ্বরের মোহন্তের রক্ষিত রাঁড়—কাশীর বিশেষ্বরের

পাণ্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড় হালদারের বাড়ির গির্নিয়ে স্বপ্নে দেখেছেন, ইংরেজদের রাজত্ব থাকবে না। ছই এক জন ভট্টচামি ভবিষ্যৎ পুরাণ খুলে তারই নজির ত্যাখালেন।

ক্রমে সেপাইয়ের হুজুরের বাড়তি কমে গ্যালো—আজ দিল্লী দখল হলো—নানা পালালেন—জং বাহাদুরের সাহায্যে লক্ষ্মী পাওয়া হলো! মিউটিনির প্রায় সমুদায় সেপাইরে ফাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হলেন—অবশিষ্টেরা ক্যানিঙের পলিসিতে কমা প্রার্থনা করে বেঁচে গ্যালেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুরোনো বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন, বাজী, তেপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা “কুইনের খাসে প্রজার আর দুঃখ রবে না” বাড়ি বাড়ি গেয়ে বেড়াতে লাগলেন, গর্ভবতীর যত দিন একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন “ছেলে কি মেয়ে” লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রোক্লেমেশনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

মিউটিনির হুজুর শেষ হলো—বাজালির কঁাসি ছেঁড়া অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন, কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গীর পেলেন। অনেক বামুনে কপাল ফলে উঠলো, “যখন যার কপাল ধরে—” ইত্যাদি কথার সার্থকতা হলো। রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জানতে পারে, সেইরূপ মিউটিনি উপলক্ষে গবর্ণমেন্টও বাজালি শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জানতে অবসর পেলেন, “স্ত্রীবুদ্ধিকারীরা” আশা ও মান ভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বলতেছিলেন, এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাজালিদের দেখতে লাগলেন—আমরাও স্কুল ছাড়লেম। আঃ! বাঁচলেম—গায়ে বাতাস লাগলো।

মরাকেরা

আমরা ছেলেবেলাতেই জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম, স্কুল ছাড়াতে জ্যাটামি ভাতের ফ্যানের মতন উৎসে উঠলো, (বোধ হয় পাঠকরা এই হত্যার প্যাটার নকশাতেই আমাদের জ্যাটামির দৌড় বুঝতে পেরে থাকবেন) আমরা প্রায় জ্যাটা হয়ে উঠলেম—কেউ কেউ আদর করে “চালাকদাস” বলে ডাকতে লাগলেন।

ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাজলা ভাবার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবাবও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্বেই বলিছি যে, আমাদের বুড়া

ঠাকুরমা আমাদের ঘুমবার পূর্বে নানাপ্রকার রূপকথা কইতেন। কবিকল্প, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াইতেন। আমরাও সেইগুলি মুখস্থ করে শুলে, বাড়িতে ও মার কাছে আওড়াইতাম—মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্তে কি পয়ার কিছু একটি করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোংলা হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সংস্কারও ছিল, সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাগ ও পায়রাদের জন্তে ছাতে ছড়িয়ে দিতুম; আর আমাদের মুখুরী বলে দিব্বি একটি সাদা বেরাল ছিল (আহা! কাল সকালে সেটি মরে গ্যাচে—বাচ্চাও নাই) বাকী সে প্রসাদ পেতো। সংস্কৃত শেখাবার জন্তে আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্তে বড় পরিশ্রম কতেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুকুবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটারামের স্মৃতি হলো; টিকি, কৌটা ও রাজা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য দেখলেই তক কস্তে যাই, হোঁড়াগোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তকে হারিয়ে টিকি কেটে নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখতে চেষ্টা করি ও অস্তুর লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃত কালেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক এক জন সংস্কৃত কালেজের ছাত্র হয়ে পড়লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উচু হয়ে উঠলো—কখন বোধ হতে লাগলো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো (ও: শ্রীবিষ্ণু, কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন), তা হওয়া হবে না, তবে কি ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জন্সন? না! (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন) সেটি বড় অসম্ভব হয়, তবে রামমোহন রায়? হাঁ, এক দিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মস্তে পারবো না!

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিন্বে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো, ভারই সার্থকতার জন্তই যেন আমরা বিভোৎসাহী সাজ্লেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জানুক যে, আমরাও ঐ দলের এক জন ছোটখাট কেঁট বিটুর মধ্যে!

হায়! অল্প বয়সে এক এক বার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাঙ্গালামো করেছি, এখন সেইগুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাসি পায়; আবার এখন

যে পাগলামি প্রকাশ করি, এর জন্ত বুক বয়সে অনুতাপ তোলা রইলো ! স্বভাব-শরীর পাশে যবে এইগুলির ভয়ানক ছবি ছাখা যাবে, ভয়ে ও লজ্জায় শরীর দাঁহ কস্তে থাকবে, তখন সেই অনন্ত আশ্রয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর জুড়াবার স্থান পাওয়া যাবে না ! বাপ মার কাছে মার খেয়ে ছেলেরা যেমন তাঁদেরই নাম করে “বাবা গো—মা গো” বলে কাঁদে, আমরাও তেমনি সেই ঈশ্বরের আশ্রয় লভন নিবন্ধন বিপদে পড়ে তাঁর নাম ধরেই, পাঠক ! তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা ছাখাতে ছাখাতে তরে যাব !

প্রায় গর্ষ্মিতে এক দিন আমরা মোটা চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাড়াচ্ছি, এমন সময় নদে অঞ্চলের এক জন মুহুরি বলে যে, “আমাদের দেশে হজুক উঠেচে, ১৫ই কার্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মড়া মানুষরা যমালয় থেকে ফিরে আসবে—‘জন্মের মধ্যে কৰ্ম নিমূর চৈত্র মাসে রাসের’ মত সহরের কোন কোন বেণে বাবুরা সিজি বাহিনী ঠাকরণের পালায় যেমন ছোট আদালতের ছ চার কয়েদী খালাস করে অহঙ্কার করেন, সেই রকম স্বর্গে কোন দেবতা আপনার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে যমালয়ের কতকগুলি কয়েদী খালাস করবেন, নদের রামশর্মা আচাযি গুণে বলেচেন।” আমরা এই অপরাধ হজুক শুনে তাক হয়ে রইলো ! এদিকে সহরেও ক্রমে গোল উঠলো—“১৫ই কার্তিক মড়া ফিরবে।” বাজলা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পুরাবার জিনিষ পেলেন—একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে পূর্বের গেরোটি যেমন আলগা হয়ে যায়, বিধবা বিবাহ প্রচার করাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিচ্ছেদাগরের প্রতি যে ভক্তিতুক জন্মেছিল, এই প্রায় হজুকে ঋতুগত ধর্মমেষ্টরের পারার মত একেবারে অনেক ডিগ্রী নেবে গিয়ে বিলক্ষণ চিলে হয়ে পড়লো।

সহরের যেখানে যাঁই, সেইখানেই মড়া ফেরবার মিছে হজুক। আশা, নির্বোধ স্ত্রী ও পুরুষ দলের প্রিয়সহচরী হলেন। জোচ্চোর ও বদমাইশেরা সময় পেয়ে গোছালো গোছালো জায়গায় মড়া ফেরা সেজে যেতে লাগলো, অনেক গেরেস্তোর ধর্ম নষ্ট হলো—অনেকের টাকা ও গয়না গ্যালো—বাজারে হস্তেল মাগ্গি হয়ে উঠলো ! ক্রমে আষাঢ়াস্ত বেলার সন্ধ্যার মত, শোকাভূতের সময়ের মত ১৫ই কার্তিক নবাবী চালে এসে পড়লেন। দুর্গোৎসবের সময় সন্ধিপূজার ঠিক শুভক্ষণের জন্ত পৌত্তলিকরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন—ডাক্তারের জন্ত দুর্ধ্ব রোগীর আত্মীয়রা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন শেখবান্দিন প্রতীক্ষা করেন—বিধবা ও পুত্রপ্রাতাহীন নির্বোধ পরিবারেরা সেই রকম

১৫ই কার্তিকের অপেক্ষা করে ছিলেন। ১৫ই কার্তিক দিল্লীর লাড়ু হরে পড়লেন—যাঁরা পূর্বে বিশ্বাস করেন নি, ১৫ই কার্তিকের আড়ম্বর ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিশলেন। ছেলেখালা আমাদের একটি চিনের ধরগোশ ছিল, আজ বছর আটেক হলো সেটি মরেচে—আমরাও তার ফিরে আসবার জন্য কচি কচি দুর্বোঁ দ্বাস তুলে, বহু কালের ভাঙ্গা পিঁজরেটি ঝেড়ে ঝুড়ে তুলো পেড়ে বিছানা টিছানা করে তার অপেক্ষায় রইলেম।

১৫ই কার্তিক মড়া ফিরবে কথা ছিল, আজ ১৫ই কার্তিক। অনেকে মড়ার অপেক্ষায় নিমতলা ও কাশী মিত্রের ঘাটে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যালা, রাত্তির দশটা বাজে, মড়া ফিরলো না; অনেকে মড়ার অপেক্ষায় থেকে মড়ার মত হয়ে রাত্তিরে ফিরে এলেন; মড়া ফেরার হুজুক থেমে গ্যালা!

আমাদের জাতি ও নিন্দুকেরা

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হয়ে উঠলেম; দু'চার জন আমাদের অবস্থার হিংসে কস্তে লাগলেন; জাতিবর্গের বৃকে ঢেঁকি পড়তে লাগলো—আমাদের বিপদে মুচ্কে হাসেন ও আমোদ করেন; তাঁদের এক চোখ কাণা হয়ে গেলে যদি আমাদের দু'চক্ষু কাণা হয়, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটিতে গুলে খেতে পারলে তার বাটিটি নষ্ট হয়—স্বয়ং না হয় গুলেই খেলেন। জাতি বাবু ও বিবিদেরও সেই রকম ব্যবহার বেকতে লাগলো। লোকের আট-কুড়ো হয়ে বনে একা থাকা ভাল, তবু আমাদের মতন জাতির সঙ্গে এক ঘর ছেলে-পুলে নিয়েও বাস করা কিছু নয়! আমাদের জাতিরা দুর্ধ্যোধনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকেয়ী ও শূর্ণগণা হতেও সরেস! ক্রমে এক দল শত্রু জন্মালেন, এক দল ফ্রেণ্ডও পাওয়া গ্যালা। যাঁরা শত্রুর দলে মিশলেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধরে নিন্দে কস্তে আরম্ভ করলেন। ফ্রেণ্ডরা সাধ্যমত ডিকেও কস্তে লাগলেন, শত্রুরা খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প করেছিলেন, সুতরাং কিছুতেই ধামলেন না; আমরাও অনেক সন্ধান করে দেখলুম যে, যদি তাঁদের কোন কালে অপরাধ করে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চটতে পারেন; কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলুম না, বরং সন্ধানে বেরলো যে, নিন্দুক দলের অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই—লোকের সাধ্যমত

উপকার করা যেমন কতকগুলির চিরন্তন ব্রত, সেইরূপ বিনা দোষে নিন্দা করাও লহরের কতকগুলি লোকের কর্তব্য কর্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য—আমরা প্রার্থনা করি, নিম্নকরা কিছু কাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেকে তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তারা যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনাই ধামেন, তেমনি এঁরা আপনা আপনি থামবেন ; তবে অনেকের এই পেশা বলেই যা হোক—পেশাদারের কথা নাই !

নানাসাহেব

মড়া ফেরা ছজুক থামলে, কিছুদিন নানাসাহেব দশ বারো বার মরে গ্যালেন, ধরা পড়লেন ও আবার রক্তবীজের মত বাঁচলেন। সাতপেয়ে গরু—দরিয়াই ঘোড়া—লঙ্কায়ের বাদসা—শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে—ওয়েল্‌স্ সাহেব—নীল বাগুরে লঙ্কাকাণ্ডে লঙের মেয়াদ—কুমীর, হাঙ্গর ও নেকড়ে বাগের উৎপাতের মত ইংলিশম্যান ও হরকরা নামক দুখানি নীল কাগজের উৎপাত—ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রীক্সে দলাদলির ষোঁট ও শেষে হঠাৎ অবতারের ছজুক ষেড়ে উঠলো।

সাতপেয়ে গরু

সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘরভাড়া কল্লেন, দর্শনী ছু পয়সা রেট হলো ; গরু ভাখবার জন্ত অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘন্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগলো ; কিছু দিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গ্যালেন।

দরিয়াই ঘোড়া

দরিয়াই ঘোড়াও ঐ রকমে রোজগার কস্তে লাগলেন ; বেশির মধ্যে বিক্রি হবার জন্ত ছ চার মাড়ালো মাড়ালো খামওলা সেপাই পাহারা ও গোরার কোচম্যান

(যেখানে অন্দর মহলেও ঘোড়ার সর্বদা সমাগম) ওয়ালা বাড়িতে গমনাগমন করেন। কে নেবে? লাক টাকা দর! আমাদের সহরের কোন কোন বড়-মামুষের যে ত্রিশ চল্লিশ লাক টাকা দর, পিঁজরের পুরে চিড়িয়াখানায় বাথবারও বিলক্ষণ উপযুক্ত; কিন্তু কৈ! নেবার লোক নাই! এখন কি আর সৌখীন আছে? বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা আর কোথাও নাই—সেখায় তত্ত্ব, রত্ন, লঙ্কার, উল্লুক, ভাল্লুক প্রভৃতি নানা রকম আজগুবী কেতার জানোয়ার আছে, এমন কি এক আদৃতির জোড়া নাই!

— — —

লঙ্কায়ের বাদসা

দরিয়াই ঘোড়া কিছু দিন সহরে থেকে শেষে খেতে না পেয়ে দরিয়ায় পালিয়ে গ্যালেন। লঙ্কায়ের বাদসা দরিয়াই ঘোড়ার জায়গায় বসলেন—সহরে ছজুক উঠলো, “লঙ্কায়ের বাদসা মুচিখোলায় এসে বাস করেচেন, বিলেত যাবেন; বাদসার বাইয়ানা পোশাক, পায়ে আলতা,” কেউ বল্ল, “রোগা ছিপছিপে, দিক্‌বি দেখতে, ঠিক যেন একটি অঙ্গরা।” কেউ বল্ল, “আরে না, বাদসাটা একটা কুপোর মত মোটা, ঘাড়ে গন্দানে, গুণের মধ্যে বেশ গাইতে পারে।” কেউ বল্ল, “আঃ—ও সব বাজে কথা, যে দিন বাদসা পার হন, সে দিন সেই ইষ্টিনারে আমিও পার হয়েছিলেম; বাদসা জামবর্ণ, একহারা, নাকে চসমা, ঠিক আমাদের মৌলবী সাহেবের মত।” লঙ্কায়ের বাদসা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় দিন কত সহর বড় গুলজার হয়ে উঠলো। চোর বদমাইশরাও বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করে নিলে; দোকান্দারদেরও অনেক ভাঙ্গা পুরোণো জিনিষ বেথড়ক দামে বিক্রি হয়ে গ্যালো; ছুই এক খ্যামটাওয়ালী বেগম হয়ে গ্যালেন। বাদসা মুচিখোলার অর্ধেকটা জুড়ে বসলেন। সাপুড়েরা যেমন প্রথমে বড় বড় কেউটে সাপ ধরে হাঁড়ির ভেতর পুরে রাখে, ক্রমে তেজ মড়া হয়ে গ্যালো খেলাতে বার করে, গবর্মেন্টও সেই রকম প্রথমে বাদসাকে কিছু দিন কেন্দ্রায় পুরে রাখলেন, শেষে বিষ-দাঁত ভেঙ্গে ভেজের হ্রাস করে খেলতে ছেড়ে দিলেন। বাদসা ডব্বরর তালে খেলতে লাগলেন; সহরের রুদর, ভদর, সেখ, খাঁ, দাঁ প্রভৃতি ধড়িবাজ পাইকেররা মাল সেজে কাঁছনি গাইতে লাগলো—বানর ও ছাগলও জুটে গ্যালো।

লক্ষ্যের বাদসা জমি নিলেন, দুই এক বড়মানুষ ক্যাপলা জাল ফেললেন—
অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু শেষে জালখানা পর্য্যন্ত উঠলো না—কেউ বলে,
“কৈদো মাছ!” কেউ বলে, “রাণা”! নয় “খোঁটা”!

শিবকেষ্টো বন্দ্যোপাধ্যায়

ছজুক সঙ্গে শিবকেষ্টো বাঁড়ুয়ে দ্যাখা দিলেন। বাবু দিন কত বড় বাড় বেড়ে-
ছিলেন;—আজ একে চাবুক মারেন, আজ ওকে পাঠান ঠেকিয়ে জুতো মারেন,
আজ মেড়ুয়াবাদী খোঁটা ঠকান, কাল টুপিওয়ালা সায়েব ঠকান—শেষে আপনি
ঠকলেন। জালে জড়িয়ে পড়ে বাঙ্গালির কুলে কালি দিয়ে চৌদ্দ বৎসরের জন্তু
জিজির গ্যালেন। কোন কোন সায়েবে পয়সার জন্তু না করেন ছান কন্মই নাই,
সিটি শিবকেষ্টো বাবুর কল্যাণে বেরিয়ে পড়লো—এক জন “এম্, ডি, এফ, আর,
সি, এস” প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষরের খেতাবওয়ালা ডাক্তার ঐ দলে ছিলেন।

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো

আমাদের সহরে বড়মানুষদের মধ্যে অনেকের অবশুণ নাই, ববশুণ আছে।
“ভাল কস্তে পারব না মন্দ করব, কি দিবি তা দে।” যে ভাষা-কথা আছে, এঁরা
তারই সার্থকতা করেচেন—বাবুরা পরের বকুড়া টাকা দিয়ে কিনে “গাঁয়ে মানে না
আপনি মোড়ল” হতে চান—অনেকে আড়ি তুলতেও এই পেশা আশ্রয় করেচেন।
যদি এমন পেশাদার না থাকতো, তা হলে শিবকেষ্টোর কে কি কস্তে পাস্তো?
তিনি কেবল ভাজকে ও ভাইপোকে ঠকিয়ে বিষয়টি আপনি নিতে চেষ্টা করেছিলেন
বৈ তো নয়। আমাদের কলকিতা সহরের অনেক বড়মানুষ যে ভাইয়ের স্বীকে
ডাক্তার দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেও গায়ে ফুঁ দিয়ে গাড়ি বোড়া চড়ে ব্যাড়াছেন,
কৈ আইন তাঁর কাছে কষ্টে পায় না কেন? শিবকেষ্টো যেমন জাল করেছিলেন,
বোধ হয় সহরের অনেক বড়মানুষের ঘরে ও রকম কত পার পেয়ে গ্যাচে ও নিতি
কত হচে—সহরের একটি কান্দীরী মুখু বড়মানুষ আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে,
“সহরে আমার মত অনেক ব্যাটাই আছে, কেবল আমিই ধরা পড়েছি।” শিবকেষ্টোর
বিষয়েও ঠিক তাই।

জটিস্ ওয়েল্‌স্

শিবকেটোর মকদ্দমার মুখে জটিস্ ওয়েল্‌স্ নতুন ইণ্ডেন্ট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ, সুতরাং মকদ্দমা করবার সময় যখন চার পা তুলে বক্তৃতা কল্‌লেন, তখন প্রায়ই বল্‌লেন, “বাঙ্গালিরা মিথ্যাবাদী ও বকলের জাত।” এতে বাঙ্গালিরা অবশ্যই বল্‌তে পারেন, “শতকরা দশ জন মিথ্যাবাদী বা বকলে হলে যে আশী নব্বুই জনও মিথ্যাবাদী হবেন এমন কোন কথা নাই”—চার দিকে অসন্তোষের গুজুগাজু পড়ে গ্যালো, বড় দলের মোড়লরা হাতে কাগজ পেলেন, “তেঁই ঘোঁটের” মত মাতালো মাতালো জায়গায় ঘোঁট পড়ে গ্যালো, শেষে অনেক কষ্টে একটি সভা করে সার চার্লস কাঠ মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হলো। কিন্তু সভা কোথায় হয়! বাঙ্গালিদের তো এক পদও “সাধারণের” স্থল নাই! টাউন হাল্‌ সায়েবদের, নিমতলার ছাদ-খোলা হল গবর্নমেন্টের, কাশী মিত্রের ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদনিতে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচ জন সায়েব স্নবোর সঙ্গে আলাপ আছে, সুতরাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা রাধাকান্তের নবরত্নের নাটমন্দিরই প্রশস্ত সিদ্ধান্ত হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরলো—অমুক দিন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নবরত্নের নাটমন্দিরে ওয়েল্‌স্‌ জজের মুখরোগের চিকিৎসা করবার জন্তে সভা করা হবে! ঐষধ সাগরে রয়েছে!

সহরের অনেক বড়মানুষ—তাঁরা যে বাঙ্গালির ছেলে, ইটি স্বীকার কল্‌লেন লজ্জিত হন; বাবু চুণোগলির আনন্ড পিফ্রসের পোস্তুর বলে তাঁরা বড় খুসি হন; সুতরাং যাতে বাঙ্গালির শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বিপরীত, নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দিরে ওয়েল্‌স্‌র বিপক্ষে বাঙ্গালিরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই হুঃখিত হলেন—খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গ্যালো, যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কল্‌লেন লাগলেন। রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিস পড়লো; রাজা বাহাদুর সত্যব্রত, একবার কথা দিয়েচেন, সুতরাং উচ্চ-দলের সুপারিস হলেও সহসা রাজী হলেন না। সুপারিসওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চল্লো। নিরুপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড়লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামনের জোড়হস্ত করা পাথরের গরুড়েরও আছাদের সীমা রইলো না। বাঙ্গালিদের যে

কথকিং সাহস জন্মেচে, এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গ্যালো। হুপারিস-ওয়াল্লা বাবুরা ও সহরের সোনারবেণে বড়মানুষরা কেবল এই সভায় আসেন নাই—হুপারিসওয়াল্লাদের খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গ্যালো। বেণেবাবুরা কোন কাজেই মেশেন না, স্ততরাং তাঁদের কথাই নাই! ওয়েল্‌স্-ছজুকের অনেক অংশে শেষ হলো, দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাঠ সাহেবের কাছে প্রদান করলেন, সেই অবধি ওয়েল্‌স্‌ও ব্রেক হলেন।

টেক্‌চাঁদের পিসী

টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসী ওয়েল্‌সের মুখরোগের তরে মিটিং করা হয়েছে শুনে বলেন, “ও মা, আজকাল সবই ইংরিজি কেতা! আমরা হলে মুলোমুড়ি, নারকেলমুড়ি ও ঠনঠনের নিম্নকাত্রে দোরস্ত কস্তম্!” নারকেলমুড়ি বড় উত্তম ওষুধ, হলোয়ের বাবা! আমাদের সহরের অনেক বড়মানুষ ও দুই এক জেলার খিরাজ মহারাজা বাহাদুর নিয়তই রোগ ভোগ করে থাকেন; দারজিলিং, সিম্‌লে, সপাটু, ভাগলপুর ও রাণীগঞ্জে গিয়েও শোদরাতে পারেন না; আমরা তাঁদের অহুরোধ করি, নারকেলমুড়ি ও ঠনঠনের নিম্নকীটাও ট্রাই করুন! ইমিজিয়েট রিলিফ!!!

পার্সি লং ও নীলদর্পণ

নীলকরী ছাফাম উঠলো, শোনা গ্যালো কৃষ্ণনগর, পাবনা, রাজসাই প্রভৃতি নীলজেলার রেয়োডরা ফেপেচে। কে তাদের খাপালে? কি উলুইচণ্ডী? না! শ্রামচাঁদ? তবে—“ম্যাজিষ্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে” “ইণ্ডিগো কমিশনে” “হরিশে” “লঙে” “ছোট আদালতে” “কন্ট্রাক্টবিলে” অবশেষে গ্রাণ্টের রিজাইনমেন্টে রোগ সাবতে পারে? না! কেবল শ্রামচাঁদীরা সল্লে!!!

নীলকর সায়েবরা দ্বিতীয় রিভোলিউশন হবে বিবেচনা করে (ঠাকুরঘরে কে? না আমি কলা খাই নি) গবর্নেন্টে ভোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। অজিমেন্টকে রেজিমেন্ট গোরা, গন, বোট ও এক্সপেন্ডিচার কমিশনের চক্কো—

মকমলে খেলে আর নিরপরাধীর জায়গা ধরে না, কাগজে ছলখুল পড়ে গ্যালো ও আন্টর ব্রেড অবভার হয়ে পড়লেন।

এজার ছরবন্দা শুন্তে ইণ্ডিগো কমিশন বসলো, ভারতবর্ষীয় খুড়ীর চম্কা ভেঙ্গে গ্যালো। (খুড়ী একটু আফিম খান) বাজালির হয়ে ভারতবর্ষীয় খুড়ীর এক জন খুড়ো কমিশনর হলেন। কমিশনে কৈচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো; সেই সাপের বিবে নীলদর্পণ জন্মালো; তার দরুন নীলকর-দল হয়ে হয়ে উঠলেন,—ছাইগাদা, কচুবন, ফ্যানগোঁজলা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরঘরে, গীর্জায়, প্যালেসে ও গ্রেসে ভাগ করলেন। শেষে ঐ দলের একটা বড় হজেরিয়ান হাউণ্ড পাদ্রি লং সায়েবকে কামড়ে দিলে।

প্যায়দারা পর্য্যন্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হয়ে মকমলে চললেন, তুমুল কাণ্ড বেধে উঠলো! বাদাবুনে বাগ (প্ল্যান্টাবস্ এসোসিয়েশন) বেগতিক দেখে নাম বদলে (ল্যাণ্ডহোলডার্স এসোসিয়েশন) তুলসীবনে ঢুকলেন, হরিশ মলেন, লডের মেয়াদ হলো, ওয়েলস্ ধমক খেলেন, গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন, তবু হজুক মিটলো না। প্রকৃত বাঁহুরে ছাঙ্গামে বাজারে নানা রকম গান উঠলো; চাসার ছেলেরা লাজল ধরে মুলো ও মূড়ি খেতে খেতে ক্ষেতে ক্ষেতে

গান

সুর “হাঃ শালার গরু,” তাল “টিটকিরি ও ল্যাজমলা।”

উঠলো সে সুর, ঘটলো অসুখ মনে, এত দিনে।

মহারাগীর পুণ্যে মোরা, ছিলাম সুরে এই স্থানে ॥

উঠলো খামার ভিটে খান, গ্যাল মানী লোকের মান,

ছান সোনার বাংলা খান, পোড়ালে নীল হজুমান ॥

গাইতে লাগলো। নীলকরেরা এর উত্তর ক্যাটল ট্রেস্পাস্ বিল পাস করে, কেউ কোন কোন ছোট আদালতের উকীল জজদের স্তামগীন থাকিয়ে ও ঘরবাঁসা করে, কেউ বা খাজনা বাড়িয়ে, খেঁউড়ে জিতে কথকিং গায়ের আলা নিবারণ করলেন।

নীলবাহুরে লকাকাণ্ডের পালা শেষ হয়ে গ্যালো, মোড়লেরা জিরেন পেলেন, ভারতবর্ষীয় খুড়ী এক মোতাত চড়িয়ে আরাম কস্তে লাগলেন। কোন কোন আশাসোঁটাওয়ালা খেতাবী খুড়ো, অনরেরী চৌকিদারী, তথা ছেলে পুলের আসেসরী ও ডেপুটি মেজেষ্টরীর জন্ত সাদা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্তায় নিযুক্ত হলেন।
তথাহ ॥

শ্রামচাঁদের অসহ টব্বারে ভূত পালায়, প্রজারা ফেলে উঠবে কোন্ কক্ষ। মিউটিনি ও ব্র্যাক অ্যাক্টের সত্যতে তো “ঐক্যিকারীরা” চটেই ছিলেন, নীলবাগুরে ছাফ্রামে সেইটি বন্ধমূল হয়ে পড়লো। বড় ঘরে সতীন হলে, বড় বো ও ছোট বোকে তুষ্ট কস্তে কর্তা ও গিল্লির ব্যামন হাড় ভাঙা ভাঙা হয়ে যায়, “ঐক্যিকারী” সুইপিং ক্লাস ও নেটিভ কমিউনটিকে তুষ্ট কস্তে গিয়ে ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গবর্নেন্টও সেই রকম অবস্থায় পড়লেন।

রমাপ্রসাদ রায়

হত্যার পাঠকগণ! আমরা আপনাদের পূর্বেই বলে এসেছি যে “সময় কারও হাত ধরা নয়; সময় জলের ছায়, বেজার ঘোবনের ছায়, জীবের পরমায়ুর ছায়; কারুই অপেক্ষা করে না।” দেখতে দেখতে আমরা বড় হচ্ছি, দেখতে দেখতে বছর ফিরে যাচ্ছে; কিন্তু আমাদের প্রায় মনে পড়ে না যে “কোন দিন যে মস্তে হবে তার স্থিরতা নাই।” বরং যত বয়স হচ্ছে, ততই জীবিতাশা বলবতী হচ্ছে, শরীর তোয়াজে রাখছি, আরসি ধরে শোণ হুটির মত পাকা গোঁপে কলপ দিচ্ছি, সিমুলের কালাপেড়ের বেহুদ বাহারে বকিত হতে প্রাণ কেঁদে উঠে। শরীর ত্রিভঙ্গ হয়ে গিয়েছে, চস্মা ভিন্ন দেখতে পাই নে, কিন্তু আশা ও তৃষ্ণা তেমনি রয়েছে, বরং ক্রমে বাড়তে বই কমতে না। এমন কি অমর বর পেয়ে—প্রকৃতির সঙ্গে চিরজীবী হলেও মনের সাধ মেটে কি না সন্দেহ! প্রচণ্ড রোজরাস্তা পথিক অভীষ্ট প্রদেশে শীঘ্র পৌঁছবার জন্ত একমনে হন্ হন্ করে চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ যদি একটা গেরিভাঙা কেউটে রাস্তায় গুয়ে আছে দেখতে পান, তা হলে তিনি ব্যামন চমকে ওঠেন, এই সংসারে আমরাও কখন কখন মহাবিপদে ঐ রকম অবস্থায় পড়ে থাকি; তখন এই দৃষ্ট হৃদয়ের চৈতন্য হয়! উল্লিখিত পথিকের হাতে সে সময় একগাছা মোটা লাঠি থাকলে তিনি যেমন সাপটাকে ঘেরে পুনরায় চলতে আরম্ভ করেন, আমরাও মহাবিপদে প্রিয় বন্ধুদের পরামর্শ ও সাহায্য ভরে যেতে পারি; কিন্তু যে হতভাগ্যের এ জগতে বন্ধু বলে আহ্বান করবার এক জনও নাই, বিপৎপাতে তার কি দুর্দশাই না হয়! তখন তার এ জগতে ঐক্যই একমাত্র অনন্তগতি হয়ে পড়েন। ধর্মের এমনি বিতর্ক জ্যোতি—এমনি পঙ্কীয় ভাব, যে তার প্রভাভাব, ভরে ভগ্নমো, নাস্তিকতা ও বৈজ্ঞানিক

সরে পালায়—চারি দিকে স্বর্গীয় বিস্তৃত প্রেমের প্রোভ বইতে থাকে—তখন বিপদসাগর জননীর স্নেহময় কোল হতেও কোমল বোধ হয়। হায়! সেই ধৃত, যে নিজ বিপদ সময়ে এই বিমল আশ্রয় উপভোগ করবার অবসর পেয়ে আপনা আপনি ধৃত ও চরিতার্থ হয়েছে। কারণ প্রবল আঘাতে একবার পাবাণের মর্ষ ভেদ কতে পাল্লো চিরকালেও মিলিয়ে যায় না।

ক্রমে আমরাও বড় হয়ে উঠলেম—হলনা কুআসায় আবৃত, আশার পরিসর শূন্য, সংসারসাগরের ভয়ানক শব্দ শোনা যেতে লাগলো। এক দিন আমরা কতকগুলি সমবয়সী একত্র হয়ে একটা সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক করি, এমন সময় আমাদের দলের এক জন বলে উঠলেন, “আরে আর শুনেচ? রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডীকরণের বড় ধুম! এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ; সহরের সমস্ত দলে, উদিকে কাশী কর্ণাট পর্য্যন্ত পত্র দেওয়া হবে।” ক্রমে আমরা অনেকের মুখেই আঁধের নানা রকম হজ্বক শুন্তে লাগলেম। রমাপ্রসাদ বাবুর বাপ ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টি, মার সপিণ্ডীকরণে পৌত্তলিকতার দাস হয়ে আঁধ করবেন শুনে কার না কৌতূহল বাড়ে। সুতরাং আমরা আঁধের আত্মপুর্ব্বিক নকশা নিতে লাগলেম।

ক্রমে সপিণ্ডনের দিন সংক্ষেপ হয়ে আসতে লাগলো। ক্রিয়ে-বাড়িতে আঁধরা বসে গ্যালা—ফলারে বায়ুনরা অ্যাপ্রিন্টিস নিতে লাগলেন—সংস্কৃত কালেক্সের ফলারের প্রোফেসর রকমারি ফলারের লেকচার দিতে আরম্ভ করলেন—বৈদিক ছাত্রেরা ভলমুনস্ নোট লিখে ফেলেন। এদিকে চতুষ্পাঠীওয়ালা ভট্টাচার্য্যরা চলিত ও অর্ধ পত্র পেতে লাগলেন; অনাহৃত চতুষ্পাঠীহীন ভট্টাচার্য্যরা সুপারিস্ ও নগদ অর্ধ বিদায়ের জন্য রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ি নিমন্তলা ও কাশী মিস্তিরের ঘাট হতেও বাড়িয়ে তুলেন—সেথায় বা কটা শকুনি আছে। এঁদের মধ্যে অনেকের চতুষ্পাঠীতে সংবৎসর বাঁড়ে হাগে, সরস্বতী পূজার সময় ব্রাহ্মণী ও কোলের মেয়েটি বঙ্গদেশীয় ছাত্র সাজেন, শোলার পদ্ম ও রাতার সাজওয়ালা ক্ষুদে ক্ষুদে মেটে সরস্বতীর অধিষ্ঠান হয়; জানিত ভদ্র লোকদের নেলিয়ে দিয়ে কিছু পেটে।

ভট্টাচার্য্য মশাইদের ছেলেব্যালা যে কদিন আসল সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তার পর এক্ষণে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, কেবল সংবৎসর অন্তর এক দিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের জন্য।

পাঠকগণ! এই যে উর্দ্দি ও তুম্বাওয়ালা বিভাগদার, ছায়ালাদার, বিভাজ্জমণ ও বিশ্বনাথচন্দ্রাদিদের দেখছেন, এঁরা বড় ক্যালা যান না, এঁরা পয়সা পেলে না করেন

জান ক'ই নাই। সংকৃত ভাষা এই মহাপুরুষদের হাতে পড়েই জেবে জেবে মিলিয়ে যাচ্ছেন। পরসাদ দিলে বানরওয়ালা নিজ বানরকে নাচায়, পোষাক পরায়, ছাগলের উপর ঠাঁড় করায়; কিন্তু এঁরা পরসাদ পেলে নিজে বানর পর্যন্ত সেজে নাচেন! যত ভয়ানক দুষ্কর্মে এই দলের ভেতর থেকে বেরোবে, দায়মালী জেল তন্ন তন্ন কল্লেও তত পাবেন না।

আগামী কল্যাণ সপ্তম। আজকাল সহরের দলপতিদলে অনেকেই কলপানা চকরের দলে পড়েছেন, নামটা ঢাকের মত কিন্তু ভেতরটা ঝাঁক!—“রমাপ্রসাদ বাবু সদরের প্রধান উকীল, সাহেব সুবোধের বাবুর প্রতি যেকল্প অনুগ্রহ, তাতে আরও কত কি হয়ে পড়বেন, সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবু দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পত্র দিলে ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভাল হয় না, কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবুও * * * *” প্রভৃতি নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চলতে লাগলো। ছই এক টাটকা দলপতিরা (জোর কলুমে, মান অপমানের ভয় নাই) রমাপ্রসাদ বাবুর তোয়াকা না রেখে আপন আপন দলে প্রোক্রেশমেন দিলেন, প্রোক্রেশমেন দলস্থ ভট্টাচার্য্যদলে বিতরণ হতে লাগলো, অনেকে ছ নৌকোয় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়লেন—শানুকের ইয়ারেরা “বারে বারে মুর্গী তুমি” দলে ছিলেন, চিরকার মুখ পুঁচে চলেচে, এইবার মহাবিপদে পড়তে হলো, সুতরাং মিস্ত্রির খুড়ো লিভ্ নিয়ে হাওয়া খেতে যান। চাটুয্যে শয়্যাগত হয়ে পড়েন। দলপতির প্রোক্রেশমেন জুরির সমন ও সন্ধানে হতেও ভয়ানক হয়ে পড়লো, সে এই—

“ঐঐহরিং

শরণং।

অশেষ শাস্ত্ররত্নাকর পারবর পরম পুজনীয়

শ্রীল

ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ—

ধর্ম—

সেবক শ্রীঃ চন্দ্র দাস ঘোষ

সাতোড়ে শত সহস্র প্রণিপাত পুরসর নিবেদনঃ কার্য্যানুকাগে শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের আশীর্ব্বাদে এ সেবকের প্রাণগতিক কুশল পরে যে হেতুক ৬রামমোহন রায়ের পুত্র বাবু রমাপ্রসাদ রায় স্বীয় মাতা ঠাকুরাণীর একোদ্বিষ্ট আক্ষেপে মহালিমারোহ করিতেছেন এই দলের বিখ্যাত কলীন ও আমার তদ্বীপুপতি বা

বিনিকৃষ্ট মিত্রজা মজকুর সম্যক প্রতীয়মান হইয়া জানিয়াছেন যে উক্ত রায় বাবু সহরের সমস্ত দলেই পত্র দিবেন সুতরাং এ দলেও পত্র পাঠাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা কিন্তু আমাদের শ্রীশ্রী সভার দলের অভ্যুগত দলের সহিত রায় মজকুরের আহ্বার ব্যত্যার চলিত নাই সুতরাং তিনি পত্র পাঠাইলেও আপনারা তথায় সভা হইবেন না।

শ্রীঃ চন্দ্র দাস ঘোষ।

সম্মতঃ

সাং—হুড়ীঘাটা।

শ্রীহরীশ্বর শর্মা: জায়লকারোপাধীক:

বাব্য: সভাপণ্ডিতঃ”

প্রোক্রেশমেন্ পেয়ে ভট্টচাখি ও ফলারেরা ডুব্ মাল্লেন ; কেউ কেউ ক্ষুদ্র নদীর মত অন্তঃশীলে বইতে লাগলেন, ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাখি নাই যে টের পান ; তবুও অনেক জায়গায় চৌকি, থানা ও পাহারা বসে গ্যালো, কিছুতেই কিছু কস্তে পাল্লেন না, টাকার খোঁস্বো প্যাজ রুসুনের গন্ধ ঢেকে তুলে—শ্রাদ্ধসভা পবিত্র হয়ে উঠলো, বাগবাজারের মদনমোহন ও শ্রীপাট খড়দর শ্রামশুন্দর পর্য্যন্ত ব্রজের রজ্জে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রাদ্ধের দিন সকালব্যালা রমাশ্রাসাদ বাবুর বাড়ি লোকারণ্য হয়ে গ্যালো, গাড়িবারাণ্ডা থেকে বাবুর্চাখানা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঠেল ধরুলো, এমন কি শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রায় জগন্নাথের চাঁদমুখ দেখতেও এত লোকারণ্য হয় না।

সপিণ্ডনের দিন সকালে রমাশ্রাসাদ বাবু বারাগসী গরদের জোড় পরে ভক্তি ও শ্রাদ্ধের আধার হয়ে পড়লেন। ব্যালার সঙ্গে সভার জনতা বাড়তে লাগলো, এক দিকে রাজভাটেরা সুর করে বজ্রালের গুণগরিমা ও আদিশুরের গুণ কীর্তন কস্তে লাগলো, এক দিকে ভট্টাচার্য্যদের তর্ক লেগে গ্যালো, হু দশ জন ভেতরমুখো কুলীন দলপতিরা ভয় ও লজ্জায় সোয়ার হয়ে সভাস্থ হতে লাগলেন, দল দল কেন্দ্রন আরম্ভ হলো, খেলের চাটিতে ও হরিবালের শব্দে ভাইনিং ক্রমের কাচের গ্র্যাস ও ডিশেরা খেন ভয়ে কাঁপতে লাগলো—বৈমাত্র ভাই ধুম করে মার শ্রাদ্ধ কচেন দেখে জ্ঞাতিস্থ নিবন্ধন হিংসাভেই ব্রাহ্মধর্ম কাদতে লাগলেন, দেখে অ্যাম্বিশন হাসতে লাগলেন।

ক্রমে মালচন্দন ও দানসামগ্রী উচ্ছুগ্গ হলো সভা ভঙ্গ হলো। কেন্দ্রন বিদায় হলেন, ব্রাহ্মণভোজন আরম্ভ হলো। কল্কেতার ব্রাহ্মণভোজন দেখতে বেশ,—হজুররা আতুড়ের সূদে ঘেরোটিকেও বাড়িতে রেখে ফলার কস্তে আসেন না—যার যে কটি ছেলেগুলো আছে, ফলারের দিন সেগুলি সব বেরোবে—এক এক

জন কলারঘুখো বায়ুনকে ক্রিয়েবাড়িতে ঢুকতে দেখলে হঠাৎ বোম্ব হয় ঘ্যান গুল্মশাই পাঠশাল তুলে চলেচেন! কিন্তু বেরোবার সময় বোম্ব হয় এক একটা সজ্জার ধোপা—লুচিমোণ্ডার মোটটি একটা গাধায় বইতে পারে না! ক্রাকশরা সিকি, ছয়ানি ও আহুলি দক্ষিণে পেয়ে বিদেয় হলেন; দুই মাখান এঁটো কলাপাত, ভাজা খুরি ও আঁবের আঁটির নীলগিরি হয়ে গ্যালো! মাছিরা ভ্যান ভ্যান করে উড়তে লাগলো—কাক ও কুকুররা টাঁকতে লাগলো,—সামিয়ানায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গ্যাচে! সুতরাং জল সপসপানি ও লুচি মণ্ডা দই ও আঁবের চপটে এক রকম ভ্যাপসো গন্ধে বাড়ি মাতিয়ে তুলে—সে গন্ধ ক্রিয়েবাড়ির ফেরত লোক ভিন্ন অণ্ডে হঠাৎ আঁচতে পার্বেন না।

এদিকে বৈকালে রাস্তায় “কাজলী” জমতে লাগলো, যত সজ্জা হতে লাগলো ততই অন্ধকারের সঙ্গে কাজলী বাড়তে লাগলো—ভারী, দোকানদার, উড়ে বেহারা, রেও ও গুলিখোরেরা কাজলীর দলে মিশতে লাগলেন; জনতার ও! ও! রো! রো! শব্দে পাড়া প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো; রাস্তার সাতটার সময় কাজলীদের বিদেয় করবার জন্ত প্রতিবাসী ও বড় বড় উঠানওয়ালা লোকদের বাড়ি পোরা হলো; আঁন্ধের অধ্যাক্ষরা থলো থলো সিকি, আহুলি, ছয়ানি ও পয়লা নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন; চলতি মশাল, লঠন ও “আও!” “আও!” রাস্তায় রাস্তায় কাজলী ডেকে ব্যাড়াতে লাগলো; রাস্তার তিনটে পর্যন্ত কাজলী বিদেয় হলো। প্রায় ত্রিশ হাজার কাজলী জমেছিল, এর ভিতর অনেকগুলি গর্ববতী কাজলিনীও ছিল, তারা বিদেয়ের সময় প্রসব হয়ে পড়াতে নখরে বিস্তার বাড়ে!

বাজলী বিদেয়ের দিন দলস্থ নবশাখ, কায়স্থ ও বৈজ্ঞানের জলপান। ফলারে কেউই ফ্যালা যায় না; বায়ুন ও রেওদের মধ্যে ব্যামন তুখোড় কলারে আছে, কায়ত নবশাখ ও বন্দিদের মধ্যেও ততোধিক। বরং কতক বিষয়ে এঁদের কাছে সার্টিফিকেটওয়ালা ফলারেরা কছে পায় না!

সহরের কারু বাড়ি কোন ক্রিয়েকর্ষ উপস্থিত হলে বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা চাপকান, পায়জামা, টুপি ও পোটি পরে, হাতে লাল রুমাল ঝুলিয়ে—ঠিক যাত্রার নকীব সঙ্গে দলস্থ ও আত্মীয় কুটুম্বদের নেমস্তম্ভে কতে বেরোন। এর মধ্যে বড়মাস্তব বা শাসে জলে হলে সঙ্গে পেশাদার নেমস্তম্ভে বায়ুন থাকে। অনেকের বাড়ির সরকার বা দাদাঠাকুরগোছের পুজুরী বায়ুনেও চলে। নেমস্তম্ভে বায়ুন বা সরকার রামগোছের এক কর্ক হাতে করে কাণে উডেন্ প্যান্ডিল ওঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমস্তম্ভে লেবে যান—ছেলোটি কেবল টু কাপির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।

আজকাল ইংরেজি কেতার প্রাচুর্য্যবে অনেক সাপটা ফলার বা জোজে যেতে লাইক করেন না। কেউ ছেলেপুলে পাঠিয়ে সারেন, কেউ স্বয়ং বাগানে বাবার সময় ক্রিয়েবাড়ি হয়ে বেড়িয়ে যান—কিছু আহার কসে অল্পরোধ করে তরানক রোপের ভাগ করে কাটিয়ে ছান, অথচ বাড়িতে এক জোড়া কুন্তকর্ণের আহার তল পেয়ে যায়—হাভিশালের হাতী ও ঘোড়াশালের ঘোড়া খেয়েও পেট ভরে না!

পাঠক! আমরা প্রকৃত ফলারদাস। লোহার সঙ্গে চুষুক পাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত সূচিরও সেইরূপ—তোমার বাড়িতে ফলারটা আসটা জমলে অল্পগ্রহ করে আমাদের ভুলো না—আমরা মুনকে রঘুর ভাই! ফলারের নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্য্যন্ত যাই। সে বার মৌলুবী হালুম হোসেন খাঁ বাহাদুরের ছেলের স্মৃতিতে ফলার করে এসেচি। হিন্দুধর্ম্মছাড়া কাণ্ড বিধবা বিয়েতেও পাত পাতা গিয়েচে। আর কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি উপলক্ষে ১১ই মাঘ পোপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দি ফাষ্টের বাড়িতে যে বছর বছর একটা অল্পক্ষেত্র হয়, তাতেও প্রসাদ পেয়েচি! ভাল কথা! ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুরবাবুর মাঠের মত চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম ধরে না, কিন্তু প্রতি বুধবারে উপাসনার সময় সমাজে কেবল জন দশ বারোকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও সুর করে সংস্কৃত তালিয়া পড়তে দেখতে পাই, বাকিরা কোথায়? তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম! না আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল?

এ সওয়ায় আমাদের ফলারের বিস্তর ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট আছে; যদি ইউনিভার্সিটিতে বি, এ, ও বি, এলের মত ফলারের ডিগ্রী স্থির হয়, তা হলে আমরা তার প্রথম ক্যান্ডিডেট!

রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডনের জলপানে আড়ম্বর বিলক্ষণ হয়েছিল—উপচারও উত্তম রকম আহরণ হয়। সহরের জলপান দেখতে বড় মন্দ নয়, এক তো মধ্যাহ্নভোজন বা জলপান রান্ধির দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঠেল মারে, তাতে নানা রকম জানওয়ারের একত্র সমাগম। ধাঁরা আহার কসে বসেন, সেগুলির পা প্রথম ঘোড়ার মত নালবাঁধান বোধ হবে, ক্রমে সমীচীনরূপে দেখলে বুঝতে পার্বেন যে কৰ্ম্মকর্ত্তা ও ফলারের সঙ্গীদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে জুতো জোড়াটি খুলে বসতে ভয়সা হয় না!

শেষে কায়স্থের ভোজ মহাভুজের সম্পন্ন হলো। কুলীনরা পর্য্যায় মত কুই মাছের মুড়ো ও মুণ্ডী পেলেন—এক একটা আদবুড়ো আফিমখোর কুলীনের মাছের মুড়ো ডিবোনো দেখে কুদে কুদে ছেলেরা ভয় পেতে লাগলো। এক এক জনের

পাত গো-ভাগাড়কে হারিয়ে দিলে ! এই প্রকারে প্রায় পোনের দিন সমারোহের পর রমাপ্রসাদের মার সপিণ্ডের ধুম চুকলো—হজুকদারেরা জিরুতে লাগলেন ।

যে সকল মহাপুরুষ দলপতিরা সভাস্থ হন নাই, তাঁরা আপনার আপনার দলে ঘোঁট পাড়িয়ে দিলেন—অনেক ভট্‌চাষি বিদেয় নিয়ে ফলার মেরে এসেও শেষে শ্রীশ্রী ৬ ধর্মসভার উমেদারের প্রপৌত্তরদের দলের দলপতির কাছে গঙ্গাজল ছুঁয়ে শালগেরামের সামনে দিবি কস্তে লাগলেন যে তিনি অ্যাদ্দিন সহরে আছেন কিন্তু রমাপ্রসাদ রায় যে কে, তাও তিনি জানেন না, তিনি শুদ্ধ বাবুই জানেন ! আর তাঁর ঠাকুর (স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি খুড়ো) মরবার সময় বলে গিয়েচেন যে “ধর্ম অবতার ! আপনার মত লোক আর এ জগতে নাই !” এ সওয়ায় অনেক শুল্ক উপাধিধারী হজুরেরা ধরা পড়লেন, গোবর খেলেন, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কল্লেন ও ভুরু কামালেন ।

কল্‌কেতায় প্রথম বিধবা বিবাহের দিন বালী উত্তোরপাড়া অস্থিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্‌চাষিরা সভাস্থ হন—ফলার ও বিদেয় মারেন, তার পর ক্রমে গাটাকা হতে আরম্ভ হন, অনেকে গোবর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সে দিন শয্যাগত ছিলাম !

যত দিন এই মহাপুরুষদের প্রাধ্বর্ভাব থাকবে, তত দিন বাঙ্গালির ভদ্রস্বতা নাই ; গোসাইরা হাড়ী, মুচি ও মুদফরাস নিয়ে বেঁচে আছেন, এই মহাপুরুষরা গোটা কত হতভাগা গৌমূর্খ কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতির জোরে আজও টিকে আছেন ; এঁরা এক এক জন চারামজাদুকি ও বজ্জাতির প্রতিমূর্তি, এদিকে এমনি সজ্জাগজ্জা করে ব্যাড়ান যে হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে,—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় অতি নিরীহ ভজ্রলোক ; বাস্তবিক, সে কেবল ভড়ং ও ভণামো ।

রসরাজ ও যেমন কর্ম তেমনি ফল

রমাপ্রসাদ রায়ের মার সপিণ্ডে সভাস্থ হওয়ায় কোন কোনখানে তুমুল কাণ্ড বেধে উঠলো—বাবা ছেলের সঙ্গে পৃথক হলেন । মামী ভাগ নেকে হাঁটলেন—ভাগনে মাকীর চির-অন্নপালিত হয়েও চিরজন্মের কৃতজ্ঞতায় ছাই দিয়ে বিলক্ষণ বিপক্ষ হয়ে পড়লেন ! আমরা যখন ইন্সুলে পড়তুম, তখন সহরের এক বড়মানুষ সোনারবেশেদের বাড়ির শক্তবাবু বলে একজন আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন । এক দিন তিনি কথায়

কথার বয়েনে যে “কাল ডায়ে আমি তাই আদাড় জীকে বর ঠাট্টা কড়েচি, সে আমায় বয়ে ছুমি হুঙ্কান, আমি অমনি কসু কড়ে বল্লম তোড় খণ্ড হুঙ্কান।” ভাগ্নে বাবুও সেই রকম ঠাট্টা আরম্ভ করলেন। “রসরাজ” কাগজ পুনরায় বেরলো; খেঁউড় ও পচালের শ্রোত বইতে লাগলো। এরি দেখাদেখি এক জন সংকুত কালেকের কৃতবিদ্য ছোকরা ব্রাহ্মধর্ম ও কালেক এডুকেশন মাধ্যম তুলে “য্যামন কর্ম তেমনি ফল” নামে “রসরাজের” জুড়ি এক পচাল-পোরা কাগজ বার করলেন—রসরাজও তেমনি, ফলে নড়াই বেধে গ্যালো। দুই দলে কৃতান্ত ও সেনা সংগ্রহ করে সমরসাগরে অবতীর্ণ হলেন,—ইকুল বয়েরা ভূরি ভূরি নিকরুজি দলবল সংগ্রহ করে কুরপাণ্ডবযুদ্ধ ঘটনার শ্রায় ভিন্ন ভিন্ন দলে মিলিত হলেন—দুর্করুজিপরায়ে ক্যারানী, কুটেল ও বাজে লোকেরা সেই কদর্য রস পান করবার জন্য কাক, কবন্ধ ও শৃগাল শকুনির মত রণস্থল জুড়ে রইলো। রসরাজ ও তেমনি ফলের ভয়ানক সংগ্রাম চলতে লাগলো—“পীর গোরাচাঁদের ম্যালা” “পরীর জন্মবিবরণ” “বোড়া-ভূত” ও “ব্রহ্মদৈত্যের কথোপকথন” প্রভৃতি প্রস্তাবপরিপূর্ণ রসরাজ প্রতিদিন পাঁচ শ। হাজার! দু হাজার! কাপি নগদ বিক্রি হতে লাগলো! কিন্তু “ব্রাহ্ম-ধর্ম” মাসে একখানাও ধারে বিক্রি হয় কি না সন্দেহ, “তিলোত্তমা” ও “সীতার বনবাসের” খন্ডের নাই! কিছু দিন এই প্রকার লড়াই চল্চে, এমন সময় গবর্নেন্ট বাদী হয়ে কদর্য প্রস্তাব লিখন অপরাধে রসরাজসম্পাদকের নামে পুলিশে নালিশ করলেন; “যেমন কর্ম”ও পাছে তেমনি ফল পান এই ভয়ে গা ঢাকা দিলেন; “রসরাজের” দোয়ার ও খুলীয়ে, মূল গায়নকে মজলিসে রেখে “চাচা আপনা বাঁচা” কথাটি স্মরণ করে মেদোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলে। ভাগ্নে বাবু (ওরফে মিস্ত্রি খুড়ো) সফিনের ভয়ে অন্দর মহলের পাইখানা আশ্রয় করলেন—গিরিবর ক্ষেত্রমোহন বিজ্ঞানভূঁচামর ও নৃপূর নিয়ে তিন মাসের জন্য হরিষবাড়ি চুকলেন। “পীর গোরাচাঁদের” বাকি গীত সেইখানে গাওয়া হলো। পাভরভাজা হাতুড়ির শব্দ, বেতের পটাং পটাং ও বেড়ির বুম্‌বুমানি মন্দিরে ও মূদদের কাজ করলে—কয়েদীরা বাজে লোক সেজে “পীরের গীত” শুনে মোহিত হয়ে বাহবা ও প্যালা দিলে; “খেলেম দই রমাকান্ত বিকারের ব্যালা গোবর্ধন”—যে ভাবাকথা আছে, ভাগ্নে বাবু (ওরফে মিস্ত্রি খুড়ো) ও রসরাজসম্পাদকে সেইটির সার্থকতা হলো। আমরাও ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়লেম, চসমা ভিন্ন দেখতে পাই নে।

বুজুরুকি

পাঠক ! আমাদের হরিভদ্র খুড়ো কায়স্থ মুখখী কুলীন, দেড় শ হিল্লির গাঁজা প্রত্যহ জলযোগ হয়ে থাকে, থাকবার নির্দিষ্ট বাড়ি ঘর নাই, সহরে থানকী মহলে অনেকের সঙ্গে আলাপ থাকায় শোবার ও খাবার ভাবনা নাই, বরং আদর করে কেউ “বেয়াই” কেউ “জামাই” বলে ডাকতো। আমাদের খুড়ো ফলার মাঝেই পান্থলো স্থান ও লুচিটে সম্মেশটা বেঁধে আনতেও কষ্ট করেন না ; এমন কি তাগে পেলে চলনসই জুতোজোড়াটাও ছেড়ে আসেন না। বলতে কি আমাদের হরিভদ্র খুড়ো একরকম সবলোট্ গোছের ভদ্র লোক ! খুড়ো উপস্থিত হয়েই এ কথা সে কথার পর বলেন যে, আর শুনেছ আমাদের সিমুলে পাড়ায় এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী এসেচেন—তিনি সিদ্ধ,—তিনি সোনা তৈরি করতে পারেন—লোকের মনের কথা শুনে বলেন—পারাতন্ত্র খাইয়ে সে দিন গঙ্গাতীরে একটা পচা মড়াকে বাঁচিয়েচেন, ভারি বুজুরুক ! কিন্তু আমরা ক বার কটি সন্ন্যাসীর বুজুরুকি ধরেচি, গুটিকত ভূতচালার ভূত উড়িয়ে দিয়েছি, আর আমাদের হাতে একটি জোচ্চোরের জোচ্চুরি বেরিয়ে পড়ে।

যখন হিন্দুধর্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ, কিমিয়া ও ভূততত্ত্ব জানতো না, তখনই এই সকলের মাত্র ছিল। আজকাল ইংরাজি লেখাপড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েচে, কিন্তু কল্কেতা সহরে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই ; না আসেন, এমন দেবতাই নাই ; সুতরাং কখন কখন “সোনা করা” “ছেলে করা” “নিরাহার” “ভূত নাবানো” “চতুর্সিদ্ধ” প্রভৃতির পেটের দায়ে এসে পড়েন, অনেক জায়গায় বুজুরুকি দ্যাখান, শেষ কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়ে যান।

হোসেন খাঁ

বছর চার পাঁচ হলো, এই সহরে হোসেন খাঁ নামে এক মোহলমান বহু কালের পর ঐ সঙ্গে ভয়ানক আড়ম্বরে জাখা স্থান—তিনি হজরত জিনিয়াই সিদ্ধ ! (‘পাঠকরা’ আরব্য উপজাতের আলমিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা স্মরণ করুন)—“বা মনে করেন, সেই জিনিষই জিনি দ্বারা আনাতে পারেন, বাড়ির ভেতর থেকে

ঘড়ি, আংটি, টাকা উড়িয়ে ছান, নদীজলে ঢাবির খেলা কলে বিয়ে জিনিষ খার তুলে আনান” প্রভৃতি নানা প্রকার অসুত কর্ম কতে পারেন।

ক্রমে সহরে সকলেই হোসেন খাঁর কথার আশ্বাসন কতে লাগলেন— ইংরেজি কেতার বড় দলে হোসেন খাঁর খবর হলো। হোসেন খাঁ আজ সন্ধ্যা বাহাছরের বাগানে বায়ের ভেতর থেকে টাকা উড়িয়ে দিলেন, উইলসনের হোটেল থেকে খাবার উড়িয়ে আনলেন, বোতল বোতল শ্রামপিন্, দোমা দোমা সোলাবি খিলি ও দালিম, কিস্মিস্ প্রভৃতি হয়েকরকম খাবার জিনিষ উপস্থিত কলেন। কাল—রায় বাহাছরের বাড়িতে কমলালেবু, বেলকুলের মালা, বরক ও আচার আনলেন—যাঁরা পরমেশ্বর মান্তেন না, তাঁরাও হোসেন খাঁকে মান্তে লাগলেন। ভাষায় বলে “পাথরে গুজিলে পাঁচ পীর হয়ে পড়ে” ক্রমে হোসেন খাঁ বড় বড় কান্দ্রীরা উল্লুক ঠকাতে লাগলেন। অনেক জায়গায় খোরাকি বরাদ্দ হলো। বৃজরুকি জাখবার জন্ত দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসতে লাগলো—হোসেন খাঁর প্রিমিয়ম বেড়ে গ্যালো।

জুচুরি চিরকাল চলে না। “দশ দিন চোরের, এক দিন সেধের,” ক্রমে ছুই এক জায়গায় হোসেন খাঁ ধরা পড়তে লাগলেন—কোথাও ঠানাটা ঠানাটা, কোথাও কাণমলা, শেষ প্রহার পর্যাস্ত বাকি রইলো না। যাঁরা তাঁরে পূর্বে দেবতা-নির্বিশেষে আদর করেছিলেন, তাঁরাও হু এক ঘা দিতে বাকি রাখলেন না; কিছু দিনের মধ্যেই জিনি-সিদ্ধ হোসেন খাঁ পৌস্তলিকের আন্ধের দাগা বাঁড়ের অবস্থায় পড়লেন; যাঁরা আদর করে নিয়ে যান, তাঁরাই দাগী করে বার করে ছান, শেষে সরকারী অতিথশালা আশ্রয় কলেন—হোসেন খাঁ জেলে গ্যালেন! জিনি পাতাল আশ্রয় কলেন।

ভুত নাবানো

আর এক বার যে আমরা ভুত নাবানো দেখেছিলেম, সেও বড় চমৎকার। আমাদের পাড়ার এক স্তাকরাদের বাড়িতে এক জনের বড় ভয়ানক রোগ হয়; স্তাকরারা বিলক্ষণ সজ্জিগন্ন, স্তুরাং রোগের চিকিৎসা কতে ক্রটি কলে না, ইংরেজি ডাক্তর বন্ধি ও হাকিমের মেলা করে কলে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসা হলো, কিন্তু রোগের কেই কিছুই কতে পারে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি কতে দেখে

বাড়ির ঘরে মহলে—তুলসী দেওয়া—কালীঘাটে সন্তান—কালীঘাটের খব পাঠ—
 ভুক্তাক—সাকরিদ—নারায়ণ—বালগড়—বালসী—শোগুর—মুলপুর ও হালিমপুর
 প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গার চন্নামেস্তো ও মাছুলি ধারণ হলো—তারকেধরে
 হত্যে দিতে লোক গ্যালো—বাড়ির বড় গিল্লি কালীঘাটে বুক চিরে মাথায় ও হাতে
 খুনো পোড়াতে গেলেন—শেষে এক জন ভূতচালা আনা হয়।

ভূত চালার ভূতের ডাক্তারি পর্য্যন্ত করা আছে। আজকাল ছ এক বাঙ্গালি
 ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেশেন্টের বাড়ি ভূত সেজে জাখা ছান—চাদরের বদলে দড়ি ও
 পেরেক সহিত মশারি গায়ে কখন বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল মস্তকের বদলে চার
 পাঁচ জন রোজার ধরাধরি করে আনতে হয়। এঁরা কল্কেতা যেডিকেল
 কালেকের এজুকেটেড ভূত।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আসবার প্রোগ্রাম স্থির হলো—আজ
 সন্ধ্যার পরেই ভূত নাক্ষত্র, পাড়ার ছ চার বাড়িতে খবর দেওয়া হলো—ভূত মনের
 কথা ও কুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যালো, কুটিওয়ালারা ঘরে
 কিল্লেন—বারফট্কারা বেক্লেন, বিগ্রহরা উত্তরাটি কায়তদের মত (দর্শন মাত্র)
 শেতল খেলেন, গীর্জের ঘড়িতে টুং টাং ঢং করে নটা বেজে গ্যালো, গুম্ করে তোপ
 পড়লো। ছেলেরা “বোয়াম্ কালী কল্কেতাওয়ালী” বলে হাততালি দে উঠলো—
 ভূতনাবানো আসরে নাবলেন।

আমাদের প্রতিবাসী ভূত নাবানোর কথা প্রমাণ ও বাড়ির গিল্লিদের মুখে শুনে
 ভূতের আহাৰ জন্ম আয়োজন কস্তে ক্রটি করে নাই; বড়বাজারের সমস্ত উত্তমোত্তম
 মেঠাই, ক্ষীরের নানা রকম পেয় ও লেছুরা পদার্পণ করেন—বোধ হয়, আমাদের
 মত প্রকৃত ফলারের দশ জনে তাঁদের শেষ কস্তে পারে না, রোজা ও তাঁর ছই
 চেলায় কি কর্বেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটি পিঁড়ের বসে ঘরের ভিতরে সকলের
 পরিচয় নিতে লাগলেন—অনেকের আপাদমস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন—ছই এক
 জন কলেজবয় ও মোটা মোটা লাঠিওয়ালা নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাঁর যে বড় ঘৃণা
 জন্মেছিল, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গ্যালো।

রোজার সঙ্গে ছটি চ্যালা মাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চাব্লিশ ভূত দেখবার উমেদার
 উপস্থিত, সুতরাং ভূত প্রথমে আসতে অস্বীকার করেছিলেন, তত্পলক্ষে রোজাও
 “কাল ও কুচানীর” উপলক্ষে একটু রক্ততা কস্তে ভোলেন নাই—শেষে দর্শকদের
 প্রসাদে ভক্তি ও ঘরের আলো নিবিয়ে অন্ধকার করবার সম্মতিতে রোজা ভূত
 আনতে রাজি হলেন—চ্যালায় খাবার দাবার সাঝানো খালা ঘেঁষে বসলেন, দরজার

ইন্ড কো পড়লো—আলো নিবুয়ে দেওয়া হলো ; রোজা কোশাকুশি ও আসন নিয়ে শুভাচারে ভূত ডাক্তে বসলেন, আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বারোইয়ারির গুদমজাত সংগুলির মত অন্ধকারে বসে রইলেম !

পাঠক ! আপনার স্মরণ থাকতে পারে, আমরা পূর্বেরই বলেছি যে, আমাদের ঠাকুরমা ভূত ও পেঙ্গীর ভয় নিবারণের জন্ত একটি ছোট জয়ঢাকের মত মাছলিতে ভূকৈলেশের মহাপুরুষের পায়ের ধূলা পুরে আমাদের গলায় কুলিয়ে দান—তা সওয়ার আমাদের গলায় গুটি বারো রকমারি পদক ও মাছলি ছিল, দুটি বাগের নথ ছিল, আর কুমীরের দাঁত, মাছের আঁশ ও গণ্ডারের চামড়াও কোমরের গোটে সাবধানে রাখা হয়। আর হাতে একখানা বাজুর মত কবচ ও তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে সোনার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেবেলা আমাদের এক বার বড় ব্যায়রাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে একটি চোরের সিন্দের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দের একটি জট থাকে, জটটি তেল ও ধূলাতে জড়িয়ে গিয়ে রামছাগলের গলার স্নমুড়ীর মত ঝুলতো, কিন্তু আমরা ইঙ্কলের অবস্থাতেই অল্প বয়সে অ্যান্‌বিশনের দাস হয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে একখানা ছাবানো হেডিংওয়াল কাগজে নাম সই করি ; তাতেই শুনলেম যে, আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো, স্ততরাং তারই কিছু পূর্বে ইঙ্কলের পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের হৃদিশা শুনে সেগুলি খুলে কেলেছিলেম, আজ সেইগুলির আবার স্মরণ হলো, মনে কল্পেম যদি ভূত নাবানো সত্যই হয়, তা হলে সেইগুলি পোরে আসতে পাল্ল ভূতে কিছু কষ্টে পার্বে না—এই বিবেচনা করে সেইগুলির তত্ত্ব কল্পেম, কিন্তু পাওয়া গ্যালো না—সেগুলি আমাদের পোস্তুরের ভাতের সময় একটা চাকর চুরি করে ; চুরিটি ধরবার জন্ত চেষ্টারও জট হয় নি—গিল্লি শনিবারে একটা স্পুগুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুদো বাদেন, জোঁপীর মা বলে আমাদের বহু কালের এক বড়ি দাসী ছিল, সে সেই মুদোটি নে জানের বাড়ি যায়—জান গুণে বলে দেয় যে “চোর বাড়ির লোক, বড় কালও নয় বড় স্তম্ভরও নয়—শ্রামবর্ণ, মাছুষটি একহারা, মাজারি গোঁপ, মাথায় টাক থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।” জানের গোপাতে আমাদের ও চাকরটিকেই বোঝায়, স্ততরাং চাকরকেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, স্ততরাং সে মাছলিগুলি পাওয়া গ্যালো না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠলো।

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না, এটিরও নিশ্চয় নাই—সে দিন কল্‌কেতার ব্রাহ্মসমাজের এক জন ডাইরেকটরের দ্বীকে ডাইনে পায়—মানা দেশ দেশান্তর

থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝড়ান ঝড়ান, সরষে পড়া, জল পড়া ও লব্ধা পড়া দিতে, তবে ভাল হয়—অনেক ব্রাহ্মণ বাড়িতে ভূতচতুর্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায় !

এদিকে রোজা খানিক ক্ষণ ডাক্তারে ডাক্তারে ভূতের আসবাব পূর্বলক্ষণ হতে লাগলো ; গোহাড়, ঢিল, ইট ও ছুতো হাঁড়ি বাড়ির চতুর্দিকে পড়তে লাগলো, ঘরের ভেতর গুপ্-গুপ্ করে যান কে নাচে বোধ হতে লাগলো, খানিক ক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াসু করে একটা শব্দ হলো, ভূতের বসবার জন্ত ঘরের ভিতর যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েছিল, শব্দে বোধ হলো সেইখানি ছুঁচির হয়ে ভেঙে গ্যালো—রোজা সভয়ে বলে উঠলেন—শ্রীযুত এসেচেন !

আমরা ছেলেব্যালা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম যে, ভূতে ও পেত্নীতে খোনা কথা কয়, সেটি আমাদের সংস্কারবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ; আজ তার পরীক্ষা হলো—ভূত পিঁড়ে কাটিয়েই খোনা কথা কইতে লাগলেন, প্রথমে এসেই কলেজবয়েদের দলের দুই এক জনের নাম ধরে ডাকলেন, তাদের নাস্তিক ও কুশ্চান বলে গাল দিলেন, শেষে ভূতদ্বনিবন্ধন ঘাড় ভাঙ্গবার ভয় পর্য্যন্ত ঝাঝাতে ক্রটি করেন নাই ; ভূতের খোনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই বাড়ির কর্তা বড় ভয় পেলেন, জোড়হাত করে (অঙ্ককারে জোড়হাত দেখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অঙ্ককারে দিবিব দেখতে পান, সুতরাং কর্মকর্তা অঙ্ককারেও জোড়হাতে কথা কয়েছিলেন এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হলো) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের মত যা ধরেন, তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাঙ্গবার প্রতিজ্ঞা অশুধা হলো না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালার অনেক সাধ্য সাধনার পর ভূত মহোদয় যজ্ঞীবাঁটার আগত নুতন জামাইয়ের মত যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কতে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আঁচতে লাগলোম্ !

জুঁচির চটকানো ও চিবোনোর চপর চপর ও সাপটা ফলারের হাপুর হপূর শব্দ থামতে প্রায় আদ ঘণ্টা লাগলো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলাউঠো রুগীর বমির ভূমিকার মত উকির শব্দ শোনা যেতে লাগলো, ক্রমে উকির চোটে ভূতের বাকরোধ হয়ে পড়লো—বমি ! হড় হড় করে বমি ! গৃহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মহাশয় বৃষি বমি কল্লেন, সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জালিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চ্যালা ও রোজা খোদাই বমি কল্লেন, ভূত সরে গ্যাচেন—আমরা পূর্বের শুনি নে যে

সেরসের অগোচরে এক জন মেডিকেল কালেক্সের ছোকরা ভূতের অন্ত সংগ্রহীত উপচারে টারটামেটিক মিশিয়ে দিয়েছিলেন, রোজা ও চ্যালারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দশা ; সুতরাং ভূত নাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিল, সেটুকু উণে গ্যালো ! সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির কল্পে যে, ইংরাজি ভূতদের কাছে দিশী ভূত খবরে আসে না !

এ সওয়ার আমরা আরও ছ চার জায়গায় ভূত নাবানো দেখেছি, পাঠকরাও বিশ্বর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, “ভূত নাবানো” ও “হোসেন খাঁ” কেবল জুজুরি ও জুজুকের আনুবঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ করি।

নাককাটা বন্ধ

হরিভদ্রর খুড়োর কথা মত—এ সকল প্রলয় জুয়াচুরি জেনেও আমরা এক দিন সন্ধ্যার পর সিম্লে পাড়ার বন্ধবেহারি বাবুর বাড়িতে গেলুম, বেহারি বাবু উকীলের বাড়ীর হেড্ ক্যারাগী—আপনার বুদ্ধি ও কৌশলবলেই বাড়ি ঘর দোর ও বিষয় আশয় বানিয়ে নিয়েচেন, বারো মাস খায়ে ঘোয়ে ফেরেন—যে রকমে হোক কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য !

বন্ধবেহারি বাবু হেলেবেলায় মাতামহের অল্পেই প্রতিপালিত হতেন, সুতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলি হয়। এক দিন মামার বাড়ি খেলা কস্তে কস্তে তিনি পাতকের ভেতর পড়ে যান—তাতে নাকটি কেটে যায়, সুতরাং সেই অবধি সমবয়সীরা আদর করে “নাককাটা বন্ধবেহারি” বলেই তাঁরে ডাকতো, শেষে উকীলবাড়িতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বন্ধবেহারি বাবুরা তিন ভাই, তিনি মধ্যম ; তাঁর দাদা সেলরদের দালালি কস্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিন ভাইয়েই কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকাগুলিও রকমারি বটে, সুতরাং নানাপ্রকার বদমায়েশ পান্নায় থাক্বে বড় বিচিহ্ন নয়—অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধবেহারি বাবুরা সিম্লে একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠছিলেন, হঠাৎ কিছু সজ্জতি হলে লোকের মেজাজ বেরূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠকরা বুঝতেই পারেন (বিশেষত আপনাদের মধ্যেও কোন্ না ছই এক জন বন্ধবেহারি বাবুর অবস্থার লোক না হবেন) ক্রমে বন্ধবেহারি বাবু ভদ্রলোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়লেন।

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ির প্যায়দা ও মালী পর্য্যন্ত আইনবাজ হয়ে থাকে, সুতরাং বন্ধবেহারি বাবু যে তুখোড় আইনবাজ হবেন তা পূর্ব্বেই জানা গিয়েছিল— আইন আদালতের পরামর্শ, জাল জালিয়াতির তালিম, ইকুটির খোঁচ ও কমন্স লার প্যাঁচে—বন্ধবেহারি বাবু দ্বিতীয় শুভকর ছিলেন। তদ্বর লোকমাত্রকেই তাঁর নামে ভয় পেতে হতো, তিনি আকাশে কাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে হয় করেন, এমন কি টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠক্‌চাচাও তাঁর কাছে পরামর্শ নিতেন।

আমরা সন্ধ্যার পরে বন্ধবেহারি বাবুর বাড়িতে পৌঁছলাম। আমাদের বুড়ো রাম ঘোড়াটির মধ্যে মধ্যে বাতলেয়ার অর হয়, সুতরাং আমরা গাড়ি চড়ে যেড়ে পারি নাই; রাত্তা হতে এক জন ঝাঁকা মুটে ডেকে তার ঝাঁকায় বসেই যাই; তাতে গাড়ির চেয়ে কিছু বিলম্ব হতে পারে। কিন্তু ঝাঁকা মুটে অপেক্ষা পহারীওয়ালাদের বোলায় যাওয়ায় আরাম আছে—হুঃখের বিষয় এই যে, সেটি সব সময় ঘটে না। পাঠকরা অল্পগ্রহ করে যদি ঐ বোলায় এক বার সোয়ার হন, তা হলে জ্বন্নে আর গাড়ি পাল্কি চড়তে ইচ্ছা হবে না; হাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এর আরাম জানেন—যেন ইস্প্রীংওয়ালার কোচ।

আমরা বন্ধবেহারি বাবুর বাড়িতে আরও অনেকগুলি ভব্নলোককে দেখতে পেলেম, তাঁরাও “সোনা করার” বুজুকি দেখতে সভাস্থ হয়েছিলেন। ক্রমে সকলের পরস্পর আলাপ ও কথাবার্তা থামলে সম্মাসী যে ঘরে ছিলেন, আমাদেরও সেই ঘরে যাবার অজুমতি হলো। সে ঘরটি বন্ধ বাবুর বৈঠকখানার লাগাও ছিল, সুতরাং আমরা সূত্ৰ পায়ের টুকলেম; ঘরটি চার কোণা সমান, মধ্যে সম্মাসী বাগ্‌হাল বিছিয়ে বসেচেন, সামনে একটি তিরশূল পোতা হয়েছে, পিতলের বাঘের উপর চড়া মহাদেব ও এক বাণলিঙ্গ শিব সামনে শোভা পাচ্ছেন, পাশে গাঁজার হাঁকো—সিদ্ধির বুলি ও আগুনের মালসা—সম্মাসীর পেছনে দুজন চালা বসে গাঁজা থাকে, তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাড়ুড়ি ও হামামদিত্তে পড়ে রয়েছে—তাঁরাই সোনা তৈরির বাহ্যিক আড়ম্বর।

আমাদের মধ্যে অনেকে সম্মাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন, অনেকে নিমগোছের ঘাড় নোয়ালেন, কেউ কেউ আমাদের মত শুক্রমশায়ের পাঠশালার ছেলেদের স্তায় গণ্ডার এণ্ডার সায় দিয়ে গোলে হরিরোলে সাগলেন—শেষে সম্মাসী ঘাড় নেড়ে সকলকেই বসুতে বলেন।

যে মহাপুরুষদের কোশলে হিন্দুধর্মের জন্ম হয়, তাঁরাই বন্ধ ! এই কন্দকাটা !

এই ব্রহ্মবাক্য ! এই ব্রহ্মবাক্য কালী—এই শেডলা ! হেলেনদের কথা দূরে থাকুক, বুড়ো মিলেদেরও ভয় পাইয়ে ছায় ! সন্ন্যাসী যে স্বকম সজ্জাগজ্ঞা করে বসে-
ছিলেন, তাতে মান্নন বা নাই মান্নন, হিন্দুসন্তান মাজ্জকেই শেওরাতে হয়েছিল !
হায় ! কালের কি মহিমা—সে দিন বার পিতামহ যে পাথরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম
করেচে—মুক্তির অনন্তগতি জেনে ভক্তি করেচে, আজ তার পৌত্তুর সেই পাথরের
ওপর পা তুলতে শক্তি হচ্চে না ; রে বিশ্বাস ! তোর অসাধ্য কর্ম নাই !
যার দাস হয়ে এক বার একজনকে প্রাণ সমর্পণ করা যায়, আবার তারই কথায়
তারে চিরশত্রু বিবেচনা হয়, এর বাড়ি আর আশ্চর্য্য কি ! কোন্ ধর্ম সত্য ? কিসে
ঈশ্বর পাওয়া যায় ? তা কে বলতে পারে ! সুতরাং পূর্বে যারা ঘোরনাদী বজ্র,
জলে, মাটি ও পাথরে ঈশ্বর বলে পূজে গ্যাচে, তারা যে নরকে যাবে ; আর আমরা
কি বুদ্ধবারে ঘণ্টাক্ষণেকের জন্ত চক্ষু বুজে ঘাড় নেড়ে কান্না ও গাওনা শুনে যে স্বর্গে
যাব—তারই বা প্রমাণ কি ? সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ
জ্ঞানীরা যারে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি
হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান করি, সে কতটা নির্বুদ্ধির কর্ম ?—
ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে
জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন। আজকাল যেখানে
যে ধর্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানে সেই ধর্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে
প্রতি দিন সংসারের যেমন পরিবর্তন হচ্চে, ধর্ম সমাজ, রীতি ও নিয়মও অ্যাড়াচ্চে
না। যে গ্রামমোহন রায় বেদকে মান্ত করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্মের শরীর নির্মাণ
করেচেন, আজ এক শ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যরা সেটি অস্বীকার
করেন—ক্রমে কৃশ্চানীর ভণ্ড ব্রাহ্মধর্মের অলঙ্কার করে তুলেচেন—আরও কি
হয় ! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভজলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস
করেন না। যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়-জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাদ করে
“ছোড়ার ডিম” ও “আকাশকুসুমের” দলে গণ্য হতেন না ! সুতরাং এক দিন
আমরা তাঁরে এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়ার্গেয়ে জমিদার বলে ডাকলেও ডাকতে
পারি !

সন্ন্যাসী আমাদের বসুতে বলে অন্য কথা তোলবার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময়
বন্ধবেহারি বাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন—সে দিন বন্ধবেহারি বাবু মাতার
একটি জরির কাবুলী তাজ, গায়ে লাল গাজের একটি পিরাহান, “বৈঁচে থাকুক
বিন্দেশাগর চিরজীবী হয়ে” পেড়ে শান্তিপূরে ধূতি ও ডুরে উড়ুনি মাত্র ব্যবহার

করেছিলেন, আর হাতে একটি লাল রঙের ক্রমাল ছিল, তাতে রিং সমেত স্টীকিং চাবি ঝুলেছে।

বন্ধবেহারি বাবুর ভূমিকা, মিষ্ট আলাপ, নমস্কার ও শেক হ্যাণ্ড চুকলে পর তাঁর দাদা সন্ন্যাসীকে হিন্দিতে বুজিয়ে বলেন যে, এই সকল ভদ্রর লোকেরা আপনার বৃজরুকি ও ক্যারামত দেখতে এসেছেন ; প্রার্থনা—অবকাশমত দুই একটা জাহির করেন—তাতে সন্ন্যাসীও কিছু কষ্টের পর রাজি হলেন। ক্রমে বৃজরুকির উপক্রমণিকা আরম্ভ হলো, বন্ধবেহারি বাবু প্রোগ্রাম স্থির করলেন, কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে প্রথমে ঘরের উপর হতে একটি জবাফুল তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো—ঘরের উপর থেকে জবাফুল বর্ষাকালের কড়কটো ব্যাঙের মত ধপাস করে লাফিয়ে উঠলো, সন্ন্যাসী তার দু হাত তফাৎ বসে রয়েছেন—এ দেখলে হঠাৎ বিস্মিত হতেই হয়, সুতরাং ঘরশুদ্ধ লোক খানিক ক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন—সন্ন্যাসীর গাঙ্গীরতা ও দর্পভরা মুখখানি ততই অহঙ্কারে ফুলে উঠতে লাগলো ! এমন সময় এক জন চালা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত কল্ল—মদ ছুদ হয়ে যাবে ; পাছে ডবল বোতল বা অন্ত কোন জিনিষ বলে যদি দর্শকদের সন্দেহ হয়, তার জন্য সন্ন্যাসী একটি নতুন সরায় সেই বোতলের সমুদায় মদটুকু ঢেলে ফেলেন, ঘর মদের গন্ধে তর হয়ে গ্যালো—সকলেরই স্থির বিশ্বাস হলো এ মদ বটে !

সন্ন্যাসী নতুন সরায় মদ ঢেলেই একটি হুঙ্কার ছাড়লেন, ক্ষুদে ক্ষুদে হেলেরা আঁৎকে উঠলো, বুড়োদের বুক গুরু গুরু কতে লাগলো ; ক্রমে এক জন চালা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কল্ল, “গুরু ! এ কটোরমে ক্যা হয় ?” সন্ন্যাসী, “দুধ হো ব্যোটা !” বলে তাতে এক কুশি জল ফেলবামাত্র সরার মদ ছুদের মত সাদা হয়ে গ্যালো। আমরাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম—এইরকম নানাপ্রকার বৃজরুকি ও কার্দ্দানির প্রকাশ হতে হতে রাস্তির এগারোটা বেজে গ্যালো, সুতরাং সকলের সম্মতিতে বন্ধ বাবুর প্রস্তাবে সে রাত্রেই মত বেদব্যাসের বিশ্রাম হলো ; আমরা রাম রকমের একটি প্রণাম দিয়ে, একটি উল্লুক বয়ে বাড়িতে এলোম—এঁকে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল, তাতে আমাদের বাহন ঝাঁকামুটেটি যে রাতকাণা তাঁ পূর্বে বলে নাই, সুতরাং তার হাত ধরে গুটি গুটি করে উজ্জোন আদ ফ্রোশ পথ তৈরি তাকে কাঠের দোকানে পৌঁচে রেখে তবে বাড়ি যাই, দুঃখের বিষয় আবার সে রাত্রে বেরালে আমাদের খাবারগুলি সব খেয়ে গিয়েছিল, দোকানগুলিও বন্ধ হয়ে গ্যাচে, সুতরাং ক্ষুধায় ও পথের কষ্টে আমরা হতভম্বা হয়ে সে রাস্তির অতিবাহিত করি।

আমরা পূর্বেরই বলে এসেছি “দশ দিন চোরের এক দিন স্ত্রের” ক্রমে অনেকেই বন্ধ বাবুর বাড়ির সন্ন্যাসীর কথা আন্দোলন কতে লাগলেন, শেষে এক দিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচুরি ধস্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বন্ধ বাবুর বাড়িতে গেলেম ; পূর্বদিনের মত জবাফুল তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো, এমন সময় এক জন মেডিকেল কালেক্টর বাঙ্গালা ক্লাসের বাঙ্গাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেলেন, শেষে ছড়োয়ুড়িতে বেরুলো জবাফুলটি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল !

সংসারের গতিই এই, এক বার অনর্থের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র বেরুলে ক্রমে বহুলী হয়ে পড়ে, বালুঞ্চি বাঁধা জবাফুল ধরা পড়তেই সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর তোবড়া তুবড়ির খানাতল্লাসি কতে লাগলেন ; এক জন ঘুরতে ঘুরতে ঘরের কোণ থেকে একটা মড়া পাঁটা বার কল্লেন । সন্ন্যাসী এক দিন ছাগল কেটে প্রাণদান ছান ; সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না পেরে ঘরের কোণেই (ক্লোরওয়ালা মেঝে নয়) পুঁতে রেখেছিলেন, তাড়াতাড়িতে বেমালাম করে মাটি চাপাতে পারেন নাই, পাটার একটি শিং বোরয়ে ছিল—শুভরাং এক জনের পায়ে ঠাঁকাতেই সুসন্ধানে বেরুলো ! সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে ছদ করেছিলেন, সে দিন তারও জাঁক ভেঙ্গে গ্যালো, সেই মজলিশের এক জন সব আসিষ্ট্যান্ট সার্জন বলেন যে আমেরিকান রম (মার্কিন আনিস) নামক মদে জল দেখা মাত্র সাধা ছুদের মত হয় যায় । এই রকম ধরপাকড়ের পর বন্ধবেহারি বাবু ও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করে আমরা রৈ রৈ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেম ; হরিভদ্রর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটি কেড়ে নিলেন, সেটি বিক্রি করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেই দিন থেকে এই রকম বুজুর্কক সন্ন্যাসীদের ওপর অশ্রদ্ধা হয় ।

পূর্বের এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপারের যে রকম প্রাহুর্ভাব ছিল এখন তার আংশে আদ শুণও নাই, আমরা সহরে কদিন কটা উর্জ্ববাহ কটা অবধূত দেখতে পাই ? ক্রমে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচুরিরও লাঘব হয়ে আসচে, ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন কোন ব্যবসাই স্থায়ী হয় না, শুভরাং উৎসাহদাতা বিরহেই এই সকল ধর্ম্মানুযায়িক প্রবন্ধনা উঠে যাবে, কিন্তু বলক্রেতা সহরের এমনি প্রসবক্ষমতা যে এখনও এমন এক একটি মহাপুরুষের জন্ম দিচ্ছেন যে, তাঁরা যাতে এই সকল বহুমান্বিসি চিরদিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্মের ভড়ং ও ভণ্ডামোর প্রাহুর্ভাব বাড়ে, সহস্র সংস্কার্য পায়ের নীচে ক্যালে তার জন্মই শশব্যস্ত । এক জনরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু তিনটিই পাগল, এক দিন বড় ভাই তার মাকে বলে যে, “মা ! তোমার

গর্ভটি দ্বিতীয় পাগলাগারদ ।” সেই রকম একদিন আমরাও কলকাতা সংস্করণে “রত্নগর্ভা” বলেও ডাকতে পারি—কলকাতার কি বড়মানুষ কি মধ্যাবস্থা এক এক জন এক একটি রত্ন !! এই দৃষ্টান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচনকে বজলিসে হাজির কল্লেম ।

বাবু পদ্মলোচন দত্ত

ওরফে

হঠাৎ অবতার

বাবু পদ্মলোচন ওরফে হঠাৎ অবতার ১১:২ সালে তাঁর মাতামহ নাউপাড়া-মুন্সুর মিস্ত্রিরদের বাড়ি জন্ম গ্রহণ করেন । নাউপাড়ামুন্সুরী গ্রামখানি মন্দ নয়, অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস আছে ; গাঁয়ের জমিদার মজফ্ফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি হুক্মে বিরত ছিলেন, মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখতেন—মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতির ও সেলামাঙ্গীর গুণা কস্তেন না, ফারসীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গলা ও উর্দুতেও তাঁর দখল ছিল ; মজফ্ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু ধোপা নাপিত বন্ধ করা, ছাঁকা মারা, ঢালা ফালা ও বিয়ে ভাটির ছকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিস্ত্রির বাবুদের ওপরই দেওয়া হয় । পূর্বে মিস্ত্রির বাবুদের বড় জলজলাট ছিল, মধ্যে পরিবারের অনেকে মরে যাওয়ায় ভাগা ভাগা ও বহু গুটি নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়তে হয়েছিল কিন্তু নিঃস্বত্ব হয়েও গ্রামস্থ লোকেদের কাছে মানের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি ।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায় নি, সে দিন—হঠাৎ মেঘাড়স্বর করে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁড়ুড়স্বরের দরজায় সমস্ত রাস্তির বসে ফৌস ফৌস করে, আর বাড়ির একটি পোষা টিয়েপাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে, পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে বড়ই খুসি হয়ে আপনার পরবার একখানি লালপেড়ে সাড়ি দাইকে বকসিস জ্ঞান, অভ্যাগত ঢুলী ও বাজন্দরেরাও একটি সিকি আর এক হাঁড়ি নারকেলনাড়ু পেয়েছিল । ক্রমে মহা আনন্দে আটকোড়ে সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেরা “আটকোড়ে বাটকোড়ে ছেলে আছে ভাল; ছেলের বাবার দাড়িতে বসে

হাঁস" বলে কুলো বাজিয়ে ফুটকড়াই, বাতাসা ও এক এক চক্চকে পয়সা নিয়ে আনন্দে বিদেয় হলো। গোভাগাড় থেকে একটা মরা গরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড়ঘরের দরজায় রেখে "দোরঘণ্টী" বলে হলুদ ও দুর্বেঁ দিবে পুজো করা হলো। ক্রমে ১৫ দিন ২০ দিন এক মাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দতলায় ঘণ্টীর পুজো দিয়ে আঁতুড় ওঠানো হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদের মতন বাড়তে লাগলেন। গুলিডাণ্ডা, কপাটি কপাটি, চোর চোর, তেলী হাত পিছলে গেলি প্রভৃতি খ্যালায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়লেন। পাঁচ বছরে হাতে খড়ি হলো, গুরুমশায়ের ভয়ে পদ্মলোচন পুকুরপাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন, পেট কামড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অন্তঃশিলে রোগেরও অভাব রইলো না ; ক্রমে কিছু দিন এই রকমে যায়, এক দিন পদ্মলোচনের বাপ মলেন, তাঁর মা আগুন খেয়ে গ্যালেন, ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভেয়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে সল্লেন, স্মৃতরাং মাতামহ মিস্ত্রিরদের ভিটে পুরুষশূন্য প্রায় হলো ; জমিজমাগুলি জয়কৃষ্ণের মত জমিদারে কতক গিলে ফেলে, কতক খাজনা না দেওয়ায় বিকিয়ে গ্যালো, স্মৃতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্প বয়সে পেটের জ্বরে অদৃষ্ট ও হাতযাশের ওপর নির্ভর কস্তে হলো। পদ্মলোচন কলকৈতায় এসে এক বাঁসাড়েদের বাসায় পেটভাতে ফাই ফরমাস, কাপড় কৌচানো ও লুচি ভাজা প্রভৃতি কর্মে ভর্তি হলেন,—অবকাশ মত হাতটাও পাকান হবে—বিশেষত: কুঠেলরা লেখাপড়া শেখাবেন প্রতিশ্রুত হলেন।

পদ্মলোচন কিছু কাল ঐ নিয়মে বাঁসাড়েদের মনোরঞ্জন কস্তে লাগলেন ; ক্রমে ছ এক বাবুর অহুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মাথালো মাথালো জায়গায় উমেদারি আরম্ভ করলেন। সহরের যে বড়মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন প্রায় সর্বত্রই লোকারণ্য দেখতে পাবেন, যদি ভিতরকার খবর স্থান তা হলে পাওনাদার, মহাজন, উঠনোওয়াল, দোকানদার, উমেদার, আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলেই বিস্তর দেখতে পাবেন—পদ্মলোচনও সেই ভিড়ের মধ্যে একটি বাড়লেন ; ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গরুড়ের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটাই হাঁটি ও হাজিরের পর ছ চারখানা সই সুপারিস্ও হস্তগত হলো ; শেষে এক সদয়হৃদয় মুচ্ছন্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্টভোগের একশেষ করেছিলেন, ভ্রলোকের ছেলে হয়েও কাপড় কৌচান, লুচি ভাজা, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কস্তে হয়েছিল ; ক্রমশ: লুচি ভাজতে ভাজতে ক্রমে লুচিভাজায় তিনি এমনি তৈরি হয়ে

উঠলেন যে তাঁর মত লুচি অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়ালার বায়ুনেও ভাঙতে পারতো না। বাঁসাড়েয়া খুসি হয়ে তাঁরে “মেকর” খেতাব জায়, সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষ্যকথায় বলে “যখন যার কপাল ধরে মুস্তে বসে——” যখন পড়তে পড়তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধুলে সোনামুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফলতে আরম্ভ হলো—মুচ্ছুদী অল্পেই করে সিপসরকারী কর্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকি ও কাজের হুঁসিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট করবার অবসর খুঁজতে লাগলেন—একমনে সেবা কল্ল ভয়ঙ্কর সাপও সদয় হয়, পুরাণে পাওয়া যায় যে তপস্বী করে অনেকে হিন্দুদের ভূতের মত ভয়ানক দেবতাগুলোকেও প্রসন্ন করেছে। ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল করবার চেষ্টায় রইলেন; এক দিন হউসের সদরমেট কর্মে জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদীকে অমুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্মে ভর্তি কল্লেন।

পদ্মলোচন সিপসরকার হয়েও বাঁসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভাল ছাথায় না বলেই অগ্রত্ব একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে একটি খোলার ঘর প্রাপ্ত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিক দিন থাকতে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচির ফোস্কার মত ফুলে উঠলো—বের জল পেলে কনেরা যামন ফেঁপে ওটে, তিনিও তেমনি কাঁপতে লাগলেন। ক্রমে মুচ্ছুদীর সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছুদী কর্ম ছেড়ে দিলেন, সুতরাং সাহেবদের অল্পেই হার পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদী হলেন।

টাকায় সকলই করে! পদ্মলোচন মুচ্ছুদী হবামাত্র অবস্থার পরিবর্তন বুজতে পারলেন, তার পরদিন সকালে সেই খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগলো—উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালার ও পাইকেরে ভরে গ্যালো, কেউ পদ্মলোচন বাবুকে নমস্কার করে হাঁটু গেড়ে জোড়হাত করে কথা কয়, কেউ “আপনাব সোনার ঘোত কলম হোক” “লক্ষপতি হোন” “সম্বৎসরের মধ্যে গুস্তুর সন্ধান হোক” “অল্পগতের হজুর ভিন্ন গতি নাই” প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে তুঁহলে পাউরুটি দ্বন্দেও কোলাতে লাগলেন—ক্রমে ছরবন্দা ছকুরে লোচার মত মুখে কাপড় দিয়ে লুকুলেন—অভিমান ও অহঙ্কারে ভূষিত হয়ে সৌভাগ্যমুখী বারান্দা সেজে তাঁরে জ্বালিলেন কল্লেন; হজুরদারেরা অল্পকাল “পদ্মলোচনকে পায় কে” বলে চ্যাড়্‌রা

গিটে দিলেন, প্রতিধ্বনি—রেও বাবুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে সেজে এই কথাটি সর্বত্র ঘোষণা করে ব্যাড়াতে লাগলেন—সহরে চিচি হয়ে গ্যালো—পদ্মলোচন এক জন মস্ত লোক !

কলকেতা সহরে কতকগুলি বেকার “জয়কেতু” আছেন, যখন যার নতুন বোলবালাও হয় তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জাতেব শ্রেষ্ঠ দেখেন ও অনশ্রমনে তাঁরই উপাসনা করেন ; আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উচু হয়ে পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উচুর দলে জমেন ; আমরা ছেলেবালা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে “হাঁদন দড়ি ও গোদা বাড়ির” গল্প শুনছিলাম, এই মহাপুরুষরা ঠিক সেই হাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি । গল্পে আছে “রাজপুত্রুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, হাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি ! এখন তুমি কার ?”—“না আমি যখন যার তখন তার !” তেমনি ছতোম প্যাঁচা বলেন সহরে জয়কেতুরাও “যখন যার তখন তার” !!!

জয়কেতুরা ভদ্রলোকের ছেলে, অনেকে লেখাপড়াও জানেন, তবে কেউ কেউ মৃতিমতী মা ! এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন বেকার পেনশনে ও বোর্ডদই বিস্তর । বহু কালের পর পদ্মলোচন বাবু কলকেতা সহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন, প্রায় বিশ বৎসর হলো সহরের “হঠাৎ বাবুর” উপসংহার হয়ে যায় তন্নিবন্ধন “জয়কেতু” “মোসাহেব” “ওস্তাদজী” “ভড়্‌জা” “ঘোষজা” “বোঁসজা” প্রভৃতি বরাথুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মত ভেসে ভেসে ব্যাড়াচ্ছিলেন, সুতরাং এখন পদ্মলোচনের “তর্পণের কোষায়” জুড়বার জায়গা পেলেন !

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে কাঁপিয়ে তুল্লেন, পড়তাও ভাল চলো—পদ্মলোচন অ্যাশ্বিনের দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনদার বাবুদের মত গাঢ়াকা হলেন । পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পাদধুলো খান—পা চাটেন—দলাদলির ও হিন্দুধর্মের ষোঁট করেন—ঠাকরুণ বিষয় ও সখীসম্বাদ গাওনার পক্ষে প্রকৃত ব্রটিংপেপার ; পদ্মলোচনের জোরদণ্ডপ্রতাপ । বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না, মিউজিটের সময় গবর্নেন্ট যেমন দোচোকোত্রত ভলন্টিয়ার জুটিয়েছিলেন, পদ্মলোচন বাবু হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ কস্তুে বাকি রাখলেন না, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মের মত বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র কল্লেন—বেশীর ভাগ জ্যান্ত !!!

বাঁজালি বদমায়েস ও ছর্‌বুজির হাতে টাকা না থাকলে সংসারের কিছু মাত্র ক্ষতি কস্তুে পারে না, বদমায়েসী ও টাকা একত্র হলে হাতা পর্য্যন্ত মারা পড়ে, সেটি বঁড় সোজা কথা নয়, শিবকেষ্ঠো বঁড় জ্যে পর্য্যন্ত যাতে মারা যান ! পদ্মলোচনও

পাঁচ জন কুলোকেব পরামর্শে বদমায়িসী আরম্ভ কল্লেন—পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টিটকারি করা তাঁর কাজ হলো, ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চোড়ে উঠলেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কস্তে লাগলেন; পারিষদেরা অবতার বলে তাঁরে স্তব কস্তে লাগলো, বাজে লোকে “হঠাৎ অবতার” খেতাব দিলে—দর্শক ভদ্র লোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক হয়ে ক্ল্যাপ দিতে লাগলেন।

পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউরেছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীর কিম্বা ইহুদীদের ভাবী মেসায়ী—তারই সফল ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বৃজরুকি পর্য্যন্ত দেখাতে ক্রটি করেন নাই।

বিলাতী জুজেন্স ক্রাইষ্ট—এক টুকরো ক্রটিতে এক শ লোক খাইয়েছিলেন—কাণা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কস্তেন। হিন্দুমতের কেটেও পুতনা বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করেছিলেন। পদ্মলোচন আপনারে অবতার বলে মানাবার জন্য সহরে ছজুক তুলে দিলেন যে, “তিনি এক দিন বারো জনের খাবার জিনিষে এক শ লোক খাইয়ে দিলেন”; কাণা খোঁড়ারা সর্ব্বদাই হাতা বেড়ির ধ্বজবজ্রাঙ্কুশযুক্ত পদ্মহস্ত পাবার প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন, বৃড়ি বৃড়ি মাগীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিয়ে “হাতবুলানো” পাইয়ে আনে—প্রভৃতি নানাবিধ বৃজরুকি প্রকাশ কস্তে লাগলেন। এই সকল শুনে চতুষ্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষরা মড়কের শকুনির মত নাচতে লাগলেন—টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন অশ্বের কি কথা। ময়রার দোকানে যত রকমারি মাছি, বসন্তি বোলতা আর ভোঁভুঁয়ে ভোমরা দেখা যায়, বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে—সেখায় পদার্থহীন উই পোকারা—আনুসাড়ে আরম্মুলোর দল, আর দু একটা গোড়িমওয়ালা ফচকে নেংটি ইঁদুর মাত্র।

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও তত হয় না; “হঠাৎ অবতার” হয়েও পদ্মলোচনের আশা নিবৃত্তি হয় নাই—বাদসাই পেলেই যে সে আশা নিবৃত্তি হবে তারও সম্ভাবনা কি! কিছু দিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা সহরের এক জন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুলে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচলে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে। ওরে! ওরে! হজুর ও “যো হকুমের” হল্লা পড়ে গ্যালো, ক্রমে সহরের বড় দলে খপর কুলো যে কলকেতার আচর্যাল হিন্দীর দলে একটি নম্বরে বাড়লো।

পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কস্তে লাগলেন,

অবতার উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কিনলেন, সহরের বড়মানুষ হলে যে সকল জিনিষপত্র ও উপাদানের আবশ্যক, সভ্য আত্মীয় ও মোসাহেবেরা ক্রমশঃ সেই সকল জিনিষ সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পূরে কেলেদেন, বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড়ও রাখলেন।

বেঙ্গাবাজিটি আজকাল এ সহরে বাহাদুরির কাজ ও বড়মানুষের এলবাত পোশাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড়মানুষ বহু কাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেণ্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েছে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয় নি, যা দেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে। কলকাতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজ্জারা রাস্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দ্যাখেন না, বাড়ির প্রধান আমলা দাওয়ান মুচ্ছন্দীরা যেমন হজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম দেখেন—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইনমত অর্শায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়বেন কেন।—এই ভয়ে কোন কোন বুদ্ধিমান স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে চাবি বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন, ভোপ পড়ে গ্যাচে করলা হবার পূর্বে গাড়ি বা পালকি করে বিবি সাহেব বিদায় হন—বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে শয়ন করেন—স্ত্রীও চাবি হাতে পরিত্রাণ পান। ছোকরাগোছের কোন কোন বাবুরা বাপ মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে এক জন চাকর বা বেয়ারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান, চাকর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসীপাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন, মধ্য রাস্তির কেটে গ্যাচে বাবু আমোদ নুটে করেন ও বাড়িতে এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় যা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়, বাবু শয়ন করেন—বাড়ির কেউই টের পায় না যে বাবু রাস্তিরে ঘরে থাকেন না। পাঠকগণ! যারা ছেলেবাল্য থেকে “ধর্ম যে কার নাম তা শোনে নি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের স্মরণ সম্পর্ক, কতকগুলি হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল” তারা যে এই রকম পশুর কদাচারে রত থাকবে, এ বড় আশ্চর্য্য নয়! কলকাতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্ত বেঙ্গাসহর হয়ে পড়েছে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশ ঘর বেঙ্গা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেঙ্গার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে বই কমছে না। এমন কি এক জন বড়মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের স্ত্রী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস করবার খো নাই; তা হলে দশ দিনেই সেই স্ত্রী টাকা ও সূতের লোতে কুলে জলাঞ্জলি দেবে—যত দিন স্ত্রী বাবুর মনকাষনা পূর্ণ না করবে তত দিন দেখতে পাবেন

বাবু অষ্টপ্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বারাগাতেই আছেন, কখন হাসছেন, কখন টাকার তোড়া নিয়ে ইসারা করে দ্যাখাচ্ছেন, এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই, তাঁরা যত দিন তাঁরে বাবুর কাছে না আনতে পারবেন, তত দিন মহাদায়গ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে, হয় ত সে কালের নবাবদের মত “জান বাচ্চা এক গাড়” হবার হুকুম হয়েছে! ক্রমে কলে কৌশলে সেই সাধ্বী স্ত্রী বা কুমারীর ধর্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কসব করাই তার অনশ্লগতি হয়ে পড়ে! শুধু এই নয়; সহরের বড়মানুষরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিত মেয়ে-মানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কামকুশার নিবৃত্তি হয় না—শেষে ভগ্নি ভাগ্নি—বউ ও বাড়ির যুবতী মাত্রেই তাঁর ভোগে লাগে—এতে কত সতী আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের হাত এড়িয়েচে। আমরা বেশ জানি, অনেক বড়মানুষের বাড়ি মাসে একটি করে অগ্নিহত্যা হয় ও রক্তকব্জলের শিকড়, চিতের ডাল ও কন্নবীর ছালের নুন তেলের মত উঠানো বরাদ্দ আছে! যেখানে হিন্দুধর্মের অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট, ও ভদ্রলোকের অধিক কুংসা, প্রায় সেখানেই ভেতরবাগে উদ্যম এলো কিন্তু বাইরে পাদে গেরো!

হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির ছরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জ্ঞাত কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়ি আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে! আজ এক শ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এদেশে এসেছেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে? সেই নবাবী আমলের বড়মানুষী কেতা, সেই পাকানো কাছা, সেই কৌচান চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরি চুল আজও জাখা যাচ্ছে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্তন জাখা যায়, কিন্তু আমাদের হজুরেরা যামন তেমনিই রয়েছেন! আমাদের ভরসা ছিল কেউ হঠাৎ বড়মানুষ হলে রিকাইও গোছের বড়মানুষীর নজির হবে কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূলে নিমূল হয়ে গ্যালো—পদ্মলোচন—আবার কফিন চোরের ব্যাটা ম্যাক্‌মারা হয়ে পড়লেন; কফিন চোর, মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি কত্তো মাত্র কিন্তু তার উদ্ভরাধিকারী মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি করে শেষে—রাঁড় রেখে অবধি পদ্মলোচন স্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ করলেন, স্ত্রী চরে খেতে লাগলেন, পূর্ব সহবাস বা

ভাঁড় হাতযশে পদ্মলোচনের গুটি চার ছেলে হয়েছিল ; ক্রমে জ্যেষ্ঠটি বড় হয়ে উঠলো সুতরাং ভাঁড় বিবাহে বিলক্ষণ ধুমধাম হবার পরামর্শ হতে লাগলো !

ক্রমে বড় বাবুর বিয়ের উজ্জ্বল হতে লাগলো, ঘটক ও ঘটকীরা বাড়ি বাড়ি মেয়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন—“ফুলীনের মেয়ে, দেখতে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা ঘোস্তোর থাকবে” এমনটি শীগগির ঘটে ওটা সোজা কথা নয় ; শেষে অনেক বাছা গোছা ও ছাখা শোনার পর সহরের আগড়োম ভেঁম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম মিস্ত্রির পৌত্বরীরই ফুল ফুটলো ! আত্মারাম বাবু খাস হিঁচু, কাণ্ডেণির কর্ণে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারাম বাবুর সংসারও রাবণের সংসার বলে হয়—সাত সাতটি রোজগেরে ব্যাটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে গুটি চাঙ্গিশ পৌত্বরী পৌত্বরী, এ সওয়ায় ভায়ে জামাই কুটুম্ব সাক্ষাৎ বাড়িতে গিজিগিজ করে—সুতরাং সর্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন ; শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের স্থির হলো, দলস্থ সমুদায় ব্রাহ্মণরা মর্যাদা মত পত্রের বিদেয় পেলেন, রাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে দিতে চললো ; বিয়ের ভারী ধুম ! সহরে ছজুক উঠলো পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু এত নয় !

দিন আসচে ; দেখতে দেখতেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো—ক্রিয়েবাড়িতে নহবত বসে গ্যালো । অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য ও দলস্থদের ঘোঁট বাদান শুরু হলো—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোনার লোহা, ও ঢাকাই সাড়িওয়াল ছ লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত দলে বিতরণ হলো ! বড়মাণ্ডুঘদের বাড়িতেও শাল ও সোনাওয়াল লোহা, ঢাকাই কাপড়, গাঁদাড়া কদক, গোলাব ও আতর, ও এক এক জোড়া শাল সওয়াত পাঠান হলো ; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ করলেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা ঢুলী বা বাজন্মরে নই যে শাল নেবো ! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতারণা করে স্ত্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিশ্বস্ত হয়েছিলেন সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য করলেন না ! পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠলেন—ব্যাটার অদৃষ্টে নাই !

এদিকে বিয়ের বাইনাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রূপোর বালা, লাল কাপড়ের তকমা ও উর্দুপরা চাকরেরা ঘুরে ব্যাড়াচ্ছে, কোথাও অধ্যক্ষরা গড়ের বাজনা আনবার পরামর্শ কছেন—কোথাও বরের সজ্জা তৈরির জন্য দর্জীরা একমনে কাজ কচ্ছে—চার দিকেই হৈ হৈ ও রৈ রৈ শব্দ—বাবুর দেওয়া শালে সহরের

রাস্তার অর্ধেক লোকই লালে লাল হয়ে গ্যালো, ঢুলী ও বাজন্দরেরা ভো অনেকের
বিয়েতেই পুরনো শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় ভদ্র লোকেও
শাল পেয়ে লাল হয়ে গ্যালেন !

১২ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিল, আজ ১২ই পৌষ ; আজ
বিবাহ । আমরা পূর্বেই বলেছি যে সহরে টি টি হয়ে গিয়েছিল যে “পদ্মলোচনের
ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ” সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায়
ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগলো, পাহারাওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ি ঘোড়া
চলবার পথ করে দিতে লাগলো । ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো—প্রথমে
কাগজের ও অববরের হাত ঝাড়, পাঞ্জা ও সিঁড়ি ঝাড়, রাস্তার দু পাশে চল্লো, ঐ
রেশালার আগে আগে দুটি চলতি নবৎ ছিল, তার পেছনে গেট—দালান ও
কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপর হর পার্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভূঙ্গী, সাপ ও নানা
রকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়াপাখী, হাতীপাখী, উটপাখী ও ময়ূরপাখী ; পাখীগুলির
ওপরে বারো জন করে দাঁড়ি, মেয়ে ও পুরুষ সওদাগর সাজা, ও দুটি করে ঢোল ।
তার আশে পাশে তক্তানাচার ওপর “মগের নাচ” “ফিরিঙ্গীর নাচ” প্রভৃতি নানা
প্রকার সাজা সং । তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল, চল্লিশটি জগঝম্প ও গুটি বাইটেক
ঢাক, মায় রোশনচৌকি—শানাই, তোড়ং ও ভেঁপু—তার কিছু অন্তরে এক দল
নিমখাসা রকমের চুনোগলির ইংরিজি বাজনা । মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ
পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বর । সকলেরই একরকম শাল, মাথায় কুমাল
জড়ান, হাতে এক একগাছি ইষ্টিক ; হঠাৎ বোধ হলো যেন এক কোম্পানি
ডিক্কার্ড সেপাই । এই দলের দুই ধারে লাল বনাভের খাসগেলাপ, ও রূপোর
জাণ্ডিতে রেশমের নিশেন ধরা তকমাপরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে হোঁড়ারা, মধ্যে খোদ
বরকর্তা, গুরু, পুরোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভট্টাচার্য ও আত্মীয়
অন্তরঙ্গরা ; এর পেছনে রাজাযুখো ইংরিজি বাজনা, সাজা সায়েব তুরুকসওয়ার,
বরের ইয়ারবজ্র, খাস দরওয়ানরা, হেড খানসামা ও রূপোর সুখামনে বর ;
সুখাসনখানির চার দিকে মায় বাতি বেললঠন টাঙ্গান, সামনে রূপোর দশ-ভেলে
বসা ঝাড়, দুই পাশে চামরধরা দুটো হোঁড়া ; শেষে বরের ভোরঙ্গ, প্যাটরা, বাড়ির
পরামাণিক, সোনার দানা গলায় বুড়ি বুড়ি গুটি কত দাসী ও বাজে লোক, তার
পেছনে বরযাত্রীর গাড়ির সার—প্রায় সকলগুলির উপরে এক এক চাকর, ঊষল

বাতি দেওয়া হাতলঠন ধরে বসে যাচ্ছে ।

ব্যাও, ঢাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে, লোকের রঙ্গা ও অশ্রুধারের মিহিলের

চীৎকারে কলকোতা কাঁপতে লাগলো, অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি হাতে উঠে মনে কল্লি ওদিকে ভয়ানক আগুন লেগে থাকবে, রাস্তার দুধারি বাড়ির জানালা ও বারান্দা লোকে পূরে প্যালা, বেশার “আহা দিবি ছেলেটি যেন চাঁদ!” বলে প্রশংসা কল্লি লাগলো, ছতাম পাঁচা অন্তরীক্ষ থেকে নকশা নিতে লাগলেন—ক্রমে বর কনেবাড়ি পৌঁছিল। কন্যাকর্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বরষাতোরদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মোতাত্তী বুড়ো ও বওয়াটে ছোঁড়ারা গ্রামভাটির জন্ত বরকস্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর সভায় গিয়ে বসলেন, ভাটেরা ছড়া পড়তে লাগলো, মেয়েরা বারান্দা থেকে উঁকি মাস্তে লাগলো—ঘটকরা মিস্তির বাবু ও দস্ত বাবু কুলঙ্গী আউড়ে দিলে; মিস্তির বাবু কুলীন স্মুতরাং বল্লালী রেজেষ্ট্রীতে তাঁর বংশাবলি রেজেষ্ট্রী হয়ে আছে, কেবল দস্ত বাবুর বংশাবলিটি বানিয়ে নিতে হয়!

ক্রমে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা সাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন, বর স্ত্রী আচারের জন্ত বাড়ির ভিতর গেলেন। চাঁদনাতলায় চারটি কলাগাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পিঁড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেইখানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাড়া গুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিঙ্গিম দিয়ে বরণ কল্লেন, শাঁক বাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ি সন্নগরম হয়ে উঠলো, ক্রমে মায় শাশুড়ী এয়ারা সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ কল্লেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন “হাতে দিলেম মাকু এক বার ত্যা কর ত বাপু”! বর কলেজ বয়, আড়-চকে এয়াদের পানে তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লঙ্কা ভাগ কচ্ছিলেন; স্মুতরাং “মনে মনে কল্লেম” বল্লেন—অমনি শালাজরা কাণ মলে দিলে, শালীরা গালে চৌনা মাল্লি; শেষে গুড় চাল, তুকতাক ও ওষুদ বিষুদ ফুরুলে, উজ্জগুগু করবার জন্ত কনেকে দালানে নিয়ে যাওয়া হলো, শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়ে কনে উজ্জগুগু হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্য্যারা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন, বরকে বাসরে নে যাওয়া হলো। বাসরটিতে আমোদের চূড়ান্ত হয়। আমরা তো অ্যাতো বুড়ো হয়েছি, তবু এখনও বাসরের আমোদটি মনে পড়লে মুখ দে লাল পড়ে ও আবার বিয়ে কল্লি ইচ্ছে হয়!

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুমুদনাথ অন্ত গেলেন, কমলিনীর হৃদয়রঞ্জন প্রকৃত ভেল্লীয়ান হয়েও যেন তাঁর মানভঞ্নের জন্তই কোমল ভাব ধারণ করে উদয় হলেন, কমলিনী কামাতুর নাথের তাদৃশ দুর্দশা দেখেই যেন সরোবরের মধ্যে হাসতে লাগলেন, পাখিরা “ছি ছি কামোদ্রস্তদের কিছু হাত বাহজ্ঞান থাকে না” বলে চৌচিয়ে উঠলো, বায়ু মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন—দেখে জোখে সূর্য্যদেব নিজ

মূর্তি ধারণ কল্লেন ; তাই দেখে পাখিরা ভয়ে দূরদূরান্তরে পালিয়ে গ্যালো—বিয়ে-বাড়ি বাসি বিয়ের উজ্জ্বল হতে লাগলো। হলুদ ও তেল মাথিয়ে বরকে কলাতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুচ্ছতাকের পর, বর কনের গাটছড়া কিছু ক্ষণের পর খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কুটুম্বরা জুটতে লাগলেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাড়ি নে যাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে তুলেন, এক কড়া ছুদ দরজার কাছে আগুনের ওপর বসান ছিল, কনেকে সেই ছুদের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, “মা! কি দেখ্‌চো? বল যে আমার সংসার উতলে পড়্‌চে দেখ্‌চি” কনেও মনে মনে তাই বলেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিল্মিতে নানা রকম তুচ্ছতাক কল্লেন পর বর কনে জিরুতে পেলেন, বিয়েবাড়ির কথঞ্চিৎ গোল চুকলো—চুলীরা ধেনো মদ খেয়ে আমোদ কস্তে লাগলো, অধ্যক্ষরা প্রলয় হিন্দু সূতরাং একটা একটা আগাতোলা দুর্গোমণ্ডা ও অ্যাক ঘটি গঙ্গাজল খেয়ে বিছানায় আড় হলেন, বর কনে আলাদা আলাদা শুলেন—আজ একত্রে শুতে নাই, বে বাড়ির বড়গিল্মির মতে আজকের রাত—কালরাত্তির।

শীতকালের রাত্তির শিগ্গির যায় না। এক ঘুম, দু ঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ এক ঘুম হয়; ক্রমে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গ্যালো—প্রাতঃস্নানে মেয়েগুলো বক্‌তে বক্‌তে রাস্তা মাথায় করে যাচ্ছে,—বুড়ো বুড়ো ভট্‌চামিরা স্নান করে “মহিম্নঃ পারন্তে” মহিম্নস্তব আওড়াতে আওড়াতে চলেচেন। এদিকে পদ্মলোচন রাঁড়ের বাড়ি হতে বাড়ি এলেন, আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রাত্যহ সাত আটটার সময় বেণ্ডালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আসতে হয়েছিল—সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো দলপতির এক একটি রাঁড় আছে এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি, এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, একেবারে সকালবেলা প্রাতঃস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা কেটে, গীতগোবিন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কস্তে কস্তে বাড়ি ফেরেন—হঠাৎ লোকে মনে কস্তে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতিবাহিত হলে ভোরের সময় বিদেয় দিয়ে স্নান করে পূজো কস্তে বসেন—যেন রাত্তিরের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরেছিলেন।

ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বরাও এসে জমলেন—মোসাহেবরা “হজুর! কল্‌কেতায় অ্যামন বিয়ে হয় নি হবে না” বলে বাবুর ল্যাজ ফোলাতে লাগলেন। ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ফুলশয্যার তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহাসমাদরে কনের বাড়ির চাকর

চাকরাণীদের অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও একখানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়রা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন, ঢাকী চুলী ও রেশালার লোকেরা বকসিস পেয়ে বিদেয় হলো; মহাসমারোহে পাঁচ লক্ষ টাকার বিবাহ শেষ হয়ে গ্যালো; কোন কোন বাড়ির গিন্নিরা সামিগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুরে পুরে শিকের টাঙ্গিয়ে রাখলেন, অধিক অংশ পচে গ্যাল, কতক বেরালে ও ইঁদুরে খেয়ে গ্যাল, তবু পেট ভরে খাওয়া কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পারেন না—বড়মানুষদের বাড়ির গিন্নিরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিষ পচে গেলেও লোককে হাতে তুলে দিতে মায়া হয়। শেষে পচে গেলে মহারাণীর খানায় ফেলে দেওয়া হবে সেও ভাল। কোন কোন বাবুরও এ স্বভাবটি আছে—সহরের এক বড়মানুষের বাড়িতে পূজার সময় নবমীর দিন গুটি ঘাইটেক পাঠা বলিদান হয়ে থাকে; পূর্বপরম্পরায় সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আসূচে, কিন্তু আজকাল সেই পাঠাগুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পূজোর গোল চুকে গেলে পূর্ণিমার পর সেইগুলি বাড়ি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে; স্মৃতরাং ছয় সাত দিনের মরা পাঠা ক্যামন উপাদেয়, তা পাঠক! আপনিই বিবেচনা করুন। শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঠা বিদেয় কন্তে ঘর হতে পরসী বার কন্তে হয়। আমরা যে পূর্বে আপনাদের কাছে সহরের সর্দার মুখের গল্প করেছি, ইনিই তিনি!

এদিকে ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গ্যালো, পদ্মলোচন বিষয় কৰ্ম কন্তে লাগলেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্বণ ফাঁক দিতেন না; যেটুপূজোতেও চিনির নৈবিদ্য ও সকের যাত্রা বরাদ্দ ছিল ও আপনার বাড়িতে যে রকম ধুম করে পূজো আচ্ছা কন্তেন, রক্ষিত মেয়ে-মানুষ ও অনুগত দশ বারো জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদেরো তেমনি ধূমে পূজো করাতেন। নিজের ছেলের বিবাহের সময় তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বংশজের বিবাহ দিয়ে জ্ঞান। ইংরিজি লেখাপড়ার প্রাভুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জ্ঞানগ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দুধর্মের যে কিছু ছুরবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা দেশের ভালোর জন্ত এক দিনও উত্তত হন নি—শুভ কর্মে দান দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর পশিমের ভয়ানক দুর্ভিক্ষেও কিছু মাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভালো করবার জন্ত কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে তারে কুশান

ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন—এক শ বেলোলা বায়ুন ও ছুই শ মোসাহেব তাঁর অঙ্গে প্রতিপালিত হতো—তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান্ পবিত্র বলে সহরে বিখ্যাত হয়। লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, সুদ্ধ নামটা সই কত্তে পায়েই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশ-পরম্পরার স্থির সংস্কার ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে ঐ বংশের সম্পর্ক রাখতেন না! উনবিংশতি শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের জগ্নু সহরে কোন বড়মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। যে রকম কাল পড়েছে, তাতে আর কেউ যে তাদৃক যত্নবান হন, তারো সম্ভাবনা নাই। তিনি য্যামন হিন্দুধর্মের বাহ্যিক গোড়া ছিলেন, অশ্রান্ত সংকর্ষেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল; বিধবা-বিবাহের নাম শুন্লে তিনি কাণে হাত দিতেন—ইংরাজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে কুশান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি পড়ান নি—অথচ বিদ্যে-মাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই—বিশেষত শূত্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটিও তাঁর জানা ছিল, সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলিও “বাপ্কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া”র দলেই পড়ে।

কিছু দিন এই রকম অদৃষ্টচর লীলা প্রকাশ করে আশী বৎসর বয়সে পদ্মলোচন দেহ পরিত্যাগ কল্লেন—মৃত্যুর দশ দিন পূর্বে এক দিন হঠাৎ অবতারের সর্ব্বাঙ্গ বেদনা করে। সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হয়ে তাঁরে শয্যাগত কল্লেন—তিনি প্রকৃত হিন্দু, সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসায় ভারী ঘেষ কল্লেন, বিশেষতঃ তাঁর ছেলেব্যালা পর্য্যন্ত সংস্কার ছিল ডাক্তারি ওষু মাতেই মদ মেশান, সুতরাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে আত্মীয়রা কবিরাজ মশাইদের সঙ্গে পরামর্শ করে ত্রীত্রীভাগীরথীতটস্থ কল্লেন; সেখানে তিন রাস্তির বাস করে মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্তের পর সজ্জানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ করেন।

পাঠকগণ! আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে বহু দূর এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনারদের সম্মুখে জন্মালেন আবার মলেন, তাঁর সুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা অবগত হলেন এমন নয়, সহরের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকেই পদ্মলোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস! যে দেশের বড়লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা নিরর্থক! যাঁদের হতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের

সর্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা ইচ্ছা করে আপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন; তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম করেন, তার যথাক্রম শাস্তি নরকেও ছুপ্রাপ্য।

অশ্বভূমি-হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন করবার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলই নিরর্থক হবে!

আলালের ঘরের দুলাল লেখক বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন—“সহরের মাতাল বজ্ররূপী” কিন্তু আমরা বলি, সহরের বড়মাগুঘরা নানারূপী—এক এক বাবু এক



“ঠনঠনের হঠাৎ অবতার”

এক তরো, আমরা চড়কের নকশায় সেগুলির প্রায়ই গড়ে বর্ণন করেছি, এখন ক্রমশ তারি সবিস্তার বর্ণন করা যাবে—তারি প্রথম উঁচু দল খাস হিন্দু; এই হঠাৎ অবতারের নকশাতেই আপনারা দেই উঁচুকেতার খাস হিন্দু দলের চরিত্র

জানতে পারবেন—এই মহাপুরুষেরাই রিকর্শেশনের প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গবন্ধু-সৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট !

হঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্মপরীচর দিয়ে নিয়েছি ; আমরা ক্রমে আরো যত ঘনিষ্ঠ হবো, ততই রং ও নক্সার মাজে মাজে সং সেজে আসবো—আপনারা যত পারেন হাততালি দেবেন ও হাসবেন !

মাহেশের স্নানযাত্রা

গুরুদাস গুঁই সেরুড কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্তিরি । তিরিশ টাকা মাইনে, এ সওয়ায় দশ টাকা উপরি রোজগারও আছে—গুরুদাসের চাঁপাতলা অঞ্চলে একটি খোলার বাড়ি ছিল ; পরিবারের মধ্যে এক বুড়ো মা, বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসি মাত্র ।

গুরুদাস বড় সাথরচে লোক, যা দশ টাকা রোজগার করেন, সকলই খরচ হয়ে যায় ; এমন কি কখন কখন মাস কাবারের পূর্বে গয়নাখানা ও জিনিসটে পস্তরটাও বাঁদা পড়ে ; বিশেষত শ্রাবণ মাসে ইলিস মাছ ওঠবার পূর্বে ঢালা ফালা পার্বণে গুরুদাসের দু মাসের মাইনেই খরচ হয়—ভাদ্র মাসের আরনন্দটি বড় ধূমে গ্যাচে, আর পিটেপার্বণেও দশ টাকা খরচ হয়েছিল—ক্রমে স্নানযাত্রা এসে পড়লো । স্নানযাত্রাটি পরবের টেকা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে ; সুতরাং স্নানযাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন । নাবা খাওয়ারও অবকাশ রইল না ; ক্রমে আরো পাঁচ ইয়ার জুটে গ্যালো । স্নানযাত্রায় কি রকম আমোদ হবে, তারি তব্বির ও পরামর্শ হতে লাগলো ; কেবল ছুংখের বিষয়—চাঁপাতলার হলধর বাগ, মতিলাল বিখেস ও হারাধন দাস, গুরুদাসের বুজুম ফ্রেণ্ড ছিলেন, কিন্তু কিছু দিন হলো হলধর একটা চুরি মামলায় গেরেণ্ডার হয়ে দু বছরের জন্ম জেলে গ্যাচেন, মতি বিখেস মদ খেয়ে পাত্কোর ভেতর পড়ে গিয়েছিল, তাতেই তাঁর দুটি পা ভেঙ্গে গিয়েচে, আর হারাধন গোটা কতক টাকা বাজার দেনার জন্ম ফরেশডাক্সায় সরে গ্যাচেন ; সুতরাং এবারে তাঁদের বিরহে স্নানযাত্রাটা ফাঁক্ ফাঁক্ লাগ্চে, কিন্তু তা হলে কি হয়—সম্বৎসরের আমোদটি বন্দ করা কোন ক্রমেই হতে পারে না বলেই নিতান্ত গম্মিতে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রায় যাবার আয়োজন কত্তে হয় !

এদিকে পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে সকল রকম জিনিষের আয়োন হতে লাগলো—গোপাল দৌড়ে গিয়ে একখানি বজরা ভাড়া করে এলেন । নবীন আর্জুরী,

আনিম, রম ও গাঁজার ভার নিলেন। ব্রজ ফুলুরি ও বেগুনভাজার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবি খিলির দোনা, মোম বাতি ও মিটে কড়া তামাক ও আর আর জিনিষপত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখলেন। কাল রাত্তিরের জোয়ারে নৌকায় ওঠা হবে স্থির হলো।

পূর্বের স্নানযাত্রার বড় ধুম ছিল—বড় বড় বাবুয়া পিনেস, কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় বাচখ্যালা হতো, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে খ্যামটা ও বাইয়ের হাট লেগে যেতো! কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুঁতর, কাঁসারি, কামার ও গজাবেণে মশাইরাই যা রেখেচেন, মধ্যে মধ্যে ছ'চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নানযাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন কোন ছোকরা গোছের নতুন বাবুয়াও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।

ক্রমে সে দিনটি দেখতে দেখতে গ্যালো। ভোর না হতে হতেই গুরুদাসের ইয়াররা সেজে গুজে তৈরি হয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। গোপাল এক জোড়া লাল রঙ্গের এষ্টকীং (মোজা) পায়ে দিয়েছিলেন, পেতলের বড় বড় বোদাম দেওয়া সবুজ রঙ্গের একটি ফতুই ও গুলদার ঢাকাই উড়ুনি তাঁর গায়ে ছিল, আর একটি বিলিভী পেতলের শিল আংটিও আঙ্গুলে পরেছিলেন—কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিনতে পারেন নাই বলেই সুত্থ পায়ে আসা হয়। নবীনের ফুলদার ঢাকাই চাদরখানি বহুকাল ধোপার বাড়ি যায় নি, তাতেই যা একটু ময়লা ময়লা বোধ হচ্ছিল, নতুবা তাঁর চার আঙ্গুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই দিন মাত্র পাটভাঙ্গা হয়েছিল—মেরজাটটিও বিলক্ষণ ধোবো ছিল। ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্ণে কৰ্ম্ম হয়েছে, বয়সও অল্প, সুতরাং আজো ভালো কাপড় চোপড় করে উঠতে পারেন নি, কেবল গত বৎসর পূজোর সময় তাঁর আই ন সিকে দিয়ে যে ধুতি চাদর কিনে ছায়, তাই পরে এসেছিলেন, সেগুলি আজো কোরা থাকায় তাঁরে দেখতে বড় মন্দ দেখায় নি। আরো তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বন্ধেই হয়—বলতে কি, তিনি তো বেশী দিন পরেন নি, কেবল পূজোর সময় সপ্তমী পূজোর এক দিন পরে গোকুল দাঁয়ের প্রতিমে দেখতে গিয়েছিলেন—ভালান দেখতে যাবার সময় একবার পরেন, আর হাটখোলার যে সেই ভারী বারোইয়ারি পূজো হয়, তাতেই একবার পরে গোপালে উড়ের যাত্রা শুনতে গেছিলেন—তা ছাড়া অমনি সিকের উপর হাঁড়ির মধ্যে তোলাই ছিল।

ইয়ারেরা আসবামাত্র গুরুদাস বিছেনা থেকে উঠে দাওয়ায় বসলেন। নবীন,

গোপাল ও ব্রজও খুঁটি ঠাসান দিয়ে উপু হয়ে বসলেন। গুরুদাসের মা চকমকি, শোলা, টিকে ও তামাকের মেটে বাস্তি বার করে দিলেন। নবীন চকমকি ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজলেন। ব্রজ পাতকোতলা থেকে ছাঁকোটি ফিরিয়ে এনে দিলেন; সকলেরই এক একবার তামাক খাওয়া হলো। গুরুদাস তামাক খেয়ে হাত মুক ধুতে গ্যালেন; এমন সময়ে ঝম্ ঝম্ করে এক পসলা ভারী বৃষ্টি এলো, উঠনের ব্যাংগুলো থপ্ থপ্ করে নাপাতে নাপাতে দাওয়ায় উঠতে লাগলো; নবীন, গোপাল ও ব্রজ তারি তামাসা দেখতে লাগলেন। নবীন একটি সখের গাওনা জুড়ে দিলেন।

“সখের বেদেনী বলে কে ডাকলে আমারে!”

বর্ষাকালের বৃষ্টি মানুষের অবস্থার মত অস্থির। সর্বদাই হচ্ছে যাচ্ছে তার ঠিকানা নাই—ক্রমে বৃষ্টি থেমে গ্যালো। গুরুদাসও হাত মুখ ধুয়ে এসেই মাকে খাবার দিতে বসলেন; ঘরে এমন তৈরি খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পাস্তা ভাত আর তেঁতুল দিয়ে মাছ ছিল, তাঁর মা তাই চারখানি মেটে খোরায় বেড়ে দিলেন, গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহুমান করে খেলেন।

পূর্বের স্থির হয়েছিল, রাস্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে, কিন্তু স্নানযাত্রাটি যে রকম আমোদের পরব, তাতে রাস্তিরের জোয়ারে গেলে স্নানযাত্রার দিন ব্যালা ছপুরের পর মাহেশ পৌঁছুতে হয়, স্মুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হলো।

এদিকে গির্জের ঘড়িতে টুং টাং, টুং টাং করে দশটা বেজে গ্যালো। নবীন, ব্রজ, গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে, পানতামাক খেয়ে, তোবড়া-তুবড়ি নিয়ে, ছুর্গা বলে যাত্রা করে বেরলেন। তাঁর মা একখানি পাখা ও ছুটি ধামি কিনে আনতে বসলেন, তাঁর স্ত্রী পূর্বের রাস্তিরে একটি চিত্তির করা হাঁড়ি ঘুনসি ও গুরিয়া পুতুল আনতে বলেছিল, আর তাঁর বিধবা পিসির জন্ত একটি খাজা কোয়াওলা ভাল কাঁঠাল, কানাইবাঁশী কলা ও কুলী বেগুন আনতে প্রীতিশ্রুত হয়েছিলেন।

গুরুদাসের পোসাকটিও নিতাস্ত মন্দ হয় নি, তিনি একখানি সরেস গুলদার উড়ুনি গায়ে দিয়েছিলেন, উড়ুনিখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাটের কুচো বান্ধবার দরুন চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচে গেছে—তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিভী ঢাকা প্যাটনের পিরান ছিল, তার ওপর ব্লু রঙ্গের একটি হাপ চায়নাকোট—তিনি “বেঁচে থাকুক বিদ্দেশাগর চিরজীবী হয়ে” পেড়ে এক শাস্তিগুরে ফরমসে ধুতি পরেছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও রূপোর বকলস্ দেওয়া ছিল।

ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌঁছিলেন। সেখান

কৈদার, জগ, হরি ও নারায়ণ তাঁদের জন্তু অপেক্ষা করে ছিল ; তখন সকলে একত্র হয়ে বজরায় উঠলেন । মাজিরা শুটকী মাছ, লক্ষা ও কড়ায়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসেছিল । জোয়ারও আসে নাই ; সুতরাং কিছু ক্ষণ নৌকো খুলে দেওয়া বন্দ রইলো ।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকায় উঠেই আয়েস জুড়ে দিলেন । গোপাল সমুপর্ণে জবাবির চোপলের শোলার ছিপিটি খুলে ফেলেন । ব্রজ এক ছিলিম গাঁজা তৈরি কন্তে বসলেন—আতুরী ও জবাবির চলেতে শুরু হলো । ফুলুরি ও বেগুনভাজীরা সে কালের সতী স্ত্রীর মত আতুরীদের সহগমন কন্তে লাগলেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠলো—এদিকে নারায়ণ ও কৈদার বাঁয়ার সঙ্গতে—

“হেঁসে খেলে নেও রে যাদু মনের সুখে ।

কে কবে, যাবে শিঙ্গে ফুঁকে ।

তখন কোথা রবে বাড়ি, কোথা রবে জুড়ি,

তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে ছায় ট্যাকে ।

তখন হুড়ো জেলে দেবে ও চাঁদমুখে ॥”

গান জুড়ে দিলেন—ব্রজ খাজায় দম্ মেয়ে আড়ষ্ট হয়ে জোনাকি পোকা দেখতে লাগলেন, গোপাল ও গুরুদাসের ফুর্তি ছাখে কে !

এদিকে সহরেও স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধুম পড়ে গ্যাচে । বুড়ি বুড়ি মাগী, কলাবউয়ের মত আধ হাত ঘোমটা দেওয়া ক্ষুদে ক্ষুদে কনে বউ ও বুকের কাপড় খোলা হাঁ করা ছুঁড়ীরা রাস্তা জুড়ে স্নানযাত্রা দেখতে চলেচে ; এমন কি বাস্তায় গাড়ি পালকি চলা ভার, আজ সহরে কেরাণী গাড়ির ঘোড়ায় কত ভার চীনতে পারে, তার বিবেচনা হবে না, গাড়ির ভেতর ও পেছনে কত তাংড়াতে পারে, তারই তক্রার হচ্ছে—এক একখানি গাড়ির ভেতর দশ জন, ছাতে দু জন, পেছনে একজন ও কোচবাক্সে দু জন—একুনে পোনের জন, এ সওয়ায় তিনটি করে আঁতুড়ে ছেলে ফাও ! গেরস্তর মেয়েরাও বড় ভাই, খুস্তর, ভাতার, ভাদ্রবউ ও শাশুড়ীতে একত্র হয়ে গ্যাচেন । জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন—অনেকেই কেঁট সাজবেন !

গজারও আজ চূড়ান্ত বাহার ; বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌গিজ্‌ কচ্ছে, সকলগুলি থেকেই মাতলামো রং, হাসি ও ইয়ারকির গব্বা উঠছে, কোনটিতে খ্যামটা নাচ হচ্ছে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভেঁা হয়ে রং কচ্ছেন ; মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেলাদে পুতুলের মত ও তেলের কুপোর

মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট চোলের মত গুটি দশ মাছুলি ও কোমরে গোট, ফিন্ফিনে ধুতি পরা ও পৈতের গোচা গলায়—মৈমনসিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে থাকা সেজে ত্যাকামি কচেন ; বয়েস ষাট পেরিয়েচে, অথচ ‘রাম’কে ‘আম’ ও ‘দাদা’ ও ‘কাকা’কে ‘দাদা’ ‘কাঁকা’ বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে ‘বিছোংসাহী’ কব্‌লান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও ব্যালা চারটে অবধি পূজা করেন। অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সুর্য্যোদয় দেখেচেন কি না সন্দেহ !

কোন পিনেসে এক দল সহরে নব্য বাবুর দল চলেচেন, ইংরাজি ইম্পিচে লিড্‌নি মন্ডের শ্রাদ্ধ হচ্ছে, গাওনার সুরে জলও জমে যাচ্ছে।

কোন পান্‌সিখানিতে এক জন তিলকাঞ্জে নবশাখ বাবু মোসাহেব ও মেয়েমানুষের অভাবে পিস্ততো ভাই, ভাগ্নে ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে চলেচেন—বাঁয়া নাই, গোলাবী থিলি নাই, এমন কি, একটা থেলো হুকোরও অপ্রতুল—তবু এমনি খোসমেজাজ, এমনি সক যে, পানসির পাটাতনের তক্তা বাজিয়ে গুন গুন করে গাইতে গাইতে চলেচেন, যেমন করে হোক কায়ক্‌শে শুদ্ধ হওয়াটা চাই।

এদিকে আমাদের নায়ক গুরুদাস বাবুর বজরায় মাজিদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে ; দুপুরের নমাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে, এমন সময় গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ্য করে বলেন, “ছাখ্‌ ভাই গুরুদাস ! আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েছে, কিন্তু একটার জন্তে বড় ফাঁক ফাঁক ছাখাচ্ছে ; সবই হয়েছে, কেবল মেয়েমানুষ না হলে তো স্নানযাত্রায় আমোদ হয় না ! যা বল, যা কও”—অমনি কেদার “ঠিক বলেছ বাপ !” বলে কথার থি ধরে নিলেন ; অমনি নারাণ বলে উঠলেন, “বাবা, যে নৌকোখানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষ্মি ! আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিতে গয়া কাশী যাচ্ছি।”

গুরুদাসের মেজাজ আলি হয়ে গ্যাচে, স্মৃতরাং “বাবা ঠিক বলেছ ! আমিও তাই ভাবছিলাম ; ভাই ! যত টাকা লাগে, তোমরা তাই কব্‌লে একটা মেয়েমানুষ নে এসো, আমি বাবা তাতে পেচ্পাও নই, গুরুদাসের সাদা জ্ঞাণ !” এই কথা বলতে না বলতেই নারাণ, গোপাল, হরি ও ব্রজ নেচে উঠলেন ও মাজিদের নৌকো খুলতে মানা করে দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরলেন।

এদিকে গুরুদাস, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা চীৎকার করে—

“যাবি যাবি যমুনা পারে ও রজিণী ।

কত দেখ'বি মজা রিস্‌ড়ের ঘাটে শামা বামা দোকানী ।

কিনে দেবো মাতা ঘষা, বারুইপুরে ঘুনসি খামা,

উভয়ের পুরাবি আশা, ও সোনামণি ॥”

গান ধরেচেন, এমন সময় মেকিণ্টশ বরন্ কোম্পানির ইয়ার্ডের ছুতরেরা এক বোট ভাড়া করে রাঁড় নিয়ে আমোদ কস্তে কস্তে যাচ্ছিল ; তারা গুরুদাসকে চিনতে পেলে তাদের নৌকো থেকে—

“চুপে থাক্ থাক্ থাক্ রে ব্যাটা কানায়ে ভাগে ।

গরু চরাস্ লাঙ্গল ধরিস্, এতে তোর স্নাতো মনে ॥”

গাইতে গাইতে ছব্রে ও হরিবোল দিয়ে সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গ্যালো ; গুরুদাসেরাও ছুউও ও হাততালি দিতে লাগলেন ; কিন্তু তাঁর নৌকায় মেয়েমানুষ না থাকাতে সেটি কেমন ফাঁক্ ফাঁক্ বোধ হতে লাগলো ! এদিকে বোটওয়ালারাও চেপে ছুউও ও হাততালি দিয়ে তাঁরে যথার্থই অপ্রস্তুত করে দে গ্যালো ।

গুরুদাস নেশাতেও বিলক্ষণ পেকে উঠেছিলেন, স্নুতরাং ওরা ঠাট্টা করে আগে বেরিয়ে গ্যালো, ইটি তিনি বরদাস্ত কস্তে পাল্লেন না । শেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ারদের অপেক্ষা না করে টল্‌তে টল্‌তে আপনিই মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরুলেন, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা

“আয় আয় মকর গজ্জাজল ।

কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে যাবো জল ।

গোলাপ ফুলের হাতটি ধরে, চলে যাবো সোহাগ করে,

ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নেচে ঝুম্‌ঝামাবে মল ॥”

গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন ।

ঘণ্টাখানেক হলো গুরুদাস নৌকা হতে গ্যাচেন, এমন সময় ব্রজ ও গোপাল ফিরে এলেন । তাঁরা সহরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেচেন, কিন্তু কোথাও এক জন মেয়েমানুষ পেলেন না ; তাঁদের জানত ও সহরের ছোটো গোছের বাছতে বাকী করেন নাই । কেদার এই খবর শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, (জয়কেষ্টো মুখুয্যের জেলে যাওয়াতে তাঁর প্রজাদেরও এত দুঃখ হয় নাই, রাবণের হাতে রামের কাটা মুণ্ড দেখে অশোকবনে সীতে কত বা দুঃখিত হয়েছিলেন ?) ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন ।

হৃৎপিণ্ডের পাখী উড়ে এলো কার ।

হারা করে ধ্বংসে সখি দিয়ে পীরিতের আধার ॥

কোন কামিনীর পোষা পাখী, কাহারে দিয়েছে কঁাকি,

উড়ে এলো দাঁড় ছেড়ে শিকলিকাটা ধরা ভার ॥

এমন সময় গুরুদাসও এসে পড়লেন—গুরুদাস মনে করেছিলেন যে, যদি তিনিই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান নাই পেলেন—তঁার ইয়ারেরা একটা না একটাকে অবশ্যই জুটিয়ে থাকবে। এদিকে তঁার ইয়ারেরা মনে করেছিলেন, যদিও তঁারাই কোন মেয়েমানুষের সন্ধান কতে পাল্লেন না, গুরুদাস বাবু আর ছেড়ে আসবেন না। এদিকে গুরুদাস নৌকোয় এসেই মেয়েমানুষ না, দেখতে পেয়ে মহাচুপিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু নেশার এমনি অনির্বচনীয় ক্ষমতা যে, তাতেও তিনি উৎসাহহীন হলেন না; গুরুদাস পুনরায় ইয়ারদের স্তোক দিয়ে মেয়েমানুষের সন্ধানে বেরলেন। কিন্তু তিনি কোথায় গেলে পূর্ণমনোরথ হবেন, তা নিজেও জানতেন না, বোধ হয় তিনি যার অধীন ও আত্মাভাববর্তী হয়ে যাচ্ছিলেন, কেবল তিনি মাত্র সে কথা বলতে পারতেন। গুরুদাসকে পুনরায় যেতে দেখে তঁার ইয়ারেরাও তঁার পেছনে পেছনে চললেন। কেবল নারায়ণ, ব্রজ ও কেশব নৌকায় বসে অত্যন্ত দুঃখেই—

“নিশি যায় হায় হায় কি করি উপায় ।

শ্যাম বিহনে সখি বুঝি প্রাণ যায় ॥

হার হার শশধর অন্তাচলগত সখি,

প্রফুল্লিত কমলিনী, কুমুদ মলিনমুখী,

আর কি আসিবে কাস্ত তুষিতে আমায় ॥”

গাইতে লাগলেন—মাজিরা “জুয়ার বই যায়” বলে বারম্বার ত্যক্ত কতে লাগলো। জলও ক্রমশ উড়োনচণ্ডীর টাকার মত জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগলো—ইয়ারদলের অসুখের পরিসীমা রইলো না !

গুরুদাস পুনরায় সহরটি প্রদক্ষিণ করলেন—সিঁহুরেপটী, শোভাবাজারের ও বাগবাজারের সিঁকেখরীতলাটাও দেখে গ্যালেন, কিন্তু কোনখানেই সংগ্রহ কতে পাল্লেন না—শেষে আপনার বাড়িতে ফিরে গ্যালেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, গুরুদাসের এক বিধবা পিসি ছিল। গুরুদাস বাড়ি গিয়ে তঁার সেই পিসিরে বল্লেন যে, “পিসি ! আমাদের একটি কথা রাখতে হবে।” তঁার পিসি বল্লেন, “বাপু গুরুদাস ! কি কথা রাখতে হবে ? তুমি একটা কথা বল্লেন আমরা কি রাখবো না ! আগে বল দেখি কি কথা ?” গুরুদাস বল্লেন,

“পিসি, যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখতে যাও, তা হলে বড় ভাল হয়। দেখ পিসি, সকলেই একটি ছুটি মেয়েমানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্ছে, কিন্তু পিসি আমাদের একটিও মেয়েমানুষ জুটে ওঠে নাই—দেখ পিসি শুভুই বা কেমন করে যাওয়া হয়, আমার নিজের জ্ঞান যেন না হলো, কিন্তু পাঁচো ইয়ারের শুধু নিরিষিষি রকমে যেতে মন সচে না—তা পিসি আমোদ কস্তে কস্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাধ্য তোমারে কেউ কিছু বলে।” পিসি এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁই শুই কস্তে লাগলেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, সুতরাং শেষে গুরুদাস ও ইয়ারদের নিতান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গ্যালেন।

ক্রমে পিসিকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌঁছিলেন; নৌকার ইয়াররা গুরুদাসকে মেয়েমানুষ নিয়ে আসতে দেখে ছবরে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাঁয়ায় দামামার ধ্বনি কস্তে লাগলো, শেষে সকলে নোকায় উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়িরা কসে ঝপাঝপ্ ঝপাঝপ্ করে দাঁড় বাইতে লাগলো, মাজি হাল বাগিয়ে ধরে সজোরে দেদার ঝাঁকে মাত্তে লাগলো। গুরুদাস ও সমস্ত ইয়ারে

“ভাসিয়ে প্রেমতরী হরি যাচ্ছে যমুনায়

গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।

আরে ও! কদমতলায় বসি বাঁকা বাঁশরী বাজায়,

আর মুচ্কে হেঁসে নয়নঠারে কুলের বউ ভুলায় ॥

হুড়ু হো! হো! হো!”

গাইতে লাগলেন, দেখতে দেখতে নৌকোখানি তীরের মত বেরিয়ে গ্যালো।

বড় বড় যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ ছপূরের জোয়ারে নৌকো ছেড়েচেন। এদিকে জোয়ারও মরে এলো, ভাঁটার সারানী পড়লো—নোঙ্গর করা ও ধোঁটায় বাঁধা নৌকোগুলির পাছা ফিরে গ্যালো—জেলেরা ডিজি চড়ে বেঁউতি জাল তুলতে আরম্ভ কল্লে, সুতরাং যিনি যে অবধি গ্যাচেন, তাঁরে সেইখানেই নোঙ্গর কস্তে হলো—তিলকাধুনে বাবুদের পানসি, ডিজি, ভাউলে, বজরা ও বোট বাজার পোট্ট জায়গায় ভিড়ানো হলো—গয়নার যাত্রীরা কিনেরার পাশে পাশে লগি মেরে চল্লেন। পেনেটি কামারহাটি কিনা খড়ময়ে জলপান করে খেয়া দিয়ে যাহেশ পৌঁছুবেন!

ক্রমে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, অভিসারিণী সন্ধ্যা অন্ধকারের অনুরাগে বেকলেন, প্রিয়সখী প্রকৃতি প্রিয় কার্যের অবসর বুঝে ফুলদাম উপহার দিয়ে বাসরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কল্লেন, বায়ু মৃদু মৃদু বীজন করে পথক্লেশ দূর কস্তে লাগলেন, বক ও

বাংলাহাঁসেরা শ্রেণী বেঁধে চলো, চক্রবাকমিথুনের কাল সময় প্রদোষ, সংসারের সুখ বর্ধনের জন্ত উপস্থিত হলো ; হায় ! সংসারের এমনি বিচিত্র গতি যে কোন কোন বিষয় একের অপার দুঃখাবহ হলেও শতেকের সুখাস্পদ হয়ে থাকে ।

পাড়াগাঁ অঞ্চলের কোন কোন গাঁয়ের বওয়াটে ছোঁড়ারা যেমন মেয়েদের সাজ সকালে ঘাটে যাবার পূর্বের পথের ধারের পুরনো শিবের মন্দির, ভাঙ্গা কোটা, পুকুরপাড় ও ঝোপে ঝোপে লুকিয়ে থাকে—তেমনি অন্ধকারও এতক্ষণ চাষি দেওয়া ঘরে, পাত্‌কোর ভেতরে ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন—এখন শাঁক ঘন্টার শব্দে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বেরুলেন—তাঁর ভয়ানক মূর্তি দেখে রমণীস্বভাবমূলত শালীনতায় পদ্ম ভয়ে ঘাড় হেঁট করে চক্ষু বুজে রইলেন, কিন্তু ফচকে ছুঁড়ীদের আঁটা ভার—কুমুদিনীর মুখে আর হাসি ধরে না । নোঙ্গর করা ও কিনারার নৌকোগুলিতে গঙ্গাও কথনাতীত শোভা পেতে লাগলেন, বোধ হতে লাগলো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমালা ধারণ করে নাচতে লেগেচেন । বায়ুচালিত ঢেউগুলি তবলা বাঁয়ার কাজ কচে—কোনখানে বালির খালের নীচে একখানি পিনাস নোঙ্গর করে বসেচেন—রকমারি বেধড়ক চলচে, গঙ্গার চমৎকার শোভায় মূহু মূহু হাওয়াতে ও ঢেউয়ের ঈষৎ দোলায়, কারু কারু শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে, কেউ বা ভাবে মজে প্রবী রাগিণীতে—

“যে যাবার সে যাক্‌ সখি আমি তো যাবো না জলে ।

যাইতে যমুনাজলে, সে কালা কদম্বতলে,

আঁখি ঠেঁরে আমায় বলে, মালা দে রাই আমার গলে !”

গান ধরেচেন, কোনখানে এইমাত্র একখানি বোট নোঙ্গর কল্লে—বাবু ছাতে উঠলেন, অমনি আর আর সঙ্গীরাও পেছনে পেছনে চলো ; এক জন মোসাহেব মাজিদের জিজ্ঞাসা কল্লেন, “চাচা ! এ জায়গাটার নাম কি ?” অমনি বোটের মাজি হজুরে সেলাম ঠুকে “আইগেঁ কাশীপুর কর্তা ! এই রতন বাবুর গাট” বলে বকসিসের উপক্রমণিকা করে রাখলে । বাবুর দল ঘাট শুনে হাঁ করে দেখতে লাগলেন ; ঘাটে অনেক বউ ঝি গা ধুচ্ছিলো, বাবুদলের চাউনি হাসি ও রসিকতায় ভর ও লক্ষ্য জড়সড় হলো, ছ একটা পোষ মান্‌বারও পরিচয় ছাখাতে ক্রটি কল্লে না—মোসাহেব দলে মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত ; বাবুর প্রধান ইয়ার রাগ ভেঁজে—

অল্পগত আশ্রিত তোমার ।

রেখো রে স্নিহিত আমার ॥

অন্ত ঋণ হলে, বাঁচিভাম পলালে,
এ ঋণে না মলে, পরিশোধ নাই ।
অতএব তার, ভার ভোমার,
দেখো রে করো নাকো অবিচার ॥

গান জুড়ে দিলেন—সন্ধ্যা আফ্রিকওয়ালা বুড়ো বুড়ো মিন্‌ষেরা, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে, নিষ্কর্যা মগীরা ঘাটের ওপর খাতা বেঁধে দাঁড়িয়ে গ্যালো ; বাবুরাও উৎসাহ পেয়ে সকলে মিলে গাইতে লাগলেন—মড়া থেকে কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠলো, চরস্তী শোয়ারগুলো ময়লা ফেলে ভয়ে ভোঁৎ ভোঁৎ করে ধোঁয়াড়ে পালিয়ে গ্যালো ।

কোন বাবুর বজরা বরানগরে পাটের কলের সামনেই নোঙ্গর করা হয়েছে, গাঁয়ের বওয়াটে ছেলেরা বাবুদের রঙ্গ ও সঙ্গের মেয়েমানুষ দেখে ছোট ছোট ভুড়ি পাখর, কাদা ও মাটির চাপ ছুড়ে আমোদ কস্তে লাগলো, স্ততরাং সে ধারের খড়-খড়গুলো বন্ধ করতে হলো—আরো বা কি হয় ।

কোন বাবুর ভাউলেখানি রাসমণির নবরত্নের সামনে নোঙ্গর করেছে, ভেতরের মেয়েমানুষরা উকি মেরে নবরত্নটি দেখে নিচ্ছে ।

আমাদের নায়ক বাবু গুরুদাস বাগবাজারের পোলের আশেপাশেই আছেন ; তাঁদের বাঁয়ার এখনো আওয়াজ শুনা যাচ্ছে, আতুরী ও আনীসদের বেশীর ভাগ আনাগোনা হচ্ছে—আনীস ও রমেদের মধ্যে বাঁরা গেছলেন, তাঁরাই ছনো হয়ে বেরিয়ে আসচেন—ফুলুরি ও গোলাপী খিলিরা দেবতাদের মত বর দিয়ে অস্ত্রধান হয়েচেন, কারু কারু তপস্কার ফললাভও শুরু হয়েছে—স্নেহময়ী পিসি ঝাঁচল দিয়ে বাতাস কচ্ছেন, নৌকোখানি অন্ধকার ।

এমন সময় ঝম্ ঝম্ করে হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি এলো, একটা গোলমালে হাওয়া উঠলো, নৌকোর পাছাগুলি ছলতে লাগলো—মাজিরা পাল ও চট মাখায় দিয়ে বৃষ্টি নিবারণ কস্তে লাগলো, রাস্তির প্রায় দুপুর ।

সুখের রাস্তির দেখতে দেখতেই যায়—ক্রমে সুখ-তারার সিঁতি পরে হাঁসতে হাঁসতে উষা উদয় হলেন, চাঁদ তারাদল নিয়ে আমোদ কচ্ছিলেন, হঠাৎ উষারে দেখে লজ্জায় শ্লান হয়ে কাঁপতে লাগলেন, কুমুদিনী ঘোমটা টেনে দিলেন, পূর্ব দিক্ ফব্বসা হয়ে এলো, “জোয়ার আইচে” বলে মাজিরা নৌকো খুলে দিলে—ক্রমে সকল নৌকোয় সার বেঁধে মাহেশ ও বল্লভপুরে চল্লো । সকলখানিই এখনো রং পোরা, কোন কোনখানিতে গলাভাঙ্গা সুরে—

“এখনও রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ ।

কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর হোক নিশি অবসান ॥

যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে স্বাক্ষর দিত,

কুমুদী মুদিত হতো, শশী যেতো নিজ স্থান ॥”

শোনা যাচ্ছে । কোনখানি কফিনের মত নিঃশব্দ—কোনখানিতে কাম্মার শব্দ—
কোথাও নেশার গৌঁ গৌঁ শ্বনি ।

যাত্রীদের নৌকো চল্লো, জোয়ারও পেকে এলো, মালারা জাল ফেলতে আরম্ভ
কল্লে—কিনারায় সহরের বড়মানুষের ছেলেদের টুকপি ধোপার গাধা দেখা দিলে ।
ভট্টাচার্য্যরা প্রাতঃস্নান কস্তে লাগলেন, মাগী ও মিন্সেরা লজ্জা মাথায় করে কাপড়
তুলে হাগতে বসেচে, তরকারির বাজরা সমেত হেটোরা বদ্দিবাটী ও শ্রীরামপুরে
চল্লো, আড়খ্যেয়ার পাটুনীরে সিকি ও আধ পয়সায় পার কস্তে লাগলো, বদর ও
দফর গাজীর ফকিরেরা ডিঙ্গেয় চড়ে ভিক্ষে আরম্ভ কল্লে, সূর্য্যদেব উদয় হলেন দেখে
কমলিনী আহ্লাদে ফুটলেন, কিন্তু ইলিশ মাছ ধড়ফড়িয়ে মরে গ্যালেন, হায় !
পরশ্রীকাতরদের—এই দশাই ঘটে থাকে ।

যে সকল বাবুদের খড়দ, পেনেটি, আগড়পাড়া, কামারহাটী প্রভৃতি গঙ্গাতীর
অঞ্চলে বাগান আছে, আজ তাঁদেরো ভারী ধুম, অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে
গ্যাচে, কোথাও আজ শনিবার, কারু কদিনই জমাট বন্দোবস্ত—আয়েস ও
চোহেলের হৃদ ! বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে কারু কারু বাচ্ খ্যালাবার জন্ত
পানসি তৈরি, হাজার টাকার বাচ্ হবে, এক মাস ধরে নৌকোর গতি বাড়িবার জন্ত
তলায় চরু ঘষা হচ্ছে ও মাজিদের লাল উর্দি ও আগু পেছুর বাদশাই নিশেন
সংগ্রহ হয়েছে—গ্রামস্থ ইয়ারদল, খড়দর বাবুরা ও আর আর ভদ্রলোক মধ্যস্থ !
বোধ হয় বাদী মহিন্দর নফর—চীনেবাজারের ক্যাবিনেট মেকর—ভারি সৌখিন—
সকের সাগর বলেই হয় !

এদিকে কোন কোন যাত্রী মাহেশ পৌঁছুলেন, কেউ কেউ নৌকোতেই রইলেন,
ছুই এক জন ওপরে উঠলেন—মাঠে লোকারণ্য, বেদিমণ্ডপ হতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত
লোকের ঠেল মেরেচে ; এর ভেতরেই নানা প্রকার দোকান বসে গ্যাচে, ভিকিরীরা
কাপড় পেতে বসে ভিক্ষে কচ্ছে, গায়েরা গাচ্ছে, আনন্দলহরী, একতারা, খঞ্জনী ও
বাঁয়া নিয়ে বষ্টুমরা বিলক্ষণ পয়সা কুড়ুচ্ছে । লোকের হরুরা, মাঠের ধূলো ও
রোদের তাড় একত্র হয়ে একটি চমৎকার মেওয়া প্রস্তুত হয়েছে ; অনেকে তাই
দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদে সাধ করে সেবা কল্লে ।

ক্রমে ব্যালা ছুই প্রহর বেজে গ্যালো। সূর্য্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে যাচ্ছে ; গামছা, ক্রমাল, চাদর ও ছাতি ভিজিয়েও পার পাচ্ছে না। জগবন্ধু চাঁদমুখ নিয়ে বেদীর ওপর বসেচেন, চাঁদমুখ দেখে কুমুদিনীর ফোটা চুলোয় যাক্, প্রলয় তুফানে জেলেডিজির ভক্‌রা খাওয়ার মত সমাগত কুমুদিনীদের ছুঁর্দশা ছাথে কে !

ক্রমে ব্যালা প্রায় একটা বেজে গ্যালো। জগন্নাথের আর স্নান হয় না—দশ আনীর জমীদার “মহাশয়” বাবুরা না এলে জগন্নাথের স্নান হবে না। কিন্তু পচা আদা ঝালে ভরা—ঠাঁদের আর আসা হয় না, ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো, আশ পাশের গাছতলা, আমবাগান ও দাওয়া দরজা লোকে ভরে গ্যালো, অনেকের সর্দিগর্ম্মি উপস্থিত, কেউ কেউ শিঙ্গে ফুকলেন, অনেকেই ধুতরো ফুল দেখতে লাগলো। ডাব ও তরমুজে রণক্ষেত্র হয়ে গ্যালো, লোকের রম্মা দ্বিগুণ বেড়ে উঠলো, সকলেই অস্থির। এমন সময় শোনা গ্যালো, বাবুরা এসেচেন। অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী করে জল ঢালা হলো, যাত্রীরাও চরিতার্থ হলেন। চিড়ে, দই, মুড়ি, মুড়কি, চাটম কলা দেদার উঠতে লাগলো ; খোস্ পোসাকী বাবুরা খাওয়া দাওয়া কল্লেন। অনেকের আমোদেই পেট ভরে গ্যাচে, স্তূতরাং খাওয়া দাওয়া আবশ্যক হলো না। কিছু ক্ষণ বিশ্রামের পর তিনটে, শেষে চারটে বেজে গ্যালো। বাচখ্যালা আরম্ভ হলো—কার নৌকা আগে গিয়ে নিশেন নেয়, এরি তামাসা ছাখবার জন্ত সকল নৌকোই থুলে দেওয়া হলো, অবশ্যই এক দল জিতলেন ; সকলে জুটে হারের হাততালি ও জিতের বাহবা দিলেন, স্নানযাত্রার আমোদ ফুরলো। সকলে বাড়িমুখো হলেন, যত বাড়ি কাছে হতে লাগলো ততই গর্ম্মিবোধ হতে লাগলো। শেষে কাশীপুরের চিনির কল, বালির ব্রিজ, কেউ পার হয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে উঠলেন, কেউ বাগবাজার ও আইরিটোলার ঘাটে নাবলেন। সকলেরই বিষগ্ন বদন—স্নান মুখ ; অনেককেই ধরে তুলতে হলো ; শেষ চার পাঁচ দিনের পর আমোদের নাগাড় মরে—ফিরতি গোলের দরুন আমরা গুরুদাস বাবুর নৌকোখানা বেছে নিতে পাল্লেন না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।



“হতোম প্যাঁচা আশ্মানে বসে
নকশা উড়োছেন।”

ছতান পাঁচান নকশা

দ্বিতীয় ভাগ

রথ

হে সজ্জন ! স্বভাবের সুনির্মল পটে,
রহস্ত রসের রঙ্গে,
চিত্রিচ্চ চরিত্র—দেবী সরস্বতী বরে ।
কৃপাচক্ষে হের একবার ; শেষে বিবেচনা মতে
যার যা অধিক আছে ‘তিরস্কার’ কিম্বা ‘পুরস্কার’
দিও তাহা মোরে—বল্ মানেন লব শির পাতি ।

স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো, গুরুদাস গুঁই গুলদার উড়ুনি পরিহার করে
পুনরায় চিরপরিচিত র্যাঁদা ও ঘিস্কাপ ধরেন । ক্রমে রথ এসে পড়লো ।
ক্যাভো ব্যাভো পরব প্রলয় বড়ুটে ; এতে ইয়ারকির লেশমাত্র নাই, সুতরাং সহরে
রথ পার্শ্বণে বড় একটা ঘটা নাই ; কিন্তু কলিকাতায় কিছুই ফাঁক যাবার নয় ; রথের
দিন চিংপুর রোড লোকারণ্য হয়ে উঠলো, ছোট ছোট ছেলেরা বার্নিসকরা জুতো ও
সেপাইপেড়ে ঢাকাই খুতি পরে, কোমরে রুমাল বেঁধে, চুল ফিরিয়ে, চাকর
চাকরাণীদের হাত ধরে, পয়নালা ওপর পোদ্দারের দোকানে ও বাজারের বারাণ্ডায়
রথ দেখতে দাঁড়িয়েছে । আদ্যবয়সী মাগীরা খাতায় খাতায় কোরা ও কলপ, দেওয়া
কাপড় পরে রাস্তা জুড়ে চলেছে ; মাটির জগন্নাথ, কাঁঠাল, তালপাতের ভেঁগু,
পাখা ও সোলায় পাখি বেধড়ক বিক্রি হচ্ছে ; ছেলেদের দেখাদেখি বড়ো বড়ো
মিন্সেরাও তালপাতের ভেঁগু নিয়ে বাজাচ্ছেন ; রাস্তায় ভেঁ। পৌ। ভেঁ। পৌ। শব্দের
ভূকান উঠেচে—ক্রমে ঘণ্টা, হরিবোল, খোল, খতাল ও লোকের গোলের সঙ্গে
একখানা রথ এলো—রথের প্রথমে পেটা ঘড়ি, নিশান, খুস্তি, ভোড়োং ও নেড়ীর
কবি ; তার পর বৈরাগীদের ছু তিন দল নিম্খাসা কেন্দন, তার পেছনে সকের
সংকীর্তন গাওনা ; দোয়ার দলের সঙ্গে বড় বড় আঁচালার মত গোলপাতার ছাতা

ও পাখা চলেচে, আশে পাশে কর্মকর্তারা পরিব্রাস্ত ও গলদ্বর্ষ—কেউ নিশান ও রেশালার মিলে ব্যতিব্যস্ত, কেউ পাখার বন্দোবস্তে বিভ্রত, সখের সংকীর্ণনওয়ালারা গোছসই বারাগুর নীচে, চোমাখার ও চকের সাম্নে থেমে থেমে গান করে যাচ্ছেন, পেছনে চোতাদারেরা চৌচিয়ে হাত নেড়ে গান বলে দিচ্ছেন, দোয়ারেরা কি গাচ্ছেন, তা তাঁরা ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পাচ্ছেন না। দর্শকদের ভিড়ের ভিতর একটা মাতাল ছিল, সে রথ দর্শন করে ভক্তিভরে মাত্লাম সুরে

কে মা রথ এলি ?

সর্ব্বাঙ্গে পেরেক মারা ঢাকা ঘুরঘুরালি ।

মা তোর সাম্নে ছুটো ক্যোটো ঘোড়া,

চুড়োর উপর মুক্শোড়া,

চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া,

মধ্যে বনমালী ।

মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা,

লোকের টানে চল্চে ঢাকা,

আগে পাছে ছাতা পাখা,

বেহুদ ছেনালি ।

গানটি গেয়ে, “মা রথ ! প্রণাম হই মা !” বলে প্রণাম কল্লে । এদিকে রথ হেলতে ছলতে বেরিয়ে গ্যালো ; ক্রমে এই রকমে ছু চারখানা রথ দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে পড়লো—গ্যাস্ জ্বালা যুটেরা মই কাঁদে করে ছাখা দিলে, পুলিশের পাসের সময় ফুরিয়ে এলো, দর্শকেরাও যে যার ঘরমুখো হলেন ।

মাহেশে স্নানযাত্রায় যে প্রকার ধুম হয়, রথে তত হয় না বটে ; তবু ক্যালা যায় না ।

এদিকে সোজা ও উলটো রথ ফুরাল, আবণ মাসে ঢালা ক্যালা পার্বণ, ভাঁজ মাসের অরক্ষন ও জম্বাষ্টমীর পর অনেক জামগায় প্রতিমের কাঠামোয় ঘা পড়লো, ক্রমে কুমোররা নারেকবাড়ি একমেটে, দোমেটে ও তেমেটে করে বেড়াতে লাগলো । কোলা ব্যাঙেরা ফ্রোড়্, কোঁ ফ্রোড়্, কোঁ ফ্রোড়্, কোঁ শব্দে আগমনী গাইতে লাগলো ; বর্ষা জীবের আঁটি, কাঁটালের ভুতুড়ি ও তালের এঁশো খেয়ে বিদের হলেন—দেখতে দেখতে পুজো এলো ।

দুর্গোৎসব

দুর্গোৎসব বাঙ্গালা দেশের পরব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এর নাম গন্ধও নাই ; বোধ হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হতেই বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রাচুর্য্য বাড়ে। পূর্বে রাজারাজড়া ও বনেদী বড় মানুষদের বাড়িতেই কেবল দুর্গোৎসব হতো, কিন্তু আজকাল পুঁটে তেলীকেও প্রতিমা আনতে ছাধা যায় ; পূর্ব্বকার দুর্গোৎসব ও এখনকার দুর্গোৎসবে অনেক ভিন্ন।

ক্রমে দুর্গোৎসবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়লো ; কৃষ্ণনগরের কারিকরেরা কুমারটুলী ও সিদ্ধেশ্বরীতলা জুড়ে বসে গ্যালো, জায়গায় জায়গায় রংকরা পাটের চুল, তবলকীর মালা, টিন ও পেতলের অশুরের ঢাল তলওয়ার, নানা রঙ্গের ছোবান প্রতিমের কাপড় ঝুলতে লাগলো ; দজ্জীরা ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটী নিয়ে দরোজায় দরোজায় বেড়াচ্ছে ; “মধু চাই !” “শাঁখা নেবে গো !” বলে ফিরিওয়ালারা ডেকে ডেকে ঘুচ্ছে। ঢাকাই ও শান্তিপুরে কাপুড়ে মহাজন, আতরওয়ালা ও যাত্রার দালালেরা আহার নিজে পরিত্যাগ করেছে। কোনখানে কাঁসারীর দোকানে রাশীকৃত মধুপঙ্কের বাটি, চুমকি ঘটি ও পেতলের থালা ওজন হচ্ছে। ধূপ ধূনা, বেগে মসলা ও মাথাঘবার একুট্টা দোকান বসে গ্যাচে। কাপড়ের মহাজনেরা দোকানে ডবল পর্দা ফেলেচে ; দোকান ঘর অন্ধকারপ্রায়, তারি ভেতরে বসে যথার্থ পাই লাভে বউনি হচ্ছে। সিঁহরচুপড়ি, মোমবাতি, পিঁড়ে ও কুশাসনেরা অবসর বুঝে দোকানের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে অ্যাকুডক্টের উপর বার দিয়ে বসেচে। বাঙ্গাল ও পাড়ার্গেয়ে চাকরেরা আরসি, ঘুনসি, গিল্টির গহনা ও বিলিভী মুক্তো একচেটেয় কিন্চেন ; রবরের জুতো, কমফরটর, ষ্টিক ও শাজওয়ালা পাগড়ি অশুস্তি উঠে ; ঐ সঙ্গে বেলোয়ারি চুড়ি, আঙ্গিয়া, বিলিভী সোনার শীলআংটি ও চুলের গার্ডচেনেরও অসঙ্গত খদ্দের। এত দিন জুতোর দোকান ধুলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পুজোর ষোরশমে বিয়ের কনের মত কেঁপে উঠ্চে ; দোকানের কপাটে কাঁই দিয়ে নানা রকম রঙ্গীন কাগজ মারা হয়েছে, ভেতরে চেয়ার পাড়া, তার নীচে এক টুকরো ছেঁড়া কার্পেট। সহরের সকল দোকানেরই শীতকালের কাপের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আসচে, ততই বাজারের কেনা ব্যাচা বাড়চে, ততই কলকেষা গরম হয়ে উঠ্চে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাহায্যে বেরিয়েচেন, বাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গ্যাচে।

কোনখানে খুন, কোনখানে দাঙ্গা, কোথায় সিঁচচুরি, কোনখানে ভাঁই মহাশয়ের কাছ থেকে ছু ভরি রূপো গাঁটকাটায় কেটে নিয়েচে ; কোথাও মাগীর নাকে থেকে নথটা ছিঁড়ে নিয়েচে ; পাহারাওয়ালারা শশব্যস্ত, পুলিশ বদমাইস পোরা, চোরেরা পুজোর মোরশুমে দেদার কারবার ফালাও কচ্ছে, “লাগে তাক না লাগে তুকো” “কিনি তো হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার” তাদের জগমগ হয়েছে ; অনেকে পার্বণের পূর্বের ঐশ্বরে ও বাঙ্কলে বসতি কচ্ছে ; কারো পুজোর পাথরে পাঁচ কিল ; কারো সর্বনাশ ! ক্রমে চতুর্থী এসে পড়লো ।

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়িতে পুজার ভারি ধুম । প্রতিপদাদি কল্পের পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েছে, আজও চোকে নাই—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বাড়ি গিস্গিস্ কচ্ছে । বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির উপর তসরকাপড় পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর শ্রায়লঙ্কার সভাপণ্ডিত, অনবরত নম্র নিচ্ছেন ও নাসানিঃসৃত রঙ্গীন কফজল জাজ্জিমে পুচ্ছেন । এদিকে জহরী জড়ওয়া গহনার পুঁটুলি ও ঢাকাই মহাজন ঢাকাই শাড়ীর গাঁট নিয়ে বসেচে, মুন্সি মশাই, জামাই ও ভাগ্নে বাবুরা ফর্দ কচ্ছেন, সামনে কতকগুলি শ্রিতিমেক্যালা দুর্গাদায়গ্রন্থ ব্রাহ্মণ, বাইয়ের দালাল, যাত্রার অধিকারী ও গাইয়ে ভিক্ষুক “যে আজ্ঞা” “ধর্ম অবতার” প্রভৃতি শ্রিয়বাক্যের উপহার দিচ্ছেন । বাবু মধ্যে মধ্যে কারো এক আধটা আগমনী গাইবার ফরমাস কচ্ছেন । কেও খোসগল্প ও অশ্রু বড়মানুষের নিন্দাবাদ করে বাবুর মনোরঞ্জন উপক্রমণিকা কচ্ছেন,—আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে রয়েছে, উপযুক্ত সময়ে তীরস্থ হবে । আতরওয়ালা, তামাকওয়ালা, দানাওয়ালারা ও অশ্রু পাওনাদার মহাজনরা বাইরে বারাণ্ডায় ঘুচ্ছে—পুজো যায় তখাচ তাদের হিসেব নিকেশ হচ্ছে না । সভাপণ্ডিত মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিদেশ নেওয়া ও বিশ্ববাদলের এবং বিপক্ষপক্ষের ব্রাহ্মণদের নাম কাটছেন ; অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিকি গালচেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ি চেনেন না ; বিশ্বা বিয়ের সভায় যাওয়া চুলোয় যাক, গত বৎসর শয্যাগত ছিলেন বলেই হয় । কিন্তু বানের মুখে জেলেডিক্কীর মত তাঁদের কথা তল্ হয়ে যাচ্ছে, নামকাটার পরিবর্তে সভাপণ্ডিত আপনার জামাই, ভাগ্নে, নাতজামাই, দৌতুর ও খুড়তুতো ভেয়েদের নাম হাঁসিল কচ্ছেন ; এদিকে নামকাটার বাবু ও সভাপণ্ডিতকে বাপান্ত করে পৈতে ছিঁড়ে গালে চড়িয়ে শাঁপ দিয়ে উঠে যাচ্ছেন । অনেক উমেদারের অনিয়ত হাজিরের পর বাবু কাকেও “স্বজ্ঞ যাও” “কাল এসো” “হবে না” “এবার এই হলো” প্রভৃতি

অসুস্থতার আপ্যায়িত কছেন—হজুরীসরকারের হেক্‌মৎ জাখে কে। সকলেই শশব্যস্ত, পূজার ভারি ধুম।

ক্রমে চতুর্থীর অবসান হলো, পঞ্চমী প্রভাত হলেন—ময়রারা হুগোমোড়া ও আগাতোলা সন্দেশের ওজন দিতে আরম্ভ করে। পাঠার রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট বাজারে প্যারেড্‌ কন্ডে লাগলো, গন্ধবোধেরা মসলা ও মাথাঘষা বেঁধে বেঁধে ক্লাস্ত হয়ে পড়লো। আজ সহরের বড় বাস্তায় চলা ভার; মুটেরা প্রিমিয়মে মোট বইচে, দোকানে খন্দের বসবার স্থান নাই। পঞ্চমী এইরূপে কেটে গ্যালো। আজ ষষ্ঠী; বাজারের শেষ কেনাবেচা, মহাজনের শেষ তাগাদা, আশার শেষ ভরসা। আজ আমাদের বাবুর বাড়িরও অপূর্ব শোভা; সব চাকর বাকর নতুন তক্‌মা, উর্দি ও কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দরজার দুই দিকে পূর্ণকুন্ত ও আত্মসার দেওয়া হয়েছে, ঢুলীরা মধ্যে মধ্যে রোশনচৌকি ও শানাইয়ের সঙ্গে বাজাচ্ছে, জামাই ও ভাগ্নে বাবুরা নতুন জুতো ও নতুন কাপড় পরে ফররা দিচ্ছেন, বাড়ির কোন বৈঠকখানায় আগমনী গাওয়া হচ্ছে, কোথাও নতুন তাসজোড়া পরকান হচ্ছে, সমবয়সী ও ভিক্ষুকের ম্যালা লেগেচে, আতরের উমেদারেরা বাবুদের কাছে শিশি হাতে করে সাত দিন ঘুচ্ছে, কিন্তু বাবুদের এমনি অনবকাশ যে ছু কৌটা আতর দানের অবসর হচ্ছে না।

এদিকে সহরের বাজারের মোড়ে ও চৌরাস্তায় ঢুলী ও বাজন্দারের ভিড়ে সৈদোনো ভার। রাজপথ লোকারণ্য; মালীরা পথের ধারে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্লি-পত্তর ও কুচো ফুলের দোকান সাজিয়ে বসেচে; দইয়ের ভার, মণ্ডার খুলী ও লুটি কচুরীর ওড়ায় রাস্তা জুড়ে গেছে; রেও ভাট ও আমাদের মত ফলারেরা মিমে করে নিচ্ছে—কোথায় যায়?

ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সহরে প্রিতিমার অধিবাস হয়ে গ্যালো, কিছুক্ষণ ঢোল ঢাকের শব্দ থামলো, পূজোবাড়িতে ক্রমে “আন রে” “কর রে” “এটা কি হলো” কন্ডে কন্ডে ষষ্ঠীর শর্বরী অবসন্ন হলো, সুখতার মৃদু পবন আশ্রয় করে উদয় হলেন, পাখির প্রভাত প্রত্যক্ষ করে ক্রমে ক্রমে বাসা পরিত্যাগ কন্ডে আরম্ভ করে; সেই সঙ্গে সহরের চারি দিকে বাজনা বাদি বেজে উঠলো, নবপত্রিকার স্নানের জন্ত কর্মকর্তারা শশব্যস্ত হলেন—ভাবুকের ভাবনায় বোধ হতে লাগলো, যেন সপ্তমী কোরমাখান নতুন কাপড় পরিধান করে হাসতে হাসতে উপস্থিত হলেন।

এদিকে সহরের সকল কলাবউয়েরা বাজনা বাদি করে স্নান করতে বেরলেন, বাড়ির ছেলেরা কাঁসর ও ঘড়ি বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চল্লো—এদিকে বাবুর

কলাবউয়েরও স্নানের সরঞ্জাম বেরুলো, আগে আগে কাড়ানাগরা, ঢোল ও সানাইদারেরা বাজাতে বাজাতে চল্লো, তার পেছনে নতুন কাপড় পরে আশাসোঁটা হাতে বাড়ির দরওয়ানেরা, তার পশ্চাৎ কলাবউ কোলে পুরোহিত, পুঁথি হাতে তন্ত্রধারক, বাড়ির আচার্য্য বায়ুন, গুরু ও সভাপণ্ডিত, তার পশ্চাৎ বাবু, বাবুর মস্তকে লাল সাটিনের রূপোর রামছাতা ধরেচে। আশে পাশে ভাগ্নে, ভাইপো ও জামাইয়েরা, পশ্চাৎ আমলা ফয়লা ও ঘরজামাইয়ে ভগিনীপতিরা, মোসাহেব ও বাজে দল, তার শেষে নৈবিদ্য, লাঠন ও পুষ্পপাত্র, শাঁখ ঘণ্টা ও কুশাসন প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম মাথায় মালীরা। এই প্রকার সরঞ্জামে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটে কলাবউ নাওয়াতে চল্লেন, ক্রমে ঘাটে পৌঁছুলে কলাবউয়ের পূজো ও স্নানের অবকাশে হজুরও গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করে নিয়ে শুভ পাঠ কস্তে কস্তে অল্পরূপ বাজনা বাদির সঙ্গে বাড়িমুখে হলেন।

পাঠকবর্গ! এ সহরে আজকাল ছুচার এজুকেটেড ইয়ংবেঙ্গালও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে পূজোআচ্ছা করে থাকেন—ব্রাহ্মণ ভোজনের বদলে কতকগুলি দিলদোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান, আলাপী ফিমেল ক্রেণ্ডেরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন, পূজোরো কিছু রিকাইণ্ড কেতা। কারণ অপর হিন্দুদের বাড়ি নিমন্ত্রিত প্রদত্ত প্রণামী টাকা পুরোহিত ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য, কিন্তু এঁদের বাড়ি প্রণামীর টাকা বাবুর অ্যাকৌন্টে ব্যাস্কে জমা হয়; প্রতিমের সামনে বিলিতী চর্কির বাতি জ্বলে ও পূজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠবার অ্যালাওয়েল থাকে। বিলেত থেকে অর্ডর দিয়ে সাজ আনিয়ে প্রতিমে সাজান হয়—মা ছুর্গা মুকুটের পরিবর্তে বনেট পরেন, স্মাণ্ডউইচের শেতল খান, আর কলাবউ গঙ্গাজলের পরিবর্তে কাৎলীকরা গরম জলে স্নান করে থাকেন, শেষে সেই প্রসাদী গরম জলে কর্ম্মকর্তার প্রাতরাশের টী ও কফি প্রস্তুত হয়!

ক্রমে তাবৎ কলাবউয়েরা স্নান করে ঘরে ঢুকলেন। এদিকে পূজাও আরম্ভ হলো, চণ্ডীমণ্ডপে বারকোসের উপর আগাতোলা মোণ্ডাওয়াল নৈবিদ্য সাজান হলো, সজ্জতি বুঝে ঢেলীর শাড়ি, চিনির খাল, ঘড়া, চুমকি ঘটি ও সোনার লোহা; নয় ত কোথাও সন্দেশের পরিবর্তে গুড় ও মধুপর্কের বাটির বদলে খুরি ব্যবস্থা। ক্রমে পূজো শেষ হলো; ভক্তরা এতক্ষণ অনাহারে থেকে পূজোর শেষে প্রতিমারে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, বাড়ির গিন্নীরা চণ্ডী শুনে জল খেতে গ্যালেন; কারো বা নবরাস্তির। আমাদের বাবুর বাড়ির পূজোও শেষ হলো প্রায়, বলিদানের উদ্‌যোগ হচ্ছে; বাবু মায় ষ্টাফ্ আতুড় গায়ে উঠানে দাঁড়িয়েচেন, কামার

কোমর বেঁধে প্রতিমের কাছ থেকে পূজা ও প্রতিষ্ঠা করা খাঁড়া নিয়ে কাশে আলীকর্দারী ফুল গুঁজে হাড়কাঠের কাছে উপস্থিত হলো, পাশ থেকে এক জন মোসাহেব “খুটি ছাড়! খুটি ছাড়!” বলে চেষ্টায়ে উঠলেন, গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে পাঠাকে হাড়কাঠে পুরে দিয়ে খিল এঁটে দেওয়া হলো, এক জন পাঠার মুড়ি ও আর এক জন ধড়টা টেনে ধরে—অমনি কামার “জয় মা! মা গো!” বলে কোপ তুলে, বাবুরাও সেই সঙ্গে “জয় মা! মা গো!” বলে প্রতিমের দিকে ফিরে চেষ্টাতে লাগলেন—ছপ করে কোপ পড়ে গ্যালো—গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক টুপ্ টুপ্ টুপ্, গীজা গীজা গীজা গীজা, নাক টুপ্ টুপ্ টুপ্ শব্দে ঢোল, কাড়ানাগরা ও ট্যাম্‌টেমি বেজে উঠলো; কামার সরাতে সমাংস করে দিলে পাঠার মুড়ির মুখ চেপে ধরে দালানে পাঠানো হলো, এদিকে এক জন মোসাহেব সম্ভরণে ঋপরের সরা আচ্ছাদন করে প্রতিমের সম্মুখে উপস্থিত কলে, বাবুরা বাজনার তরঙ্গের মধ্যে হাততালি দিতে দিতে ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে উঠলেন—প্রতিমার সামনে দানের সামগ্রী ও প্রদীপ জেলে দেওয়া হলে আরতি আরম্ভ হলো, বাবু স্বহস্তে ধবল গঙ্গাজল চামর বীজন কণ্ঠে লাগলেন, ধূপ ধূনোর ধোঁয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যালো, এইরূপে আধ ঘণ্টা আরতির পর শাঁখ বেজে উঠলো, সবাবু সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বৈঠকখানায় গ্যালেন। এদিকে দালানে বামুনেরা নৈবিদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি কণ্ঠে লাগলো। দেখতে দেখতে সপ্তমীও ফুরালো। ক্রমে নৈবিদ্য বিলি, কাঙ্গালী বিদায় ও জলপান বিলানোতেই সে দিনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গ্যালো, বৈকালে চণ্ডীর গানওয়ালারা খানিক ক্ষণ আসর জাগিয়ে বিদায় হলো—জগা স্নাকরা চণ্ডীর গানের প্রকৃত ওস্তাদ ছিল, সে মরে যাওয়াতেই আর চণ্ডীর গানের প্রকৃত গায়ক নাই; বিশেষত এক্ষণে শ্রোতাও অতিচূর্ণভ হয়েচে।

ক্রমে ছটা বাজলো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জেলে দিয়ে প্রতিমার আরতি আরম্ভ করে দেওয়া হলো এবং মা দুর্গার শেতলের জলপান ও অগ্ন্যাগ্নি সরঞ্জামও সেই সময় দালানে সাজিয়ে দেওয়া হলো—মা দুর্গা যত খান বা না খান, লোকে দেখে প্রশংসা কল্লোই বাবুর দশ টাকা খরচের সার্থকতা হবে। এদিকে সন্ধ্যার সঙ্গে দর্শকের ভিড় বাড়তে লাগলো; বাঙ্গাল দোকানদার, ঘুস্কী ও খানকীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও আদবইসী ছোঁড়া সঙ্গে খাতায় খাতায় প্রতিমে দেখতে আসতে লাগলো। এদিকে নিমন্ত্রিতেরা সেজেগুজে এসে টনাং করে একটা টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম কলে, অমনি পুরুত এক ছড়া ফুলের মালা নেমস্তম্বের গলায় দিয়ে

টাকাটা হুড়িয়ে ট্যাকে শুঁজলেন, নেমস্তম্ভেও হন্ হন্ করে চলে গেলেন। কলকোতা সহরের এই একটি বড় আজগুবি কেতা, অনেক স্থলে নিমন্ত্রিতে ও কর্তৃকর্তায় চোরে কামারের মত সাক্ষাৎ হয় না, কোথাও পুরোহিত বলে ছান “বাবু ও পরে, ঐ সিঁড়ি মশাই যান না।” কিন্তু নিমন্ত্রিত যেন চিরপ্রচলিত রীতি অনুসারেই “আজ্ঞে না, আরো পাঁচ জায়গায় যেতে হবে, থাক্” বলে টাকাটি দিয়েই অমনি গাড়িতে ওঠেন; কোথাও যদি কর্তৃকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে গিরগিটের মত উভয়ে একবার ঘাড় নাড়ানাড়ি মাত্র হয়ে থাকে—সন্দেশ মেঠাই চুলোয় থাক্, পান তামাক মাথায় থাক্, প্রায় সর্বত্রই সাদর সম্ভাষণেরও বিলক্ষণ অপ্রতুল—ছুই এক জায়গায় কর্তৃকর্তা জরির মহলন্দ পেতে, সামনে আভরণ, গোলাপপাস সাজিয়ে পয়সার দোকানের পোদ্দারের মত বসে থাকেন। কোন বাড়ির বৈঠকখানায় চোহেলের রৈ রৈ ও হৈচৈয়ের তুফানে নেমস্তম্ভের সেঁধুতে ভরসা হয় না—পাছে কর্তৃকর্তা তেড়ে কামড়ান। কোথায় দরজা বন্ধ, বৈঠকখানা অন্ধকার, হয় ত বাবু যুয়ুচ্ছেন, নয় বেরিয়ে গ্যাচেন, দালানে জনমানব নাই, নেমস্তম্ভে কার সমুখে যে প্রণামী টাকাটি ফেলবেন ও কি করবেন, তা ভেবে স্থির কত্তে পারেন না, কর্তৃকর্তার ব্যাভার দেখে প্রতিমে পর্য্যন্ত অপ্রস্তুত হন। অথচ এ রকম নিমন্ত্রণ না কল্পেই নয়। এই দরুন অনেক ভত্রলোক আজকাল আর “সামাজিক” নেমস্তম্ভে স্বয়ং যান না, তাগে বা ছেলেপুলের দ্বারাতেই ফ্রিয়েবাড়ির পুরুতের প্রাপ্য কিম্বা বাবুদের ওংকরা টাকাটি পাঠিয়ে ছান কিন্তু আমাদের ছেলেপুলে না থাকায় ও স্বয়ং গমনে অসমর্থ হওয়ায় স্থির করেছি, এবার অবধি প্রণামীর টাকায় পোটেজ্ স্ট্যাম্প কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেবো, তেমন তেমন আত্মীয়স্থলে (সেফ অ্যারাইভ্যালের জন্ত) রেজিষ্টারী করে পাঠান যাবে; যে প্রকারে হোক টাকাটি পৌঁছনো নে বিষয়। অধ্যাপক ভায়ারা এ বিষয়ে অনেক সুবিধে করে দিয়েছেন, পুজো ফুরিয়ে গেলে তাঁরা প্রণামীর টাকাটি আদায় কত্তে স্বয়ং ক্লেস নিয়ে থাকেন, নেমস্তম্ভের পূর্ব হতে পুজোর শেষে তাঁদের আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি হয়, অনেকের প্রণামী চাইতে আসাই পুজোর প্রফ!

মনে করুন, আমাদের বাবু বনেদী বড়মানুষ; চাইল স্বতস্তর, আরতির পর বানারসী জোড় পরে সভাসদ্ সঙ্গে নিয়ে দালানে বার দিলেন, অমনি তক্কা পরা বাঁকা দরওয়ানেরা তলওয়ার খুলে পাহারা দিতে লাগলো; হরকরা, হাঁকোবদার, বিবির বাড়ির বেয়ারা ও মোসাহেবরা জোড়হস্ত হয়ে দাঁড়ালো কখন কি করমাস হয়। বাবুর সামনে একটা সোনার আলবোলা, ডাইমে একটা পান্নাবসান ফুরসি,

বাঁয়ে একটা হীরে বসান টোপ্‌দার গুড়গুড়ি ও পেছনে একটা মুক্তাবসান পৌচুয়া পড়লো ; বাবু আঁজাকুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অঙ্কুসারে আশে পাশে মুখ দিচ্ছেন ও আড়ে আড়ে সামনে বাজে লোকের ভিড়ের দিকে দেখছেন—লোকে কোন্টার কারিগরির প্রশংসা কচ্ছে ; যে রকমে হোক, লোককে দেখান চাই যে, বাবুর রূপো সোনার জিনিষ অটেল, এমন কি, বসাবার স্থান থাকলে আরো ছুটো ফুঁসি বা গুড়গুড়ি স্থাপন যেতো। ক্রমে অনেক অনাহুত ও নিমন্ত্রিত জড় হতে লাগলেন, বাজে লোকে চণ্ডীমণ্ডপ পুরে গেল, জুতো চোরে সেই লাঙ্গাতরওয়ারের পাহারার ভেতর থেকেও ছু বুড়ি জুতো সরিয়ে ফেল্লে। কচ্ছপ জলে থেকেই ডাঙ্গাস্থ ডিমের প্রাতি যেমন মন রাখে, সেইরূপ অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে আপনার জুতোরও ওপর নজর রেখেছিলেন ; কিন্তু ওঠবার সময় জাখেন যে, জুতোরাম কচ্ছপের ডিমের মত ফুটে সরেচেন, ভাঙ্গা ডিমের খোলার মত হয় ত এক পাটি ছেঁড়া চটি পড়ে আছে।

এদিকে দেখতে দেখতে গুড়ুম্ করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো ; ছেলেরা “বোম কালী কলকেশাওয়ালী” বলে চৈচিয়ে উঠলো। বাবুর বাড়ি নাচ, স্ততরাং বাবু আর অধিক ক্ষণ দালানে বসতে পারেন না, বৈঠকখানায় কাপড় ছাড়তে গেলেন, এদিকে উঠানের সমস্ত গ্যাস জ্বলে দিয়ে মজলিশের উদ্‌যোগ হতে লাগলো, ভাগেরা ট্যাসল দেওয়া টুপি ও পেটি পরে ফপরদালালি কন্তে লাগলেন। এদিকে ছুই এক জন নাচের মজলিশি নেমন্ত্নে আসতে লাগলেন। মজলিশে তয়ফা নাবিয় দেওয়া হলো। বাবু জরি ও কালাবৎ এবং নানাবিধ জড়ওয়া গহনায় ভূষিত হয়ে ঠিক একটি “ঈজিপশন্ মমী” সঙ্গে মজলিশে বার দিলেন—বাই সারঙ্গের সঙ্গে গান করে সভাস্থ সমস্তকে মোহিত কন্তে লাগলেন।

নেমন্ত্নেরা নাচ দেখতে থাকুন, বাবু ফররা দিন ও লাল চোখে রাজা উজীর মারুন—পাঠকবর্গ একবার সহরটার শোভা দেখুন—প্রায় সকল বাড়িতেই নানা প্রকার রং তামাশা আরম্ভ হয়েছে। লোকেরা খাতায় খাতায় বাড়ি বাড়ি পূজো দেখে বেড়াচ্ছে। রাস্তায় বেজায় ভিড় ! মাড়ওয়ারী খোঁটার পাল, মাগীর খাতা ও ইয়ারের দলে রাস্তা পুরে গ্যাচে। নেমন্ত্নের হাতলাঠনওয়ালী বড় বড় গাড়ির সইসেরা প্রলয় শব্দে পইস্ পইস্ কচ্ছে, অথচ গাড়ি চালাবার বড় বেগতিক ! কোথায় সখের কবি হচ্ছে, ঢোলের চাঁটি ও গাওনার চীংকারে নিত্বাদেবী সে পাড়া থেকে ছুটে পালিয়েচেন, গানের তানে স্তম্ভ ছেলেরা মার কোলে ক্ষণে ক্ষণে চম্কে উঠে। কোথাও পাঁচালি আরম্ভ হয়েছে, বওয়াটে পিল্ ইয়ার হোকরারা ভরপুর

নেশায় ভেঁ হয়ে ছড়া কাটছেন ও আপনা আপনি বাহবা দিচ্ছেন ; রাস্তির শেষে আন্ধ গড়াবে, অবশেষে পুলিশে দক্ষিণা দেবে। কোথায় যাত্রা হচ্ছে, মণিগৌসাই সং এসেছে, ছেলেরা মণিগৌসায়ের রসিকতায় আছল্লাদে আটখানা হচ্ছে, আশে পাশে চিকের ভেতর মেয়েরা উকি মাচ্ছে, মজলিশে রামমশাল জ্বল্চে, বাজে দর্শকদের বাতকর্ষ ও মশালের দুর্গন্ধে পূজোবাড়িতে তিষ্ঠন ভার, ধূপ ধূনার গন্ধও হার মেনেচে। কোনখানে পূজোবাড়ির বাবুরাই খোদ মজলিশ রেখেচেন—বৈঠকখানায় পাঁচো ইয়ার জুটে নেউল নাচানো, ব্যাং নাপানো, ধ্যামটা ও বিত্তানুন্দর আরম্ভ করেচেন ; এক এক বারের হাসির গব্বায় শিয়াল ডাকে ও মদন আগুনের তানে—দালানে ভগবতী ভয়ে কাঁপচেন, সিঙ্গি চোরাকে কামড়ান পরিত্যাগ করে শ্রাজ গুটিয়ে পলাবার পথ দেখ্চে, লক্ষ্মী সরস্বতী শশব্যস্ত ! এদিকে সহরের সকল রাস্তাতেই লোকের ভিড়, সকল বাড়িই আলোময়।

এই প্রকারে সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধিপূজা কেটে গ্যালো। আজ নবমী ; আজ পূজোর শেষ দিন ; এত দিন লোকের মনে যে আছল্লাদটি জোয়ারের জলের মত বাড়তেছিল, আজ সেইটির একেবারে সারভাটা।

আজ কোথাও জোড়া মোষ, কোথাও নব্বুইটা পাঁঠা, সুপারি, আক, কুমড়ো, মাগুরমাছ ও মরিচ বলিদান হয়েছে ; কর্ষকর্তা পাত্র টেনে পাঁচো ইয়ারে জুটে নবমী গাচ্ছেন ও কাদামাটি কছেন, ঢুলীর ঢোলে সজ্জত হচ্ছে, উঠানে লোকারণ্য ; উপর থেকে বাড়ির মেয়েরা উকি মেরে নবমী দেখছেন। কোথাও হোমের ধূমে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গ্যাচে, কার সাধ্য প্রবেশ করে—কান্দালী, রেওভাট ও ভিক্ষুকের পূজোবাড়ি ঢোকা দূরে থাকুক, দরজা হতে মশাগুলো পর্য্যন্ত ফিরে যাচ্ছে। ক্রমে দেখতে দেখতে দিনমণি অস্ত গ্যালেন, পূজোর আমোদ প্রায় সম্বৎসরের মত ফুরালো ! ভোরাও ওস্তে ভয়রোঁ। রাগিণীতে অনেক বাড়িতে বিজয়া গাওনা হলো। ভক্তের চক্ষে ভগবতীর প্রতিমা পরদিন প্রাতে মলিন মলিন বোধ হতে লাগলো, শেষে বিসর্জনের সমারোহ শুরু হলো,—আজ মিরজন।

ক্রমে দেখতে দেখতে দশটা বেজে গ্যালো ; দইকড়মা ভোগ দিয়ে প্রতিমার নিরঞ্জন করা হলো, আরতির পর বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠলো ; বামুনবাড়ির প্রতিমারা সকালেই জলসই হলেন। বড়মানুষ ও বাজে জাতির প্রতিমা পুলিশের পাস মত বাজনা বাদির সঙ্গে বিসর্জন হবেন—এদিকে এ কাজ সে কাজে নিরঞ্জার ঘড়িতে টুং টাং টুং টাং করে ছপ্পুর বেজে গ্যালো, সূর্য্যের মুহূর্ত্ত

উক্তাপে সহর নিম্নী বকম গরম হয়ে উঠলো, এলোমেলো হাওয়ায় রাস্তার ধূলা ও কাঁকর উড়ে অন্ধকার করে তুলে। বেকার কুকুরগুলো দোকানের পাটাতনের নীচে ও খানার খারে শুয়ে জিব বাইর করে হাঁপাচ্ছে, বোঝাই গাড়ির গরুগুলোর মুখ দে ফ্যানা পড়চে—গাড়োয়ান ভয়ানক চীৎকারে “শালার গরু চলে না” বলে ছাজ মল্চে ও পাঁচনবাড়ি মাচ্ছে ; কিন্তু গরুর চাল বেগড়াচ্ছে না, বোঝাইয়ের ভরে চাকাগুলি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চলেচে। চড়াই ও কাকগুলো বারাণ্ডা, আলসে ও নলের নীচে চক্ষু মুদে বসে আছে। ফিরিওয়ালারা ক্রমে ঘরে ফিরে যাচ্ছে, রিপুকর্ষ ও পরামাণিকরা অনেক ক্ষণ হলো ফিরেচে, আলু, পটোল ! ঘি চাই ! ও তামাকওয়ালা কিছু ক্ষণ হলো ফিরে গ্যাচে। ঘোল চাই মাখন চাই ! ভয়সা দই ! ও মালাই দইওয়ালারা কড়ি ও পয়সা গুনতে গুনতে ফিরে যাচ্ছে, এখন কেবল মধ্যে মধ্যে পানিফল ! কাগোজ বদোল ! পেয়ালা পিরিচ—বিলাতী খেলেনা বর্তন চাই পেয়ালা পিরিচ ! ফিরিওয়ালাদের ডাক শোনা যাচ্ছে—নৈবিদ্দি মাথায় পূজোবাড়ির লোক, পূজুরী বায়ুন, পটো ও বাজন্দার ভিন্ন রাস্তায় বাজে লোক নাই। গুপুস্ করে একটার তোপ পড়ে গ্যালো। ক্রমে অনেক স্থলে ধুমধামে বিসর্জনের উদ্‌যোগ হতে লাগলো।

হায় ! পৌত্তলিকতা কি শুভ দিনেই এ স্থলে পদার্পণ করেছিল ; এত দেখে শুনে মনে স্থির জেনেও আমরা তারে পরিত্যাগ কত্তে কত কষ্ট ও অশ্রুবিধা বোধ কচ্ছি ; ছেলেবেলা যে পুতুল নিয়ে খেলাঘর পেতেচি, বো বো খেলেচি ও ছেলে মেয়ের বে দিয়েচি, আবার বড় হয়ে সেই পুতুলকে পরমেশ্বর বলে পূজো কচ্ছি, তাঁর পদার্পণে পুলকিত হচ্ছি ও তাঁর বিসর্জনে শোকের সীমা থাকচে না—শুধু আমরা কেন—কত কত কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সংসারের ও জগদীশ্বরের সমস্ত তত্ত্ব অবগত থেকেও হয় ত সমাজ, না হয় পরিবার পরিজনের অনুরোধে পুতুল পূজে আমোদ প্রকাশ করেন, বিসর্জনের সময় কাঁদেন ও কাদা রক্ত মেখে কোলাকুলি করেন, কিন্তু নাস্তিকতায় নাম লিখিয়ে বনে বসে থাকাও ভাল, তবু “জগদীশ্বর একমাত্র” এটি জেনে আবার পুতুল পূজায় আমোদ প্রকাশ করা উচিত নয়।

ক্রমে সহরের বড় রাস্তা চৌমাথা লোকারণ্য হয়ে উঠলো, বেশালয়ের বারাণ্ডা আলাপীতে পুরে গ্যালো, ইংরাজি বাজনা, নিশেন, তুরকসোয়ার ও সার্কন সঙ্গে প্রতিমার রাস্তায় বাহার দিয়ে বেড়াতে লাগলেন—তখন “কার প্রতিমা উত্তম” “কার সাজ ভাল” “কার সরঞ্জাম সরেস” প্রভৃতির প্রশংসারই

প্রয়োজন হচ্ছে, কিন্তু হয়! “কার ভক্তি সরেস” কেউ সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে না—কর্মকর্তাও তার জ্ঞান বাড় করার করেন না। এ দিকে, প্রসন্নকুমার বাবুর ঘাট ভদ্রের লোক গোছের দর্শক, ক্ষুদে ক্ষুদে পোশাক করা ছেলে, মেয়ে ও ইঞ্চুলবয়ে ভরে গ্যালো। কর্মকর্তারা কেউ কেউ প্রতিমে নিয়ে বাচ খেলিয়ে বেড়াতে লাগলেন—আমুদে মিন্‌সে ও ছোঁড়ারা নোকোর ওপর চোলের সঙ্গতে নাচতে লাগলো। সৌখীন বাবুরা খ্যামটা ও বাই সঙ্গে করে বোট, পিনেস ও বজ্রার ছাতে বার দিয়ে বসলেন—মোসাহেব ও ওস্তাদ চাকরেরা কবির সুরে দু একটা রংদার গান গাইতে লাগলো।

বিদায় হও মা ভগবতি এ সহরে এসো নাকো আর।

দিনে দিনে কলিকাতার মর্ষ দেখি চমৎকার ॥

জষ্টিসেরা ধর্ম্মঅবতার, কায়মনে কচেন সুবিচার।

এদিকে খুলোর তরে রাজপথেতে চৌচিয়ে চেয়ে চলা ভার।

পথে হাগা মোতা চলবে না, লহোরের জল তুলতে মানা,
লাইসেন্সলটেক্স মাণ্ট চাঁদা, পাইখানার বাসি ময়লা রবে না।

হেলথ অফিসর, সেতখানার মেজেষ্টর,

ইনকমের আসেসর মাল্লে সবারে ;

আবার গবর্ণরের গুয়ে দৃষ্টি সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার !

অসহ্য হতেছে মা গো ! অসাধ্য বাস করা আর।

জীয়ন্তে এই ত জালা মা গো,

মলেও শাস্তি পাবে না,

মুখাগ্নির দফা রফা কলেতে করবে সংকার।

হতোম দাস তাই সহর ছেড়ে আস্মানে করেন বিহার।

এদিকে দেখতে দেখতে দিনমণি যেন সম্বৎসরের পূজোর আমোদের সঙ্গে আস্ত গ্যালেন। সঙ্ক্যাবধু বিচ্ছেদবসন পরিধান করে দেখা দিলেন। কর্মকর্তারা প্রতিমা নিরঞ্জন করে, নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িয়ে “দাদা গো” “দিদি গো” বাজনার সঙ্গে ষট নিয়ে ঘরমুখো হলেন। বাড়িতে পৌঁছে চণ্ডীমণ্ডপে পূর্ণঘটকে প্রণাম করে শান্তিজল নিলেন, পরে কাঁচা হলুদ ও ঘটজল খেয়ে পরস্পর কোলাকুলি করলেন। অবশেষে কলাপাতে তুর্গানাম লিখে সিদ্ধি খেয়ে বিজয়ার উপসংহার হলো। ক দিন মহাসমারোহের পর আজ সহরটা খাঁ খাঁ কস্তে লাগলো—পৌত্তলিকের মন বড়ই উদাস হলো, কারণ লোকের যখন সুখের দিন থাকে

তখন সেটির তত অল্পভব কন্তে পারা যায় না, যত সেই সুখের মহিমা হৃৎখের দিনে বোকা যায়।

রামলীলা

দুর্গোৎসব এক বছরের মত ফুরুলো। ঢুলীরা নায়েকবাড়ি বিদেয় হয়ে শুভীর্ষ দোকানে রং বাজাচ্ছে। ভাড়া করা ঝাড়েরা মূটের মাথায় বাঁশে ঝুলে টুন্টু শব্দে বালাখানায় ফিরে যাচ্ছে। জজ্জমেনে বামুনের বাড়ির নৈবিদ্যের আলোচাল ও পঞ্চশস্ত্র শুকুচে, ব্রাহ্মণী ছেলে কোলে করে কাটি নিয়ে কাক ভাড়াছেন। সহরটা ধুমধমে। বাসাড়েরা আজো বাড়ি হতে ফেরেন নি, আপিস ও ইঙ্কুল খোলবার আরো চার পাঁচ দিন বিলম্ব আছে।

যে দেশের লোকের যে কালে যে প্রকার হেম্বৎ থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্মকাণ্ড, আমোদ প্রমোদ ও কার কারবার প্রচলিত হয়। দেশের লোকের মনই সমাজের লোকোমোটরের মত, ব্যবহার কেবল ওয়েদরকমের কাজ করে। দেখুন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত করে মল্লযুদ্ধে আমোদ প্রকাশ কতেন, নাটক ত্রোটকের অভিনয় দেখতেন, পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যের উৎসাহ দিতেন; কিন্তু আজকাল আমরা বারোইয়ারিতলায়, নয় বাড়িতে, বেদেনীর নাচ ও “মদন আগুনের” তানে পরিতুষ্ট হচ্ছি, ছোট ছোট ছেলে ও মেয়েদের অনুরোধ উপলক্ষ করে, পুতুল নাচ, পাঁচালি ও পচা খেঁউড়ে আনন্দ প্রকাশ কচ্ছি, যাত্রাওয়ালাদের “ছকুবাবু” ও “সুন্দরের” সং নাবাতে ছকুম দিচ্ছি। মল্ল-যুদ্ধের তামাশা দেখ “বুলবুল ফাইট” ও “ম্যাডার লড়ায়ে” পর্য্যবসিত হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেচেন, আজকাল আমরা সর্বদাই পরস্পরের অসাম্প্রদায়িক নিন্দাবাদ করে থাকি, শেষে এক পক্ষের “খেঁউড়ে” জিত ধরাই আছে।

আমাদের এই প্রকার অধঃপতন হবে না কেন? আমরা হামা দিতে আরম্ভ করেই ঝুমঝুমি, চুঘী ও সোলার পাখিতে বর্ণপরিচয় করে থাকি, কিছু পরে ঘুড়ি, লাটিম, জুকাচুরি ও বো বো খেলাই আমাদের যুবতীর এনট্রান্স কোর্স হয়, শেষে ভাস, পাশা ও বড়ে টিপে মাৎ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরুই। সুতরাং ঐগুলি পুরনো পড়ার মত কেবল চিরকাল আউড়ে আসতে হয়; বেশীর ভাগ বয়সের পরিমাণের সঙ্গে ক্রমশ কতকগুলি আনুষঙ্গিক উপসর্গ উপস্থিত হয়।

রামলীলা এদেশের পরব্ নয়—এটি প্রলয় খোঁটাই। কিছু কাল পূর্বে চানকের সেপাইদের দ্বারা এই রামলীলার স্মৃতিপাত হয়, পূর্বে তারাই আপনা আপনি চাঁদা করে চানকের মাঠে রামরাবণের যুদ্ধের অভিনয় কস্তো ; কিছু দিন এ রকমে চলে, মধ্যে একেবারে রহিত হয়ে যায়। শেষে বড়বাজারের ছ চার ধনী খোঁটার উত্তোণে ১৭৫৭ শকে পুনর্ব্বার “রামলীলা” আরম্ভ হয়। তদবধি এই বারো বৎসর, রামলীলার মেলা চলে আস্চে। কল্কেতায় আর অণ্ড কোন মেলা নাই বলেই অনেকে রামলীলায় উপস্থিত হন। এদের মধ্যে নিষ্কর্মা বাবু, মাড়ওয়ারী খোঁটা, বেস্তা ও বেগেই অধিক।

পাঠকবর্গ মনে করুন, আপনাদের পাড়ার বনেদী বড়মানুষ ও দলপতি বাবু দেড় ফিট উচ্চ গদির ওপর বার দিয়ে বসেচেন। গদির সামনে বড় বড় বাস্র ও আয়না পড়েচে, বাবুর প্রকাণ্ড আলবোলা প্রতি টানে শরতের মেঘের মত শব্দ কর্চে, আর মুস্ক ও মুসব্বর মেশান ইরানী তামাকের খোসবে বাড়ি মাৎ করেছে। গদির কিছু দূরে এক জন খোঁটা সিদ্ধির মাজুম, হজ্জমী গুলি ও পালাংতোড় প্রভৃতি “কুয়ং কি চিজ্” ক্রমালে বেঁধে বসে আছেন। তিনি লঙ্কায়ের এক জন সম্পন্ন জহরীর পুত্র, এক্ষণে সহরেই বাস, হয় ত বছর কতক হলো আফিমের তেজমন্দি খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাবুর অবশ্যপোষ্য হয়েছেন। মনে করুন, তাঁর অনেক প্রকার হাকিমী ঔষধ জানা আছে, সিদ্ধি সম্পর্কীয় মাজুম ও উত্তম রকম প্রস্তুত কস্তে পারেন ; বিশেষত বিস্তুর বাই, কথক ও গানেওয়ালীর সহিত পরিচয় থাকায় আপন হেকমৎ ও জল্পুরিতে আজকাল বাবুর দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠেছেন। এঁর পাশে ভবানী বাবু ও মিস্ত্র্যাস আর্টফুল ডজরস উকিল সাহেবদের হেড কেরানী হলধর বাবু। ভবানী বাবু ঐ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত লোক, আদালতে ভারি মাইনের চাকরি করেন, এ সওয়ায় অন্তঃসিলে কোম্পানির কাগজের দালালি, বড় বড় রাজা রাজড়ার আমমোস্তারি ও মকদমার ম্যানেজারি করা আছে। এমন কি, অনেকেই স্বীকার করে থাকেন যে, ভবানী বাবু খড়িবাজিতে উমেশ হতে সরেস ও বিষয়কর্মে জয়কৃষ্ণ হতেও জবর। ভবানী বাবুর পার্শ্বস্থ হলধরও কম নন—মনে করুন, হলধর উকিলের বাড়ির মকদমার তছিরে, ফের ফন্দীতে ও জাল জালিয়াতে প্রকৃত শুভঙ্কর। হলধরের মোচা গোঁপ, মুসকের মত ভুঁড়ি, হাতে ইষ্টিকবচ, কোমরে গোট ও মাছুলি, সরু ফিন্‌ফিনে সাদা ধুতি পরিধান, তার ভিতরে একটা কাচ, কপালে টাকার মত একটা রক্তচন্দনের টিপ ও দাঁতে মিসি—চাদরটা তাল পাকিয়ে কাঁধে ফেলে অনবরত তামাক খাচ্ছেন ও গোঁপে তা দিয়ে ঘেন বুদ্ধি

পাকাচেন—এমন সময় বাবুর মজলিশে ফলহরি বাবু ও রামভদ্র বাবু উপস্থিত হলেন, ফলহরি ও রামভদ্রকে দেখে বাবু সাদর সম্ভাষণে বসালেন, হুঁকাবরদার তামাক দিয়ে গ্যালো, বাবুরা শ্রান্তি দূর করে তামাক খেতে খেতে একথা সে কথার পর বল্লেন, “মশাই, আজ রামলীলার বড় ধুম। আজ শুনলেন লক্ষ্মণের শক্তিশেল হবে, বিস্তর বাজি পুড়বে, এখানে আসবার সময় দেখলেম ওপাড়ার রাম বাবুর চৌষুড়ি গ্যালো। শত্ৰু বাবু বগিতে লক্ষ্মীকে নিয়ে যাচ্ছেন—আজ বেজায় ভিড়। মশাই যাবেন না?” তখনি ভবানী বাবু এই প্রস্তাবের পোষকতা কল্লেন—বাবুও রাজী হলেন—অমনি “ওরে! ওরে! কোন্ হায় রে! কোন্ হায়!” শব্দ পড়ে গ্যালো; আশে পাশে “খোদাবন্দ” ও “আজ্ঞা হাইয়ে”র প্রতিধ্বনি হতে লাগলো—হরকরাকে হকুম হলো, বড় ব্রিজকা ও বিলাতী জুড়ি তৈরি কস্তে বল। শীগ্গির।

ঠাওরান, যেন এদিকে বাবুর ব্রিজকা প্রস্তুত হতে লাগলো, পেয়ারের আরদালীরা পাগড়ি ও তক্কা পরে আয়নায় মুখ দেখচে। বাবু ডেসিংক্রমে ঢুকে পোশাক পছন্দ। চার পাঁচ জন চাকরে পড়ে চাল্লিশ রকম প্যাটনের ট্যাসল দেওয়া টুপি ও সাটীনের চাপকান পায়জামা বাছনি কচ্ছে। কোন্টা পাল্লে বড় ভাল দেখাবে বাবু মনে মনে এই ভাবতে ভাবতে ক্লাস্ত হচ্চেন, হয় ত একটা জামা পরে আবার খুলে ফেল্লেন। একটা টুপি মাথায় দিয়ে আয়নায় মুখ দিখে মনে খচ্ছে না; আবার আর একটা মাথায় দেওয়া হচ্ছে, সেটাও বড় ভাল মানাচ্ছে না, এই অবকাশে একজন মোসাহেবকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, “কেমন হে? এটা কি মাথায় দেবো!” মোসাহেব সব দিক্ বজায় রেখে, “আজ্ঞা পোশাক পাল্লে আপনাকে যেমন খোলে, সহরের কোন শালাকে এমন খোলে না” বল্চেন, বাবু এই অবসরে আর একটা টুপি মাথায় দিয়ে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, “এটা কেমন?” মোসাহেব “আজ্ঞে এমন আর কারো নাই” বলে বাবুর গৌরব বাড়াচ্চেন ও মধ্যে মধ্যে “আপু রুচি খানা ও পর রুচি পিন্ধা” বয়েদটা নজির কচ্চেন। এই প্রকার অনেক তর্ক বিতর্ক ও বিবেচনার পর, হয় ত একটা বেয়াড়া রকমের পোশাক পরে, শেষে পোয়েটম, ল্যাভেগার ও আতর মেখে আংটি চেন ও ইষ্টিক বেছে নিয়ে ছ ঘণ্টার পর বাবু ডেসিংক্রম হতে বৈঠকখানায় বার দিলেন। হলধর, ভবানী, রামভদ্র প্রভৃতি বৈঠকখানাস্থ সকলেই আপনাদের কর্তব্য কর্ত্ব্য বলেই যেন “আজ্ঞে পোশাকে আপনাকে বড় খুলেচে” বলে নানাপ্রকার প্রশংসা কস্তে লাগলেন; কেউ বল্লেন, “হজুর, এ কি গিব্‌সনের বাড়ির

তৈরি ?” কেউ বাড়ির চেন, কেউ আংটি ও ইষ্টিকের অনিয়ত প্রশংসা কস্তে আরম্ভ করলেন ।

মোসাহেবদের মধ্যে বাঁদের কাপড়চোপড়গুলি, বাবুর ব্রিজকা ও বিলাতী জুড়ির যোগ্য নয়, তাঁরা বাবুর প্রসাদী কাপড়চোপড় পরে, কানে আভরের তুলো গুঁজে, চেহারা খুলে নিলেন, প্রসাদী পোশাক পরে মোসাহেবদের আর আচ্ছাদের সীমা রইলো না। মনে হতে লাগলো, “বাড়ির কাছের উঠনোওয়াল মুন্দি মাগী ও চেনা লোকেরা যেন দেখতে পায়, আমি কেমন পোশাকে হজুরের সঙ্গে যাবি” ; কিন্তু ছুঁথের বিষয় এই যে, অনেক মোসাহেব সর্বদাই আক্কেপ করে থাকেন যে, তাঁরা যখন বাবুদের সঙ্গে বড় বড় গাড়ি ও ভাল কাপড়চোপড় পরে বেরোন তখন কেউ তাঁদের দেখতে পায় না, আর গামছা কাঁধে করে বাজার কস্তে বেরুলেই সকলের নজরে পড়েন ।

এদিকে টুং টাং টুং টাং করে মেকাবী ক্লাকে পাঁচটা বাজলো, “হজুর গাড়ি হাজির” বলে হরকরা হজুরে প্রোক্রম করলে, বাবু মোসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন—বিলাতী জুড়ি কোচম্যানের ইঞ্জিতে টপাটপ্, টপাটপ্ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে গ্যালো ।

এদিকে চাকরেরা “রাম বাঁচলুম” বলে কেউ বাবুর মহলন্দে গড়িয়ে পড়লো, কেউ হজুরের সোনাবাঁধান হুকোটা টেনে দেখতে লাগলো—অনেকে বাবুর ব্যবহারের কাপড়চোপড় পরে বেড়াতে বেরুলো । সহরের অনেক বড়মানুষের বাড়ি বাবুদের সাক্ষাতে বড় আঁটাআঁটি থাকে, কিন্তু তাঁদের অসাক্ষাতে বাড়ির অনেক ভাগ উদোম্ এলো হয়ে পড়ে ।

ক্রমে বাবুর ব্রিজকা চিংপুর রোডে এসে পড়লো । চিংপুর রোডে আজ গাড়ি ঘোড়ার অসম্ভব ভিড় । মাড়ওয়ারী খোঁট্টা ও বেগুারা খাতায় খাতায় ছকর ও কেরাঞ্চীতে রামলীলা দেখতে চলেচে ; যাঁরা যোত্রহীন, তাঁরাও সখের অনুরোধ এড়াতে না পেরে হেঁটেই চলেচেন—কল্কেতা সহরের এই একটি আজব গুণ যে মজুর হতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত সকলের মনে সমান সখ । বড়লোকেরা দানসাগরে যাহা নিকবাহ করবেন, সামান্য লোককে ভিক্ষা বা চুরি পর্য্যন্ত স্বীকার করেও কায়ক্রেমে তিলকাঞ্চনে সেটির নকল কস্তে হবে ।

আন্দাজ করুন, যেন এদিকে ছকড় ও বড় বড় গাড়ির গতিতে রাস্তার ধূলো উড়িয়ে সহর অন্ধকার করে তুলে । সূর্য্যদেবও সমস্ত দিন কমলিনীর সহবাসে কাটিয়ে সুরতপরিপ্রাস্ত লাগরের মত ক্লান্ত হয়ে ক্লান্তি দূর করবার জন্তই যেন

অস্তাচল আশ্রয় করলেন ; শ্রিয় সখী প্রদোষের পিছে পিছে অভিসারিণী সন্ধ্যাবধু
 ধীরে ধীরে সতিনী শর্করীর অনুসরণে নির্গতা হলেন ; রহস্যজ্ঞ অন্ধকার সমস্ত দিন
 নিড়তে লুকিয়ে ছিলো, এখন পাখিদের সঙ্গেতবাক্যে অবসর বুঝে ক্রমশ দিক্‌সকল
 আচ্ছাদিত করে নিশানাথের নিমিত্ত অপূর্ব বিহারস্থল প্রস্তুত কন্তে আরম্ভ করলেন ।
 এদিকে বাবুর ব্রিজ্‌কা রামলীলার রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হলো । রামলীলার রঙ্গভূমি,
 রাজা বাহাদুরের বাগানখানি পূর্বের সহরের প্রধান ছিল, কিন্তু কুলপ্রদীপ কুমারদের
 কল্যাণে আজকাল প্রকৃত চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেছে । পূর্বের রামলীলা ঐ রাজা
 বদ্দিনাথ বাহাদুরের বাগানেতেই হতো ; গত বৎসর হতে রহিত হয়ে রাজা নরসিংহ
 বাহাদুরের বাগানে আরম্ভ হয়েছে । নরসিংহ বাহাদুরের ফুলগাছের উপর যার পর
 নাই সখ ছিল এবং চিরকাল এই ফুলগাছের উপাসনা করেই কাটিয়ে গ্যাচেন,
 সুতরাং তাঁর বাগান সহরের শ্রেষ্ঠ হবে বড় বিচিত্র নয় । এমন কি, অনেকেই
 স্বীকার করেচেন যে, গাছের পারিপাট্যে রাজা বাহাদুরের বাগান কোম্পানির
 বাগান হতে বড় খাট ছিল না । কিন্তু বর্তমান কুমার বাহাদুর পিতার মৃত্যুর
 মাসেকের মধ্যে বাগানখানি অয়রান করে ফেলেন ; বড় বড় গাছগুলি উপড়ে বিক্রি
 করা হলো, রাজা বাহাদুরের পুরাতন জুতো পর্যন্ত পড়ে রইলো না, যে প্রকারে
 হোক টাকা উপার্জন করাই কুমার বাহাদুরের মতে কর্তব্য কর্ম । সুতরাং শেষে
 এই শ্রেষ্ঠ বাগান রামলীলার রঙ্গভূমি হয়ে উঠলো, ঘরে বাইরে বানর নাচতে
 লাগলো, সহরে সোরোত উঠলো এবার বদ্দিনাথের বদলে রাজা নরসিংহের বাগানে
 “রামলীলা” কিন্তু এবার গাড়ি ঘোড়ার টিকিট । রাজা বদ্দিনাথের বাগানে
 রামলীলার সময় টিকিট বিক্রি করা পদ্ধতি ছিল না, রাজা বাহাদুর ও অপর
 বড়মানুষে বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কন্তেন তাতেই সমুদায় খরচ কুলিয়ে উঠতো ।
 কিন্তু রাজা বদ্দিনাথ বুদ্ধাবস্থায় ছ তিন বৎসর হলো দেহত্যাগ করায় রাজকুমার
 সুবুদ্ধি বাহাদুরের বাগানখানি ভাগ করে নিলেন, মধ্যে দেইজি পাঁচিল পড়লো,
 সুতরাং অল্প বড়মানুষেরাও রামলীলায় তাদৃশ উৎসাহ দেখালেন না, তাতেই এবার
 টিকিট করে কতক টাকা তোলা হয় । বলতে কি, কলিকাতা বড় চমৎকার সহর ।
 অনেকেই রং ভামাশায় অপব্যয় কন্তে বিলক্ষণ আগ্রহ, টিকিট সঙ্গেও রামলীলার
 বাগান গাড়ি ঘোড়ায় ও জনতায় পরিপূর্ণ, লোকের বেজায় ভিড় ।

এদিকে বাবুর ব্রিজ্‌কা জনতার জমা অধিক দূর যেতে পারেন না, সুতরাং হজুর
 দল বল সমেত পায়দলে বেড়ানই সঙ্গত ঠাউরে গাড়ি হতে নেবে বেড়াতে বেড়াতে
 রঙ্গভূমির শোভা দেখতে লাগলেন ।

রঙ্গভূমির গেট হতে রামলীলার রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত ছু সারি দোকান বসেছে, মধ্যে মধ্যে নাগরদোলা ঘুচে—গোলাবী খিলি, খেলেনা, চেনচুর ও চীনের বাদাম প্রভৃতি ফিরিওয়ালাদের চাঁৎকার উঠছে। ইয়ারের দল খাতায় খাতায় প্যারেড করে বেড়াচ্ছে, রাঁড়, খোঁট্টা, বাজ্ঞে লোক ও বেণের দলই বারো আনা। রণক্ষেত্রের চার দিকে বেড়ার ধারে চার পাঁচ থাক্ গাড়ির সার, কোন গাড়ির ওপর এক জন সৌধীন ইয়ার ছু চার দোস্ত ও ছুই একটি মেয়েমানুষ নিয়ে মজা কছেন। কোনখানির ভেতরে চিনে কোট ও চুলের চেনওয়ালা চার জন ইয়ার ও একটি মেয়েমানুষ, কোনখানিতে গুটিকত পিল ইয়ার টেকা জ্যাঠা ছেলে ইঙ্কুলের বই বেচে পয়সা সংগ্রহ করে গোলাবী খিলি ও চরসে মজা লুঠছে। কতগুলি গাড়ি নিছক খোঁট্টা মাড়ওয়ারী ও মেডুয়াবাদী, কতকগুলি খোসপোশাকী বাবুতে পূর্ণ।

আমাদের হজুর এই সকল দেখতে দেখতে থল্লমল বাবুর হাত ধরে ক্রমে রণক্ষেত্রের দরজায় এসে পৌঁছিলেন—সেখায় বেজায় ভিড়! দশ বারো জন চৌকিদার অনবরত সপাসপ করে বেত মাছে ; ছ জন সার্জেন সবলে ঠেলে রয়েছে, তথাপি রাখতে পাচ্ছে না, থেকে থেকে “রাজা রামচন্দ্রজীকা জয়!” বলে খোঁট্টারা ও রণক্ষেত্রের মধ্য হতে বানরেরা চৌঁচিয়ে উঠছে, সকলেরি ইচ্ছা, রামচন্দ্রের মনোহর রূপ দেখে চরিতার্থ হবে, কিন্তু কার সাধ্য সহজে রামচন্দ্রের সমীপস্থ হয়।

হজুর অনেক কষ্টেই বেড়ার দ্বার পার হয়ে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে বানরের দলে মিশলেন। রণক্ষেত্রের অণু দিকে লক্ষা! মনে করুন সেখায় সাজা রাক্ষসেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ও বেড়ার নিকটস্থ মালভরা গাড়ির দিকে মুখ নেড়ে হিঁ হিঁ করে ভয় দেখাচ্ছে। সাজা বানরেরা লাফাচ্ছে ও গাছ পাথরের বদলে ছেঁড়া কুঁপো ও পাঁকাটি নিয়ে ছোড়াছুড়ি কচ্ছে—বাবু এই সকল অদৃষ্টের ব্যাপার দেখে যার পর নাই পরিতুষ্ট হয়ে বেড়ার পাশে পাশে হাঁ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, আরো ছ চার জন বেণে বড়মানুষ ও ব্যাড়া বনেদী বাবুরা ভিতরে এসে বাবুর সঙ্গে জুটে গেলেন, মধ্যে মধ্যে দালাল ও তুলোওয়ালা ইনফ্লুয়েন্সাল রিকর্মড খোঁট্টার দলের সঙ্গেও বাবুর সেখানে সাক্ষাৎ হতে লাগলো, কেউ “রাম রাম” কেউ “আদাব” কেউ “বন্দীগি” প্রভৃতি সেলামাকির সঙ্গে পানের দোনা উপহার দিয়ে বাবুর অভ্যর্থনা কতে লাগলো ; এঁরা অনেকে ছুই প্রহরের সময় এসেচেন, রাস্তির দশটার পর ভরপেট রামলীলে গিলে বাড়ি ফিরবেন।

রণক্ষেত্রের মধ্যে বাবু ও ছ চার সবস্ক্রাইবর বড়মানুষের ছেলেদের বেড়াতে দেখে ম্যানেজর বা তাঁর আসিষ্টেঁট দৌড়ে নিকটস্থ হয়ে পানের দোনা উপহার

দিয়ে রথক্ষেত্রের মধ্যস্থ ছু চার কাগজের সত্তের তরজমা করে বোঝাতে লাগলেন, কত গাড়ি ও আন্দাজ কত লোক এসেচে, তার একটা মনগড়া মিমো দিলেন ও প্রত্যেক বানর ভান্নুক ও রাক্ষসের সাজগোজের প্রশংসা কন্তেও বিস্মৃত হলেন না। বাবু ও অন্যান্য সকলে “এ দফে বড়ি আচ্ছা হয়, আর বরসু এসা নেহি হয়। ণা” প্রভৃতি কম্প্লিমেন্ট দিয়ে ম্যানেজারদের আপ্যায়িত কন্তে লাগলেন। এদিকে বাজিতে আগুন দেওয়া আরম্ভ হলো। ক্রমে চার পাঁচ রকম বাজে কেতার বাজি পুড়ে সে দিন রামলীলা বরখাস্ত হলো। রাম লক্ষ্মণকে আরতি করে ও ফুলের মালা দিয়ে প্রশংসা করে বাজে লোকেরা জন্ম সফল বিবেচনা করে ঘরমুখো হলো। কেরাখীর ঘোড়ারা বাতকর্ম্ম কন্তে কন্তে বহু কষ্টে গাড়ি নিয়ে প্রস্থান করলে। বাবু সেই ভিড়ের ভিতর হতে অতিকষ্টে গাড়ি চিনে নিয়ে সওয়ার হলেন—সে দিনের রামলীলার এই রকমে উপসংহার হলো।

আমাদেরো এ সকল বিষয়ে বড় সখ, স্মৃতাং আমরাও একখানি ছ্যাকুড়া গাড়ির পিছনে বসে রামলীলা দেখতে যাচ্ছিলেম, গাড়িখানির ভিতরে এক জন ছুতোর বাবু, গুটি দুই গেরসারী রাঁড় ও তাঁর চার পাঁচ জন দোস্ত ছিল, খানিক দূর যেতে না যেতেই একটা জন্মজ্যোঠা ফচকে হোঁড়া রাস্তা থেকে “গাড়োয়ান পিছু ভারি! গাড়োয়ান পিছু ভারি” বলে টেঁচিয়ে ওঠায় গাড়োয়ান “কে রে শালা” বলে সপাৎ করে এক চাবুক ঝাড়লে। ভেতর থেকে “আরে কে রে, ল্যে বে যা, ল্যে বে যা” চীৎকার হতে লাগলো—অগত্যা সে দিন আর যাওয়া হলো না, মনের সখ মনেই রইলো।

শরতের শশধর স্বচ্ছ শ্রাম গগনমাঝে নক্ষত্রসমাজে বিরাজ কচ্চেন দেখে প্রণয়িনী রজনী মানভরে অবগুণ্ঠনবতী হয়ে রয়েছেন। চক্রবাকদম্পতী কত প্রকার সাধ্যসাধনা কচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, সপত্নীর দুর্দশা দর্শন করে স্বচ্ছ সলিলে কুমুদিনী হাসতেছে, তাঁদের চির অনুগত চকোর চকোরী শর্বরীর দুঃখে ছঃখিত হয়ে তাঁরে তুড়ে ভৎসনা কচ্ছে, ঝিঝিপোকা ও উইচিংড়ারাও চীৎকার করে চকোর চকোরীর সঙ্গে যোগ দিতেছে, লম্পটশিরোমণির ব্যবহার দেখে প্রকৃতি সতী বিস্মিত হয়ে রয়েছেন, এ সময় নিকটস্থ হলে রজনীরঞ্জন বড় অপ্রস্তুত হবেন বলেই যেন পবন বড় বড় গাছপালার ও ঝোপে ঝোপের আশে পাশে আন্তে আন্তে পা টিপে টিপে চলেছেন। অভিমানিনী মানবতী রজনীর বিন্দু বিন্দু নয়র জল শিশিরচ্ছলে বনরাজি ও ফুলদামে অভিবিস্তৃত কচ্ছে।

এদিকে বাবুর ব্রিজ্কা ও বিলাতী জুড়ি টপাটপ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে ভ্রমাসনে

পৌছিল। বাবু ড্রেসিংরুমে কাপড় ছাড়তে গেলেন, সহচরেরা বৈঠকস্থানায় বসে ভামাক খেতে খেতে রামলীলার জ্ঞাওর কাটতে লাগলেন এবং সকলে মিলে প্রাণ খুলে ছ চার অপর বড়মানুষের নিন্দাবাদ জুড়ে দিলেন। বাবুও কিছু পরে কাপড়চোপড় ছেড়ে মজলিশে বার দিলেন, গুড়ুম্ করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।

বোধ হয়, মহিমার্গব পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে, বাবু রামভদ্রের হজুরের সঙ্গে রামলীলা দেখতে গিয়েছিলেন, বর্তমানে ছ চার বাজে কথার পর বাবু, রামভদ্রের বাবুকে ছ একটা টপ্পা গাইতে অনুরোধ কল্লেন, রামভদ্রের বাবুর গাওনা বাজনায়ে বিলক্ষণ সখ, গলাখানিও বড় চমৎকার, যদিও তিনি এ বিষয়ে পেশাদার নন; কিন্তু সহরের বড়মানুষ মহলে ঐ গুণেই পরিচিত, বিশেষত বাবু রামভদ্রের আজকাল সময় ভাল, কোম্পানির কাগজের দালালি ও গাঁতের মাল কেনার দরুন বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার কল্লেন, বাড়িতে নিতানৈমিত্তিক দোল ছুর্গোৎসবও ফাঁক যায় না। বাপ মার শ্রাদ্ধ ও ছেলে মেয়ের বিয়ের সময় দশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলা আছে। গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণেরা প্রায় বাবুর দলস্থ। কায়স্থ ও নবশাকও অনেকগুলি বাবুর অনুগত। কস্মাকাজের ভিড়ের দরুন ভদ্রের বাবুর বারো মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল মধ্যে পালপার্বণ ও ছুটিটা আস্টায় বাড়ি যাওয়া আছে। ভদ্রের বাবুর সহরের বাহুড়বাগানের বাসাতেও অনেকগুলি ভদ্রের লোকের ছেলেকে অন্ন দেওয়া আছে ও ছ চার জন বড়মানুষেও ভদ্রের বাবুরে বিলক্ষণ স্নেহ করে থাকেন। রামভদ্রের বাবু সিমলের রায় বাহাছরের সোনার কাটি রূপোর কাটি ছিলেন ও অগ্ণাঅ অনেক বড়মানুষেই এঁরে যথেষ্ট স্নেহ করে থাকেন, সুতরাং বাবু অনুরোধ করবামাত্র ভদ্রের বাবু তানপুরা মিলিয়ে একটি নিজ রচিত গান জুড়ে দিলেন, হলধর তবলা বাঁয়া ঠুকে নিয়ে বোলওয়াট ও ক্যালওয়াটের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ কল্লেন। রামলীলার নকশা এইখানেই ফুরাইলো।

রেলওয়ে

ছুর্গোৎসবের ছুটিতে হাওড়া হতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলেচে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাল কালো অক্ষরে ছাপানো ইংরেজী বাঙ্গালায় এস্তেহার মারা গ্যাচে; অনেকেই আমোদ করে বেড়াতে যাচ্ছেন—তীর্থযাত্রীও বিস্তর। জীপাঠ

নিম্নতলার প্রেমানন্দ দাস বাবাজীও এই অবকাশে বারাণসী দর্শন কন্তে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। প্রেমানন্দ বাবাজী ত্রীপাঠ জোড়াসাঁকোর প্রধান মঠের এক জন কেষ্ঠ বিষ্টুর মধ্যে, বাবাজীর অনেক শিষ্য সামন্ত ও বিষয় আশ্রয় প্রচুর ছিল। বাবাজীর শরীর স্থূল, ভুঁড়িটি বড় তাকিয়ার মত প্রকাণ্ড, হাত-পাগুলিও তদনুরূপ মাংসল ও মেদময়। বাবাজীর বর্ণ কষ্টিপাথরের মত, হাঁকোর খোলের মত ও খানসিকি হাঁড়ির মত চুকচুকে কালো। মস্তক কেশহীন করে কামান, মধ্যস্থলে লম্বাচুলের চৈতনচূটকি সর্বদা খোঁপার মত বাঁধা থাকতো ; বাবাজী বহুকাল কচ্ছ দিয়ে কাপড় পরা পরিহার করেছিলেন, স্মৃতরাং কোঁপীনের উপর নানা রঙের বহির্বাস ব্যবহার কতেন। সর্বদা সর্বদা গোপীমুক্তিকা মাখা ছিল ও গলায় পদ্মবাঁচি তুলসী প্রভৃতি নানাপ্রকার মালা সর্বদা পরে থাকতেন, তাতে একটি লাল বনাতে বড় বালিশের মত জপমালার থলি পিতলের কড়ায় আকঙ্ক ঝুলতো।

বাবাজী একটি ভাল দিন স্থির করে প্রত্যুষেই দৈনন্দিন কার্য সমাপন করলেন ও তাড়াতাড়ি যথাকথকিৎ বাড়ির বিগ্রহের প্রসাদ পেয়ে দুই শিষ্য ও তন্নিদার ও ছড়িদার সঙ্গে লয়ে মঠ হতে বেরিয়ে গাড়ির সন্ধানে চিৎপুর রোডে উপস্থিত হলেন। পাঠকবর্গ মনে করুন, যেন স্থূল ও আপিস খোলবার এখনো বিলম্ব আছে, রামলীলার মেলার এখনো উপসংহার হয় নি, স্মৃতরাং রাস্তায় গহনার কেঁরাকী থাকবার সম্ভাবনা কি, বাবাজী অনেক অনুসন্ধান করে শেষে এক গাড়ির আড্ডায় প্রবেশ করে অনেক কষামাজার পর এক জনকে ভাড়া যেতে সম্মত করলেন। এদিকে গাড়ি প্রস্তুত হতে লাগলো, বাবাজী তারি অপেক্ষায় এক বেণ্ডালয়ের বারাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ত্রীপাঠ কুমারনগরের জ্ঞানানন্দ বাবাজী প্রেমানন্দ বাবাজীর পরম বন্ধু ছিলেন। তিনিও রেলগাড়িতে চড়ে বারাণসী দর্শনে ইচ্ছুক হয়ে কিছু পূর্বেই বাবাজীর ত্রীপাঠে উপস্থিত হয়ে সেবাদাসীর কাছে শুনলেন যে, বাবাজীও সেই মানসে কিছু পূর্বেই বেরিয়ে গ্যাচেন, স্মৃতরাং এঁরই অনুসন্ধান কন্তে কন্তে সেইখানেই উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। জ্ঞানানন্দ বাবাজী যার পর নাই কুশ ছিলেন, দশ বৎসর জ্বর ও কাশি রোগ ভোগ করে শরীর শুকিয়ে ককি ও কাঠের মত পাকিয়ে গেছিল, চক্ষু দুটি কোটরে বসে গ্যাচে, মাংস মেদের লেশমাত্র শরীরে নাই, কেবল কথান কঙ্কালমাত্রে ঠেকেছে ; তায় এক মাখা ক্লক তেলহান চুল, একখানা মোটা নুই দুপাট করে গায়ে জড়ানো, হাতে একগাছা বেঁউড় বাঁশের বাঁকা লাঠি ও পায়ে এক জোড়া জগন্নাথী উড়ে জুতো। অনবরত কাশ্চেন ও গয়ার ফেলচেন এবং মধ্যে

মধ্যে শায়ুক হতে এক এক টিপ নস্ত লওয়া হচ্ছে। অনবরত নস্ত নিয়ে নাকের নলি এমনি অসাড় হয়ে গ্যাচে যে, নাক দিয়ে অনবরত নস্ত ও সর্দিমিশ্রিত কফজল গড়াচ্ছে, কিন্তু তিনি তা টেরও পাচ্ছেন না, এমন কি, এর দরুন তাঁরে ক্রমে খোনা হয়ে পড়তে হয়েছিল এবং আলজিবও খারাপ হয়ে যাওয়ায় সর্বদাই ভেট্‌কী মাছের মত হাঁ করে থাকতেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দের সাক্ষাৎ পেয়ে বড়ই আত্মশোকাবৃত্তি হলেন। প্রথমে পরস্পরে কোলাকুলি হলো, শেষে কুশল প্রশ্নাদির পর দুই বন্ধুতে দুই ভেয়ের মত একত্রে বারাদশী দর্শন কস্তে যাওয়াই স্থির করলেন।

এদিকে কেরাণ্ডী প্রস্তুত হয়ে বাবাজীদের নিকটস্থ হলো, তল্লিদার তল্লি নিয়ে ছাতে, ছড়িদার ও সেবাং পেছনে ও দুই শিশু কোচবস্ত্রে উঠলো। বাবাজীরা দুজনে গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রেমানন্দ গাড়িতে পদার্পণ করবার মাত্র গাড়িখানি মড়্‌মড়্‌ করে উঠলো, সামনে দিকে জ্ঞানানন্দ বসে পড়লেন। উপরের বারাদশী কতকগুলি বেঞ্জা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বাবাজীকে দেখে পরস্পর “ভাই! একটা একগাড়ি গোসাই দেখেছি! মিনসে যেন কুস্তকর্ণ” প্রভৃতি বলাবলি কস্তে লাগলো। গাড়োয়ান গাড়িতে উঠে সপাসপ্‌ করে চাবুক দিয়ে ঘোড়ার রাস হ্যাঁচকাতে হ্যাঁচকাতে জিবে ট্যাক্‌ ট্যাক্‌ শব্দ করে চাবুক মাথার পরে ঘোরাতে লাগলো, কিন্তু ঘোড়ার সাধ্য কি যে এক পা নড়ে; কেবল অনবরত নাখি ছুড়তে লাগলো ও মধ্যে মধ্যে বাতকর্ষ করে আসর জমকিয়ে দিলে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে, আমরা পূর্বেই বলে গেছি, কলিকাতা আজব সহর! ক্রমে রাস্তায় লোক জমে গ্যালো। এই ভিড়ের মধ্যে একটা চীনের বাদামওয়ালা ফচকে ছোঁড়া বলে উঠলো, “ওরে গাড়োয়ান! এক দিকে একটা ধুম্রলোচন ও আর এক দিকে একটা চিম্‌ড়ে সওয়ারি, আগে পাষণ ভেঙ্গে নে, তবে গাড়ি চলবে।” অমনি উপর থেকে বেঞ্জারা বলে উঠলো, “ওরে এই রোপা মিন্‌সেটার গলায় গোটাকতক পাথর বেঁধে দে, তা হলে পাষণ ভাঙ্গা হবে।” প্রেমানন্দ এই সকল কথাতে বিরক্ত হয়ে ঘৃণা ও ক্রোধে জ্বলে উঠে খানিক ক্ষণ ঘাড় গুঁজে রইলেন, শেষে ঈষৎ ঘাড় উঁচু করে জ্ঞানানন্দকে বললেন, “ভায়া! সহরের জীলোকগুলো কি ব্যাপিকা দেখচো!” ও শেষে “প্রভো তোমার ইচ্ছা” বলে হাই তুললেন! জ্ঞানানন্দও হাই তুললেন ও ছবার তুড়ি দিয়ে এক টিপ নস্ত নিয়ে বললেন, “ঠিক বুলেঁটো দাঁদা, ওরা ভস্তার কাছে উঁপদেশ পাওঁদা নাঁও, ওঁঞাদের রামা রজিকার পাঠ দেওঞা উঁচিত।”

প্রেমানন্দ রামারজিকার নাম শুনে বড়ই পুলকিত হয়ে বলেন, “ভায়া না হলে আর মনের কথা কে বলে, রামারজিকার মত পুঁথি ত্রিঙ্গগতে নাই, প্রভো তোমার ইচ্ছা!” জ্ঞানানন্দ এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এক টিপ নশু নিয়ে অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে মাথাটা চুলকে বলেন, “দাঁদা শুনেচি বিবির। নাকি রামারজিকা পড়ছে।” প্রেমানন্দ অমনি আহ্লাদে “আরে ভায়া, রামারজিকা পুঁথির মত ত্রিঙ্গগতে জ্ঞান পুঁথি নাঞি। প্রভো তোমার ইচ্ছা।”

এদিকে অনেক কসলাতের পর কেরাঞ্চী গুড়ি গুড়ি চলতে লাগলো, তল্লিদারেরা গাড়ির ছাতে বসে গাঁজা টিপতে লাগলেন, মধ্যে শরতের মেঘে এক পশলা ভারী বৃষ্টি আরম্ভ হলো, বাবাজীরা গাড়ির দরজা ঠেলে দিয়ে অন্ধকারে বারোইয়ারির গুদমজাত সংগুলির মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন। খানিক ক্ষণ এইরূপ নিস্তব্ধ হয়ে থেকে জ্ঞানানন্দ বাবাজী একবার গাড়ির ফাটলে চক্ষু দিয়ে বৃষ্টি কিরূপ পড়চে তা দেখে নিয়ে এক টিপ নশু নিলেন ও বার দুই কেশে বলেন, “দাঁ দাঁ অ্যাকটা সংকীর্তন হাঁক, শুঁধু শুঁধু বসে কীল না হরছে এগ্না।” প্রেমানন্দ সংগীতবিভাগ বড় প্রিয় ছিলেন, নিজে ভাল গাইতে পারেন আর নাই পারেন, আড়ালে ও নির্জনে সর্বদা গলাবাজি কতেন ও দিবারাত্র গুনগুনোনির কামাই ছিল না। এ ছাড়া বাবাজী সংগীতবিষয়ক একখানা বইও ছাপিয়েছিলেন এবং ঐ সকল গান প্রথম প্রথম ছ এক গৌড়ার বাড়ি মজলিশ করে গায়ক দিয়ে গাওয়ানো হয়, সুতরাং জ্ঞানানন্দের কথাতে বড়ই প্রাফুল্লিত হয়ে মল্লার ভেঁজে গান ধলেন—পাঠশালার ছেলেরা যেমন ঘোষাবার সময় সদার পোড়োর সঙ্গে গোলে হরিবোল দিয়ে গুণায় এ্যাণ্ডা বোলে সায় দিয়ে যায়, সেই প্রকার জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দের সংগীত শুনে উৎসাহান্বিত হয়ে মধ্যে মধ্যে দুই একটা তান মারতে লাগলেন। ভাঙা ও খোনা আওয়াজের একত্র চীৎকারে গাডোয়ান গাড়ি থামিয়ে ফেললে, তল্লিদার তড়াক করে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে গাড়ির দরজা খুলে ছাথে যে বাবাজীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে চীৎকার করে গান ধরেচেন! রাস্তার ধারে পাহারাওয়ালারা তামাক খেতে খেতে ঢুলতেছিল, গাড়ির ভেতরের বেতরো বেয়াড়া আওয়াজে চমকে উঠে কলকে ফেলে দোড়ে গাড়ির কাছে উপস্থিত হলো। দোকানদারেরা দোকান থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো, কিন্তু বাবাজীরা প্রভুপ্রেমগানে এমনি মেতে গিয়েছিলেন যে, তখনো তান মারা থামে নি। শেষে সহসা গাড়ি থামা ও লোকের গোলে চৈতন্ত হলো ও পাহারাওয়ালাকে দেখে কিকিৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা নগ্না মুটে ঝাঁক ঝাঁক করে বেকার চলে যাচ্ছিল,

এই ব্যাপার দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে “পুঞ্জির বাই গাড়িমদ্দি ক্যালাবতী লাগাইচেন” বলে চলে গেল। পাহারাওয়ালাকে কলকে পরিত্যাগ করে আসতে হয়েছিল বলে সেও বাবাজীদের বিলক্ষণ লাল্হনা করে পুনরায় দোকানে গিয়ে বসলো। রেলওয়ে ব্যাপ হাতে এক জন সহরে নব্য বাবু অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ির অপেক্ষায় এক দোকানে বসেছিলেন, বৃষ্টিতে তাঁর রেলওয়ে টরমিনসে উপস্থিত হবার বিলক্ষণ ব্যাঘাত কতেছিল, এক্ষণে বাবাজীদের গাড়োয়ানের সঙ্গে ঐ অবকাশে ভাড়া চুক্তি করে ছড়মুড় করে গাড়ি মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এদিকে গাড়োয়ানও গাড়ি হাঁকিয়ে দিলে। তল্লিদার খানিক দৌড়ে দৌড়ে শেষে গাড়ির পেছনে উঠে পড়লো।

আমাদের নব্য বাবুকে এক জন বিখ্যাত লোক বল্লেও বলা যায়, বিশেষতঃ সহরের সন্নিবটবর্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থলে একটি ব্রাহ্ম সভা স্থাপন করে স্বয়ং তার সম্পাদক হয়েছিলেন, এ সওয়ায় সেই গ্রামেই একটি ভারী মাইনের চাকরি ছিল। নব্য বাবু রিফর্মড ক্লাসের টেকা ও সমাজের রঞ্জের গোলামস্বরূপ ছিলেন, দিবারাত্র “সামিগ্রী কন্তেন” ও সর্বদাই ভরপুর থাকতেন—শনিবার ও রবিবার কিছু বেশী মাত্রায় কারগো নিতেন, মধ্যে মধ্যে বানচাল হওয়ারও বাকি থাকতো না। প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ফরগিচর ও লাইব্রেরীর বই কিন্তে বাবু ছুটি নিয়ে সহরে এসেছিলেন, কদিন খোঁড়া ব্রহ্মের সমাজেই প্রকৃতির প্রীতি ও প্রিয়কার্য সাধন করে বিলক্ষণ ব্রহ্মানন্দ লাভ করা হয়। মাতাল বাবু গাড়ির মধ্যে ঢুকে প্রথমে প্রেমানন্দ বাবাজীর ভুঁড়ির উপর টলে পড়লেন, আবার ধাক্কা পেয়ে জ্ঞানানন্দের মুখের উপর পড়ে পুনরায় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে টলে পড়লেন। বাবাজীরা উভয়ে তটস্থ হয়ে মুখ চাওয়াচায়ি কতে লাগলেন। মাতাল কোথা বসবেন, তা স্থির কতে না পেরে মোহলমানদের গাজীমিয়ার ধবজার মত একবার এ পাশ একবার ও পাশ কতে লাগলেন।

বাবাজীরা মাতাল বাবুর সঙ্গে এক খাঁচায় পোরা বাজ ও পায়রার মত বাস করুন, ছকড়খানি ভরপুর বোঝাইয়ে নবাবী চ্যেলে চলুক, তল্লিদাররা অনবরত গাঁজা ফুঁকতে থাক। এদিকে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় সহর আবার পূর্বানুরূপ গুলজার হয়েছে—মধ্যাবস্থ গৃহস্থরা বাজার কতে বেরিয়েচেন, সঙ্গে চাকর ও চাকরাণীরা ধামা ও চাক্কারি নিয়ে পেছু পেছু চলেচে। চিংপুর রোডে মেঘ কলে কাদা হয়, সুতরাং কাদার জন্ত পথিকদের চলবার বড়ই কষ্ট হচে, কেউ পয়নালার উপর দিয়ে, কেউ খানার ধার দিয়ে জুতো হাতে করে কাপড় তুলে চলেচেন। আলু পটল! ঘি চাই! গুড়! ও ঘোল! ফিরিওয়ালারা চীৎকার কতে কতে

যাচ্ছে, পাছে মেচুনিরা মাছের চূপড়ি মাথায় নিয়ে হাত নেড়ে হন্ হন্ করে ছুটেচে, কাক সঙ্গে মেছোর কাঁধে বড় বড় ভেটকী ও মৌলবীর মত চাঁপদাড়ি ও জামাজোড়া পরা চিড়ি ভরা বাজরা ও ভার। রাজার বাজার, লালা বাবুর বাজার, পোস্তা ও কাপুড়ে পটী জনতায় পরিপূর্ণ। দোকানে বিবিধ সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে, দোকানদারেরা ব্যতিব্যস্ত, খদ্দেরদের বেজায় ভিড়! শীতলা ঠাকরুণ নিয়ে ডোমের পণ্ডিত মন্দিরের সঙ্গে গান করে ভিক্ষা কচ্ছে, খঞ্নি ও একতারা নিয়ে বষ্টুম ও নেড়া নেড়ীরা গান কচ্ছে, চার পাঁচ জন তিন দিবস আহার হয় নাই, “বিদেশী ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর! দাতালোক” ঘুচ্ছেন, অনেকের মৌতাতের সময় উদ্ভীর্ণ হয়েছে, অন্য কোন উপায় নাই, কিছু উপার্জনও হয় নাই, মদতওয়ালা ধার দেওয়া বন্ধ করেছে, গত কল্যা গায়ের চাদরখানিতে চলেচে—আজ আর সম্বলমাত্র নাই। মেথরেরা ময়লা ফেলে এসে মদের দোকানে ঢুকে কসে রম টানচে ও মুদ্ফরাশদের সঙ্গে উভয়ের অবলম্বিত পেশার কোন্টা উত্তম, তারি তকুরার হচ্ছে। শূঁড়ী মধ্যস্থ হয়ে কখন মুদ্ফরাশের কাজ মেথরের পেশা হতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে মুদ্ফরাশকে সন্তুষ্ট কছেন, কখন মেথরের পেশা শ্রেষ্ঠ বলে মানচেন। ঢুলী, ডোম, কাওরা ও ছলে বেহারারা কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের খ্যায় উভয় দলের সহায়তা কচ্ছে; হয় ত এমন সময় এক দল ঝুমুর বা গদাইনা চ আসরে উপস্থিত চবামাত্র তর্কায়িতে একবারে জল দেওয়া হলো—মদের দোকান বড়ই সরগরম। সহরের দেবতার পর্য্যন্ত রোজগারে। কালী ও পঞ্চানন্দ প্রসাদী পাঁঠার ভাগা দিয়ে বসেচেন, অনেক ভক্তলোকের বাড়ি উঠনো বরাদ্দ করা আছে, কোথাও রসুই করা মাংসেরও সরবরাহ হয়, খদ্দের দলে মাতাল, বেগে ও বেগুাই বারো আনা। আজকাল পাঁঠা বড় হুস্ত্রাপ্য ও অগ্নিমূল্য হওয়ায় কোথাও কোথাও পাঁঠি পর্য্যন্ত বলি হয়, কোন স্থলে পোষা বিড়াল ও কুকুর পর্য্যন্ত কেটে মাংসের ভাগায় মিশাল দেওয়া হয়! যে মুখে বাজারের রসুই করা মাংস অক্লেশে চলে যায়, সেখান বেরাল, কুকুর ফ্যালবার সামগ্রী নয়। জলচর ও খেচরের মধ্যে নোকো ও ঘুড়ি ও চতুষ্পদের মধ্যে কেবল খাট খাওয়া নাই।

পাঠকগণ! এতক্ষণ আপনাদের প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দের গাড়ি রেলওয়ে টারমিনসে পৌঁছুলো প্রায়, দেখুন! আপনাদের বৈঠকখানার ঘড়ি নটা বাজিয়ে দিয়ে পুনরায় অবিশ্রান্ত টুকটাক করে চলচে, আপনারা নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে ক্লান্ত হন, চন্দ্র ও সূর্য্য অস্তাচলে আরাম করেন, কিন্তু সময় এক পরিমাণে চলচে, ক্ষণকালের তরে অবসর, অবকাশ বা আরামের উপেক্ষা বা প্রার্থনা করে

না। কিন্তু হায়! আমরা কখন কখন এই অমূল্য সময়ের এমনি অপব্যয় করে থাকি যে, শেষে ভেবে দেখে তার জন্য যে কত ভীতের পরিতাপ সহ্য করতে হয়, তার ইয়ত্তা করা যায় না।

এদিকে ব্রাহ্ম বাবু শেষে থপ্ করে জ্ঞানানন্দের কোলে বসে পড়লেন, ব্রাহ্মবাবুর চাপনে জ্ঞানানন্দ মৃতপ্রায় হয়ে গুড়িগুড়ি মেরে পেনেলসই হয়ে রইলেন, বাবু সরে সামনে বসে খানিক একদৃষ্টে প্রেমানন্দের পানে চেয়ে ফিক্ করে হেসে রেলওয়ে ব্যাগটি পায়দানে নাবিয়ে জ্ঞানানন্দের দিকে একবার কটাক্ষ করে নিয়ে পকেট হতে প্রেসিডেন্সি মেডিকেল হল ল্যাবেল দেওয়া একটি ফায়ের বার করে শিশির সমুদায় আরকটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে খানিক মুখ বিকৃত করে ক্রমালে মুখ পুঁচে জেব হতে ছুঁছুমো সুপরি বার করে চিবুতে লাগলেন। প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ব্রাহ্ম বাবুর গাড়িতে ওঠাতেই বড় বিরক্ত হয়েছিলেন এবং উভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেছিলেন, কারণ বাবুর একটি কালো বনাতের পেনটুলেন ও চাপকান পরা ছিল, তার ওপর একটা নীল মেরিনোর চায়নাকোট, মাথায় একটা বিভর হেয়ারের চোঙ্গাকটা ট্যাসল লাগানো ক্যাটিকুট ক্যাপ ও গলায় লাল ও হলুদে রঞ্জের জালবোনা কমফটার, হাতে একটি কার্পেটের ব্যাগ ও একটা বিলিভী ওকের গাঁট বার করা কোঁদো কোঁৎকা। এতস্তি বাবুর সঙ্গে একটি ওয়াচ ছিল, তার নিদর্শনস্বরূপ একটি চাবি ও দুটি শিল চুলের গার্ডচেনে ঝুলছে, হাতের আঙ্গুলে একটি আংটিও পরা ছিল, জ্ঞানানন্দ ঠাউরে ঠাউরে দেখলেন যে, সেটির ওপরে “ওঁ তৎ সৎ” খোদা রয়েছে। ব্রাহ্ম বাবু আরকের ঝাঁজ সামলে প্রেসিডেন্সি ডাক্তারখানার ল্যাবেল মারা ফায়েরটা গাড়ি হতে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে দেখলেন, প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ একদৃষ্টে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন, সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে একটু মুচকে হেসে জ্ঞানানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, “প্রভু! আপনার নাম?” জ্ঞানানন্দ, বাবুকে তাঁর দিকে ফিরে কথা কবার উত্তম দেখেই শঙ্কিত হয়েছিলেন, এখন প্রথম একবার এক টিপ নম্রা নিলেন, শায়ুকটা বার ছুঁচার ঠুকলেন, শেষে অতিকষ্টে “আমার নাম পুঁচ করছেন? আমার নাম শ্রীজ্ঞানানন্দ দাস দেব, নিখাঁস শ্রীপাট কুমারনগর।” মাতাল বাবু নাম শুনে পুনরায় একটু মুচকে হেসে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, “দেব বাবাজীর গমন কোথায় হবে?” জ্ঞানানন্দ এ কথায় কি উত্তর দিবেন, তা স্থির করতে না পেরে প্রেমানন্দের মুখ চেয়ে রইলেন। প্রেমানন্দ জ্ঞানানন্দ হতে চালাক চোস্ত ও খড়িবাজ লোক, অনেক স্থলে পোড়

খাওয়া হয়েছে, সুতরাং এই অবসরে বল্লেন, “বাবু, আমরা দুই জনেই গৌসাই-গোবিন্দ মাতুষ। ইচ্ছা, বারাণসী দর্শন করে বৃন্দাবন যাব, বাবুর নাম?” মাতাল বাবু পুনরায় কিঞ্চিৎ হাসলেন ও পকেট হতে ছ ডুমো সুপুри মুখে দিয়ে বল্লেন, “আমার নাম কৈলাসমোহন, বাড়ি এইখানেই, কর্মস্থানে যাওয়া হচ্ছে।” প্রেমানন্দ, বাবুর নাম শুনে কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করে বল্লেন, “ভাল ভাল, উত্তম!” ব্রাহ্ম বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা কল্লেন, “দেব বাবাজী কি আপনার ভ্রাতা?” এতে প্রেমানন্দ বল্লেন, “হাঁ বাপু, এক প্রকার ভ্রাতা বল্লেও বলা যায়; বিশেষতঃ সহধর্মী, আরো জ্ঞানানন্দ ভায়া বিখ্যাতবংশীয়—পূজ্যপাদ জয়দেব গোস্বামী ওনার পূর্ব-পিতামহ।” মাতাল বাবু এই কথায় ফিক্ করে হাসলেন ও প্রেমানন্দকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, “উনি তো জয়দেবের বংশ, প্রভু কার বংশ? বোধ হয় নিতাই চৈতন্যের স্ববংশীয় হবেন?” এই কথায় রহস্ত বিবেচনায় প্রেমানন্দ চুপ করে গৌ হয়ে বসে রইলেন। মনে মনে যে যার পর নাই বিরক্ত হয়েছিলেন, তা তাঁর মুখ দেখে ব্রাহ্ম বাবু জানতে পেরে অপ্রস্তুত হবার পরিবর্তে বরং মনে মনে আত্মদিত হয়ে বাবাজীদের যথাসাধ্য বিরক্ত কতে কৃতনিশ্চিত হয়ে প্রেমানন্দের দিকে ফিরে বল্লেন, “প্রভু! দিব্বি সেজেচেন। সহসা আপনারে দেখে আমার মনে হচ্ছে, যেন কোথাও যাত্রা হবে, আপনারা সেজে গুজে চলেচেন। প্রভু একটি গান করুন দেখি, মধ্যে আপনাদের তানের ধমকে তো একবার রাস্তায় মহামারী ব্যাপার ঘটে উঠেছিল, দেখা যাক্ আবার কি হয়! শুনেচি প্রভু সাক্ষাৎ তানস্থান।” প্রেমানন্দের সঙ্গে বাবুর এই প্রকার যত কথাবার্তা হচ্ছে, জ্ঞানানন্দ ততই ভয় পাচ্ছেন ও মধ্যে মধ্যে গাড়ির পার্শ্ব দিয়ে দেখছেন রেলওয়ে টরমিনস কত দূর, শীঘ্র পৌঁছলে উভয়ের এই ভয়ানক ব্যালীকের হাত হতে পরিত্রাণ হয়।

এদিকে ব্রাহ্ম বাবুর কথায় প্রেমানন্দও বড়ই শঙ্কিত হতে লাগলেন, ছেলেবেলা তাঁর মাতাল, ঘোড়া ও সাহেবদের উপর বিজাতীয় ভয় ও ঘৃণা ছিল, তিনি অনেক বার মাতালের ভয়ানক অত্যাচারের গল্প শুনেছিলেন। একবার এক জন মাতাল বাবু তাঁর হরিমন্দিরাটি জিব দিয়ে চেটে নিয়েছিলো ও কিছু দিন হলো আর এক প্রিয়শিশু একটা ভেটো ঘোড়ার নাখিতে অসময়ে প্রাণত্যাগ করে, সুতরাং অতি বিনীতভাবে বল্লেন, “বাবু! আমরা গৌসাইগোবিন্দ লোক, সংগীতের আমরা কি ধার ধারি! তবে প্রেম্‌সে কহো রাখাবিনোদ, হরি ভক্তের প্রেমের—তাঁরি প্রেমে ছুটো সংকীর্ণন করে মনকে শান্ত করি থাকি।” ক্রমে ব্রাহ্ম বাবু সেই

ক্ষণমাত্র সেবিত আরকের তেজ অনুভব কতে লাগলেন, ঘাড়টি ছলতে লাগলো, চক্ষু দুটি পাকলো হয়ে জিব কথকিং আড়ষ্ট হতে লাগলো ; অনেক ক্ষণের পর “ঠিক বলেচো বাপ !” বলে গাড়ির গদি ঠেস দিয়ে হেলে পড়লেন এবং খানিক ক্ষণ এই অবস্থায় থেকে পুনরায় উঠে প্রেমানন্দের দিকে ওৎ করে ঝুঁকতে লাগলেন ও শেষ তাঁর হাতটি ধরে বল্লেন, “বাবাজী ! আমরা ইয়ারলোক, প্রাণ গড়ের মাঠের মত খোলা। শোনো একটা গাই, আমিও বিস্তর চপের গীত জানি, প্রভুর সেবাদাসী আছে তো ?” বলে হা ! হা ! হা ! হেসে টলে জ্ঞানানন্দের মুখের উপর পড়ে হাত নেড়ে চীৎকার করে এই গান ধল্লেন,

চায় মন চির দিন, পুজিতে সেই পুতুলে ।

রং চঙ্গে চক্চকে, সাথে কি ছেলে ভুলে ॥

ডাক রাং অভূরে, চিকমিক্ ঝিকমিক্ করে ।

তায় সোনালী রূপালী, চুম্বি বসমা আলো ধরে ॥

আহ্লাদে পেহ্লাদে কেলৈ, তামাকথেগো বুড়ো ফেলৈ ।

কও কেমনে রহিব খেলাঘর কিসে চলে ॥

চির পরিচিত প্রণয় সহজে কি ভগ্ন হয় ।

থেকে থেকে মন ধায় চোরাসিজী পাটের চুলে ॥

শম্মার সাহস বড় ভুতের নামে জড়োসড়ো,

ঘরে আছেন গুণবতী, গঙ্গাজলে গোবর গুলে ॥

সঙ্গীত শেষ হবার পূর্বেই কেরাধী রেলওয়ে টারমিনসে উপস্থিত হলো। আক্ষ বাবু টল্‌তে টল্‌তে গাড়ি থামবার পূর্বেই প্রেমানন্দের নাকটা খাম্চে নিয়ে ও জ্ঞানানন্দের চুলগুলা ধরে গাড়ি হতে তড়াক করে লাফিয়ে পড়লেন ।

আজ আরমাণিঘাট লোকারণ্য, গাড়ি পালকির যেক্রপ ভিড়, লোকেরও সেইরূপ রল্লা। বাবাজীরা সেই ভিড়ের মধ্যে অতিকষ্টে গাড়ি হতে অবতীর্ণ হলেন। তল্লিদার, ছড়িদার, সেবাৎ ও শিখরা পরস্পরের পদানুরূপ প্রোসেসন বেঁধে প্রভুদয়কে মধ্যে করে শ্রেণী দিয়ে চল্লেন। জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ দুজনে পরস্পর হাত ধরাধরি করে হেলতে ছল্‌তে যাওয়ায় বোধ হতে লাগলো যেন একটা আরঙলো ও কাঁচপোকা একত্র হয়ে চলেচে।

টুনুনাং টাং টুনুনাং টাং করে রেলওয়ে ইষ্টিম ফেরী ময়ূরপঙ্খীর ছাড়বার সঙ্কেতঘণ্টা বাজ্‌চে, থার্ডক্লাস বুকিং আপিসে লোকের ঠেল মেরেচে, রেলওয়ের চাপরাসীরা সগাসপ্‌ বেত মাচ্ছে, ঋক্কা দিচ্ছে ও গুঁতো লাগাচ্ছে, তথাপি নিবৃত্তি

নাই। “মশাই শ্রীরামপুর!” “বালি বালি!” “বর্জমান মশাই!” “আমার বর্জমানেরটা দিন না” শব্দ উঠে, চারি দিকে কাঠের বেড়াঘেরা বুকিংক্লার্ক সঙ্ঘা পূজার অবসরমত ঝোপ বুঝে কোপ ফেলছেন। কারো টাকা দিয়ে চার আনার টিকিট ও ছুই দোয়ানি দেওয়া হচ্ছে, বাকি চাবামাত্র ‘চোপ রও’ ও ‘নিকালো’, কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকিট বেক্রছে, কেউ টিকিটের দাম দিয়ে দশ মিনিট চীৎকার করে, কিন্তু সে দিকে আক্ষেপমাত্র নাই। কমফর্টর মাথায় জড়িয়ে ঝড়াক্ ঝড়াক্ করে কেবল টিকিটে নম্বর দেবার কল নাড়ছেন, শিস দিচ্ছেন ও উপরি পয়সা পকেটে ফেলছেন, পাইখানার কাটা দরজার মত ক্ষুদ্র জানলাটুকুতে অনেকে হজুরের মুখ দেখতে পাচ্ছে না যে কথা কয়ে আপনার কাজ লয়। যদি চীৎকার করে ক্লার্ক বাবুর চিন্তাকর্ষণ কন্ডে চেঁচা করে, তখনি রেলওয়ে পুলিশের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে। এদিকে সেকেন ক্লাস ও গুড্‌স ও লগেজ ডিপার্টমেন্টেও এই প্রকার গোল, সেখানে ক্লার্কবাবুরাও কতক এই প্রকার, কিন্তু এত নয়। ফাষ্ট ক্লাস সাহেব বিবির স্থল, সেখানে টু’ শব্দটি নাই, ক্লার্ক রিক্তহস্তে টিকিট বেচতে আসেন ও সেই মুখেই ফিরে যান, পান তামাকের পয়সাও বিলক্ষণ অপ্রতুল থাকে। বাবাজীরা নটবরবেশে থার্ড ক্লাস বুকিং আপিসের নিকট যাচ্ছেন, এমন সময় টুহুনাংটাং টুহুনাংটাং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠলো, কৌস্ কৌস্ করে ইষ্টিমারের ইষ্টিম ছাড়তে লাগলো, লোকেরা রল্লা বেঁধে, জেটি দিয়ে ইষ্টিমারে উঠতে লাগলো—জল্দি! চলো! চলো! শব্দে রেলওয়ে পুলিশের লোকেরা হাঁকতে লাগলো। বাবাজীরা অতি কষ্টে সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে টিকিট চাইলেন। বুকিং ক্লার্ক বাবাজীদের চেহারা দেখে ফিক্ করে হেসে হাত বাড়িয়ে টাকা চেয়ে নিয়ে টিকিট কাটতে লাগলেন। এদিকে ব্যাপ্ ব্যাপ্ ব্যাপ্ শব্দে ইষ্টিমারের জুইল ঘুরে ছেড়ে দিলে। এদিকে প্রেমানন্দ “মশাই টিকিটগুলি শীঘ্র দিন শীঘ্র দিন ইষ্টিম খুলো ইষ্টিম চলো” বলে চীৎকার কন্ডে লাগলেন, কিন্তু কাটা কপাটের হজুরের আক্ষেপ নাই, শিস দিয়ে “মদন আগুন জল্চে দ্বিগুণ কল্পে কি গুণ ঐ বিদেশী” গান ধল্লেন—“মশাই শুন্‌চেন কি? ইষ্টিম খুলে গ্যালো, এর পর গাড়ি পাওয়া ভার হবে, এ কি অত্যাচার মশাই!” ক্লার্ক “আরে থামো না ঠাকুর” বলে এক দাবড়ি দিয়ে অনেক ক্ষণের পর কাটা দরজা হতে হাত বাড়িয়ে টিকিটগুলি দিয়ে দরজাটি বন্ধ করে পুনরায় “ইচ্ছা হয় যে উহার করে প্রাণ সঁপে সই হইগে দাসী, মদন আগুন—” “মশাই বাকি পয়সা দিন, বলি দরজা দিলেন যে?” সে কথায় কে আক্ষেপ করে?

“জমাদার ভিড় সাফ্ করো, নিকালো, নিকালো” বলে ক্লার্ক সেই কাটগড়ার ভেতর থেকে চৌচিয়ে উঠলেন, রেল পুলিশের পাহারাওলা ধাক্কা দিয়ে বাবাজীদের দলবলসমেত টরমিনস্ হতে বার করে দিলে—প্রেমানন্দ মনে মনে বড়ই রাগত হয়ে মধ্যে মধ্যে ফিরে ফিরে বুকিং আপিসের দিকে চাইতে লাগলেন। এদিকে ক্লার্ক কাটা দরজার ফাটল দিয়ে মদন অগুনের শেষটুকু গাইতে গাইতে উঁকি মাতে লাগলেন।

বাবাজীরা কি করেন, অগত্যা টরমিনস্ পরিহার করে অশ্রু ঘাটে নৌকার চেষ্টায় বেরুলেন—ভাগ্যক্রমে সেই সময় পাশের ঘাটের গহনার ইষ্টিমারখানি খোলে নাই। বাবাজীরা আপনাপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়ে অতিকষ্টে সেই ইষ্টিমারে উঠে পেরিয়ে পড়লেন—গহনার ইষ্টিমারে অসংখ্য লোক ওঠাতে বাবাজীরা লোকের চপ্টানে হটপ্রোসের ফরমার মত ও ইঙ্কু কলের গাঁটের মত জাঁত সহ্য করে পারে পড়ে কথঞ্চিৎ আরাম পেলেন এবং নদীতীরে অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করেই এষ্টেশনে উপস্থিত হলেন। টুন্সনাংটাং টুন্সনাংটাং শব্দে একবার ঘণ্টা বাজলো। বাবাজীরা একবার ঘণ্টা বাজবার উপেক্ষা করার ক্রেশ ভুগে এসেছেন, স্মৃতরাং এবার মুকুয়ে তল্লিতল্লা নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষা কস্তে লাগলেন—প্রেমানন্দ ঘাড় বাঁকিয়ে ট্রেনের পথ দেখছেন, জ্ঞানানন্দ নশ্রু লবার জন্ম শামুকটা ট্যাঁকে হতে বার করবার সময় জ্ঞাথেন যে, তাঁর টাকার গঁজ্জিটি নাই। অমনি “দাঁদাঁ সর্ব্বনাশএ হলোঁ! সর্ব্বনাশএ হলোঁ! আমার গঁজ্জিটি নাই” বলে কাঁদতে লাগলেন; প্রেমানন্দ, ভায়ার চীৎকার ও ফ্রন্দনে যার পর নাই শোকার্ত হয়ে চীৎকার করে গোল কস্তে আরম্ভ কল্লেন, কিন্তু রেলওয়ে পুলিশের পাহারাওয়লা ও জমাদারেরা “চপ্‌রাও” “চপ্‌রাও” করে উঠলো, স্মৃতরাং পাছে পুনরায় এষ্টেশন হতে বার করে ছায় এই ভয়ে আর বড় উচ্চবাচ্য না করে মনের খেদ মনেই সম্বরণ কল্লেন। জ্ঞানানন্দ মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে লাগলেন ও ততই নশ্রু নিয়ে নিয়ে শামুকটা খালি করে তুল্লেন।

এদিকে হস্ হস্ হস্ করে ট্রেন টরমিনসে উপস্থিত হলো, টুন্সনাংটাং টুন্সনাংটাং করে পুনরায় ঘণ্টা বাজলো, লোকেরা রল্লা করে গাড়ি চড়তে লাগলো, থার্ড ক্লাসের মধ্যে গার্ড ও ছজন বরকন্দাজের সহায়তায় লোক পোরা হতে লাগলো, ভেতর থেকে “আর কোথা আস্‌চো!” “সাহেব আর জায়গা নাই” “আমার বুঁচকি! আমার বুঁচকিটা দাও।” “ছেলেটি দেখো! আ মলো মিলে ছেলের ঘাড়ে বসেছিচ্‌ যে!” চীৎকার হতে লাগলো, কিন্তু রেলওয়ে কর্মচারীরা বিধিবদ্ধ নিয়মের অনুগত বলেই তাদৃশ চীৎকারে কর্ণপাত করেন না! এক একখানি থার্ড

ক্লাস কঁাকড়ার গর্ডের আকার ধারণ কল্ল, তথাপিও মধ্যে মধ্যে ছই এক জন এন্ট্রেশন মাষ্টার ও গার্ড গাড়ির কাছে এসে উঁকি মাচেন—যদি নিখাস ফ্যালবার স্থান থাকে, তা হলে আর যাত্রীকে ভরে দেওয়া হয়। যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ ব্রাক্‌হোলের যন্ত্রণা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই কোম্পানির থার্ডক্লাস দেখলে এক দিন এঁদের এজেন্ট ও লোকোমোটিব সুপারিন্টেন্ডেন্টকে সাহস করে বলতে পারেন যে, তাঁদের থার্ডক্লাস যাত্রীদের ক্রেশ ব্রাক্‌হোলবন্ধ সাহেবদের যন্ত্রণা হতে বড় অধিক নয়।

এদিকে প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দও দল বল নিয়ে একখানি গাড়িতে উঠলেন, ধপাধপ্ গাড়ির দরজা বন্ধ হতে লাগলো, “হরকরা চাই মশাই! হরকরা সার হরকরা” “ডেলিখু সার! ডেলিখুস!” কাগজ হাতে নেড়েরা ঘুচে—লাবেল! ভাল লাবেল! লাল খেরোর দোবুজান কাঁধে চাচার বই বেচেন—টুহুনাংটাং টুহুনাংটাং করে পুনরায় ঘটা বাজলো, এন্ট্রেশন মাষ্টার খুদে সাদা নিশেন হাতে করে মাথায় কক্ষটার জড়িয়ে বেরুলেন, “অল্‌রাইট বাবু?” বলে গার্ড হজুরের নিকটস্থ হলো—“অল্‌রাইট! গুড্‌মর্নিং স্যার” বলে এন্ট্রেশন মাষ্টার নিশেনটা তুল্লেন—এঞ্জিনের দিকে গার্ড হাত তুলে যাবার সঙ্কেত করে পকেট হতে খুদে বাঁশীটি নিয়ে শিসের মত শব্দ কল্ল, ঘটাঘট ঘটাস্ ঘড়্ ঘড়্ ঘটাস্ শব্দে গাড়ি নড়ে উঠে হস্ হস্ হস্ করে বেরিয়ে গালো।

এদিকে বাবাজীরা চার্টার্ড ও চন্দননগরের আমদানী পেরু ও মোরগের মত থার্ডক্লাস বন্ধ হয়ে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ কন্তে কন্তে চল্লেন—জ্ঞানানন্দ বাবাজীর মুখের কাছে ছুজ্ঞন পেঁড়োর আয়মাদার আকক্ষলদ্বিত শ্বেতশ্মশ্রু সহ বিরাজ করায় রসুনের খোস্বে জয়দেবের বংশধর যার পর নাই বিরক্ত হয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে আয়মাদারের চামরের মত দাড়ি বাতাসে উড়ে জ্ঞানানন্দের মুখে পড়চে, জ্ঞানানন্দ ঘৃণায় মুখ ফেরাবেন কি? পেছন দিকে ছুজ্ঞন চিনেমান হাতকুমালে খানার ভাত স্কুলিয়ে দাঁড়িয়েচে। প্রেমানন্দ গাড়িতে প্রবেশ করেছেন বটে, কিন্তু এখনো পদার্পণ কন্তে পারেন নাই। একটা ধোপার মোটের সঙ্গে ও গাড়ির পেনেলের সঙ্গে তাঁর ভুঁড়িটি এমনি ঠেস মেরে গেছে যে গাড়িতে প্রবেশ করে পর্য্যন্ত শূন্তেই রয়েছেন। মধ্যে মধ্যে ভুঁড়ি চড়্ চড়্ কল্ল এক এক বার কারু কাঁধ ও কারু মাথার ওপর হাত দিয়ে অবলম্বন কন্তে চেপ্টা কল্লেন, কিন্তু ওৎ সাব্যস্ত হয়ে উঠচেন না—তাঁর পাশে এক মাগী একটি কচিছেলে নিয়ে দাঁড়িয়েচে, বাবাজী হাত ফ্যালবার পূর্বেই “বাবাজী কর কি! কর কি! আমার ছেলেটি দেখো!” বলে চীৎকার

করে উঠে, অমনি গাড়ির সমুদায় লোক সেই দিকে দৃষ্টিপাত করায় বাবাজী অপ্রস্তুত হয়ে হাত দুটি জড়োসড়ো করে ধোপার বুঁচকি ও আপনার ভুঁড়ির উপর লক্ষ্য কচ্ছেন—ঘর্ষে সর্বত্র ভেসে যাচ্ছে। গাড়ির মধ্যে এক দল গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী যাত্রার দল ছিল, তার মধ্যে একটা ফচকে ছোঁড়া—“বাবাজীর ভুঁড়িটা বুঝি ফেসে যায়” বলে পাপিয়ার ডাক ডেকে ওঠায় গাড়ির মধ্যে একটা হাসির গরুর পড়ে গ্যালো—“প্রভো! তোমার ইচ্ছা” বলে প্রেমানন্দ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। এদিকে গাড়ি ক্রমে বেগ সম্বরণ করে থামলো, বাইরে “বালি! বালি! বালি!” শব্দ হতে লাগলো।

বালি একটা বিখ্যাত স্থান। টেকচাঁদের বালির বেণী বাবুও বিখ্যাত লোক—আলালের ঘরের দুলাল মতিলাল বালি হতেই তরিবত পান; বিশেষতঃ বালির প্রিজটাও বেশ। বালির যাত্রীরা বালিতে নাবলেন। ধোপা ও গঙ্গাভক্তির দলটা বালিতে নাবায় প্রেমানন্দ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—দলের ছোঁড়াগুলো নাবার সময় প্রেমানন্দের ভুঁড়িতে একটা চিমটা কেটে গ্যালো। উত্তরপাড়া বালির লাগোয়া, আজকাল জয়কৃষ্ণের কল্যাণে উত্তরপাড়া বিলক্ষণ বিখ্যাত। বিশেষতঃ উত্তরপাড়া মডেল জমিদারের নর্ম্মাল ইস্কুল প্রায় ইস্কুলের কোর্স লেকচার ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা হোল্ডর, শুনতে পাই, গুরুজীর ছ একটা ছাত্র প্রকৃত বেয়াল্লিশকর্ম্মা হয়ে বেরিয়েছেন।

বাবাজীরা যে সকল এন্টেশন পার হতে লাগলেন, সেই সকলেই এন্টেশন মাষ্টার সিগনেলার ব্ৰিংক্লার্ক ও অ্যাপ্রিনটিসদের এক প্রকার চরিত্র, এক প্রকার মহিমা। কেউ মধ্যে মধ্যে অকারণে “পুলিসম্যান পুলিসম্যান” করে চীৎকার করে সহসা ভদ্রলোকের অপমান কস্তে উত্তত হছেন। কেউ দুটি গরিব ব্যাওয়ার জীবনসর্ব্বস্ব স্বরূপ পুঁটুলিটি নিয়ে টানাটানি কচ্ছেন—ওজন কচ্ছেন। কোথাও বাঙ্গালগোছের যাত্রী ও কোমরে টাকার গঁজেওয়ালা যাত্রীর নিজে টিকিট নিয়ে পকেটে ফেলে পুনরায় টিকিটের জন্ত পেড়াপিড়ি করা হচ্ছে—পাশে পুলিসম্যান হাজির। কোন এন্টেশনের এন্টেশন মাষ্টার কমফর্টার মাথায় জড়িয়ে চিনে কোটের পকেটে হাত পুরে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছেন—অ্যাপ্রিনটিস ও কুলিদের ওপর মিছে কাজের ফরমাস করা হচ্ছে, হঠাৎ হজুরের কমান্ডিং আসপেক্ট দেখে এক দিন “ইনি কে হে?” বলে অভ্যাগত লোকে পরস্পর হুইস্পার কস্তে পারে! বলতে কি, হজুর তো কম লোক নন—দি এন্টেশন মাষ্টার!

যে সকল মহাত্মারা ছেলেবেলা কলুকেতার চীনে বাজারে “কম স্তার! শুভ

শপ্ স্ত্রার ! টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক্ একবার তো সি !” বলে সমস্ত দিন চীৎকার করে থাকেন, যে মহাত্মারা সেলর ও গোরাদের গাড়ি ভাড়া করে মদের দোকান, এম্টি হাউস, সাতপুকুর ও দমদমায় নিয়ে বেড়ান ও ব্লায়েন্টের অবস্থা বুঝে বিনাহুমতিতে পকেট হাত্ ডান, আরম্মুলার কাঁচপোকায় রূপান্তরের মত তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদলে “দি এষ্টেশন মাস্টার” হয়ে পড়েছেন—যে সকল ভদ্রলোক একবার রেলওয়ে চড়েছেন, যাঁদের সঙ্গে একবার মাত্র এই মহাপুরুষরা কন্টাক্টে এসেছেন, তাঁরাই এই ভয়ানক কর্মচারীদের সর্বদাই কম্পেন করে থাকেন। ভদ্রতা এঁদের নিকট যেন “পুলিসম্যানের” ভয়েই এণ্ডে ভয় করেন, শিষ্টাচার ও সরলতার এঁরা নামও শোনেন নাই, কেবল লাল সাদা গ্রীন্ সিগ্ন্সাল—এষ্টেশন, টিকিট ও অত্যাচারই এঁদের চিররাধা বস্তু ! ও আগেই স্বজাতির অপমান কত্তে বিলম্ব অগ্রসর !

সমাজ কুচিহ্ন

[১৮৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত]

উপহার
সাহসের অধিতীয় আশ্রয়
শ্রীযুক্ত হতোমচাঁদ দাস
মহোদয়েষু ।

অনরবল হতোম ! আপনি বাঙ্গালী সমাজকে যে স্বভাব পটে এঁকে, নূতন রকম চিত্রকাব্যে সাজিয়ে, বার কোরেচেন, এতে কোরে ছোট বড় সকলেই (ত্যাচরেল হিষ্ট্রির দল ছাড়া) আপনাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের পেট্রণ বোলে তারিফ কোচেন । একজন বাঙ্গালী পাদরী তাহার এক পাট বেচে নিয়ে তর্জমা কোরে, ইংরেজ মহলেও আদর বাড়িয়েচেন । আমি এক দিন বোসে বোসে একটু “বেওয়ারিস লুটির ময়দা” নিয়ে দই মাকিয়ে এই এক ছেলে খেলা কোল্লেম । ভাব্লেম, কারে আর এই নূতন সামগ্রী অগ্রে নিবেদন করি । নবান্ন নয় যে, দাঁড়কাক খুঁজে খুঁজে আন্ধের খোলা ডোঙা সমুখে ধোরে দেবো, স্ততরাং ভেবে চিন্তে আপনার নামেই উৎসর্গ কোরে দিলাম । দেখ্বেন যেন, কোন মুখছষী লোকে এরে গ্রাস কোরে না ফেলে । আমি ছু পা সোরে দাঁড়াই—গুড্ নাইট ॥

চিড়িয়াখানার
নিশাচর ।

অনুষ্ঠান

সমাজ কুচিত্র নামে এই দর্পণখানি বাহির করা গেল, ইহাতে আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন, সরস্বতী পূজা ও পল্লীগ্রামতীর্থ, এই তিনটি পরিচ্ছেদ আছে। পাঠকগণ পাঠ করিয়া সংকল্প হইতে দৃর্গন্ধগুলি দূর করিতে চেষ্টা করুন।

আমাদের গৌরচন্দ্রিমা

বাঙ্গালা দেশ কাদের দেশ?—আমাদের।—বাঙ্গালাদেশের সুখ্যাতি হোলে কাদের খোসনাম হবে?—আমাদের।—বাঙ্গালাদেশের অখ্যাতি হোলে কাদের নিন্দে হবে?—আমাদের।—বাঙ্গালাদেশের উন্নতি হোলে কাদের মুখোজ্জ্বল হবে?—আমাদের। বাঙ্গালাদেশের শ্রীবৃদ্ধি হোলে কাদের মান বাড়বে?—আমাদের।

যদি সকলি আমাদের,—তবে আমরা বাঙ্গালাদেশের ভালো ভালো কাজকর্ম-গুলি, ভালো ভালো ধর্মকর্মগুলি (কৃষিপ্রদর্শন ও সরস্বতী পূজা) “কৃষ্ণিয়া” বোলে পর্চয় দিচ্ছি কেন?—যদি সকলি আমাদের,—তবে আমরা কৃষিপ্রদর্শন ও সরস্বতী পূজাকে যথার্থ বেশে পেম্ কোল্লেম্ না কেন?—উচিত আছে। কিন্তু বাঙ্গালীরা ভালো কাজগুলি এমনি কোরে, এলো পাকে পাকিয়ে তোলেন যে, তাতে আর বিন্দু মাত্র পদার্থ থাকে না।—এমনি কোরে ঘোল মোয়ে যান যে, বড় ছুখে শুভ উদ্দেশ্যে সাগর মন্থন কোরে, মহাদেবের মতন বিষ খেয়ে, নীলকণ্ঠ হোয়ে পোড়তে হয়!—আবার প্রশ্ন।—যদি আমাদেরি সকলি,—তবে দোষগুলি ঢেকে ঢেকে, গুণগুলি দেখে দেখে, বার কোল্লো কি চলে না?—চলে বটে, কিন্তু বড় বাড়াবাড়ী হোলে চলে না।

বাজারে হতোম প্যাঁচা বেরুলো, বদ্মায়েসুদের তাক্ লেগে গ্যালো, ছেলেরা চোম্কে উঠলো, আমরা জেগে উঠলুম, চিড়িয়াখানায় নানা প্রকার স্বর শোনা যেতে লাগলো। “আপনার মুখ আপনি দেখ” এগিয়ে এলো। আমরা তারে চেনো চেনো কোরে ধোরে কেলেম, সেটা পাখী নয়, সুতরাং উড়তে পারেনা, আপনার কাঁদে আপনিই ধরা পোড়লো। ওদিকে কা কা কোর্টে কোর্টে একটা

কাকরি দাঁড়কাকের বাচ্চা উড়ে এলো। তারেও ধরা গেল। রাস্তিরে ভাল দেখতে পাইনে, চসমা দিয়ে দেখতে হলো, হাতড়ে বুঝে গেলুম, কাকটির ডান চক্ষু কাশা। কাক মনে করেন, আমি লুকিয়ে—করি, কেহ টের পায় না, কিন্তু তা নয়। আপনার মুখ আপনি দেখ, দিন কতক নোড়ে চোড়ে বেড়ালে, তার পর আন্ধবাড়ীর গন্ধের মত পুরোণো হয়েছে পড়লো। আমরা আর তাদের দেখতে পেলেম না। ছুই এক রাস্তিরে চরা করবার সময় আবছায়া দেখি, কিন্তু ধাঁধা লাগে আর চোঁকে যাই। তাদের না পারি, সহরের একটা ছোট খাট তসবি এনেছি। সাধারণে তসবিখানি ভাল কোরে দেখে, রাস্কেলিটা এককিউজ্ কোর্বেন।

পক্ষাবনত—

লেবুতলা।

শ্রীবি, যুক, পেন, কোং।

৬ই জানুয়ারি ১৮৬৫।

আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন

আজ ১২৭০ সালের ৬ই মাঘ সোমবার। বাঙ্গালা দেশের ছোট কৰ্ত্তা সৰ্ব্ব-মনোরঞ্জন বীডন সাহেবের প্রধান কার্য্যের আরম্ভ। আজ বেলবিড়িয়ারের চিন্ত-চমৎকারিণী ও মনোহারিণী শোভা। নানা দেশের কল, ফল, শস্ত ও পশুপক্ষী প্রভৃতি উপস্থিত করা হয়েছে। বিস্তর ভদ্রলোক উহা দর্শন কর্ত্তে আগমন করেছেন। রাজা রাজড়া, নবাব ও জমিদারেরা যেন গন্ধৰ্ব্বসভার স্থায় সভা করে বসেছেন। দেশ বিদেশীয় ভাষায় দীৰ্ঘ দীৰ্ঘ স্পিচ্ হচ্ছে। আলবোলায় শব্দ, নকিবের ফুৎকার ও রেসালার কলরবে প্রদর্শনস্থল যেন মেতে উঠেছে। বলতে কি, আলীপুর যেন রসাতল যাবার ভয়েই কঁপে কঁপে উঠছে। কোলকাঁপ আশাসোঁটারা লালপাগড়ি-বাঁধা হোঁড়াদের হাতে এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, বেতর সমারোহ দেখে প্রভাকর প্রভাতে যেন বিহ্বালতার মত চম্কে চম্কে উঠছে। দর্শকের ভিড় যেন মোমাছির ঝাঁক ও আগুন দেওয়া চরকিবাজীর চোঙের স্থায় এক থাকের কাটগড়া থেকে আর এক থাকে গিয়ে জম্চেন, রকমসই সৌন্দর্য্যের গায়ে ঠেস মাচ্ছেন, আর আড়ে আড়ে তাকাচ্ছেন।

দর্শকেরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। প্রথম দল গুণগ্রাহী হলেন। কিরূপে কোন্ কল প্রস্তুত করা হয়েছে, তারি সন্ধান নিয়ে শিক্ষা করার কোশল দেখতে লাগলেন। কোন্ কলে, কোন্ জিনিষে কি কাজ হয়, তারি ডিপোজিসন দিতে লাগলেন। কোন্ জিনিষের কি কোয়ালিটি, তারি তর্ক আরম্ভ করলেন। দ্বিতীয় দল গোষ্ঠ ও রাসযাত্রার সড়ের স্থায় কল ও জন্তুগুলি দেখে বেড়াতে লাগলেন। তৃতীয় দল বাঙ্গালা দেশের মুখে চূণকালি দিয়ে, বীডন সাহেবের শুভ অনুষ্ঠান মহাপ্রদর্শনের শুভ ফল মাথায় তুলে, বংশগৌরব পায়ের নীচে রেখে, আপনাপন দুঃস্বপ্নবৃত্তির ভোজ্যদ্রব্য খুঁজে নিতে বিব্রত হলেন !!

লড়াইয়ে মেড়া ও বুনো মহিষের স্থায় তৃতীয় দলের দর্শকেরা শিকার দেখে স্থির থাকতে পাচ্ছেন না। দাড়ি পর্য্যন্ত জুল্পি ও আকর্ষণ ঘাড়ের চুলের কেয়ারি করা বিলিভী হজুরেরা কোন্সলীর মত পোষাক পরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; জীমতীরা ফ্রিনোলাইন গাউনে তিন তিন কাঠা জমি ঘিরে নিয়ে হজুরদের বগল ধরে বুলে বুলে যাচ্ছেন। বোধ হচ্ছে যেন, এক পাখা-কাটা বাছুড়েরা ছোট ছোট ছেলেদের হাতের দড়ির সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। যে সকল দেশী হজুর গাদ ছেড়ে এক পা নড়তে ক্রেশ বোধ কর্ত্তেন, আজ আরবীয় অশ্বেরাও তাঁহাদের

প্রবল গতি দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট করে পালাচ্ছে। সার্জন ও টিকিটওয়ালারা দরোজার বন্দোবস্তেই ব্যতিব্যস্ত।

এদিকে ভবানীপুর রঙরঙে! রকমারি দরমাচাকা বারাণ্ডা যেন বরকামান কামিয়ে ও মুখতেলা করে বেরিয়েছে; তাহাদের চিরপরিচিত বেডারা আজ পাইথানা ও রফুনগৃহের আশ্রয় লয়েছে। প্রিয়সখা বারাণ্ডার আত্ম গা দেখে, নববধূরা হুঃখে হাসতে হাসতে, এক একখানি চাঁড়া বেতের ত্রিপদী পেতে তাহাদের মান রক্ষা কছেন। বধূদের গিল্‌টীর তাবিজ, জসম, বারাসত ও বালাপরা দক্ষিণ হস্তেরা বারাণ্ডার রেলের ধারে ঝুলছে। তাহাদের পায়ে পচা রবারের দেড় পাটি জুতো, মোজার উপর কালো কালো কাদার ডায়মনকাটা চার পাঁচগাছি মল; নাকে বিলিতী মুস্তো আঁটা বিবিয়ানা বারকুসী নখ, কানে সাদা সাদা তিন তিনটি তবলকি দেওয়া গিল্‌টীর বড় বড় তিন চারটা দোলন মাকড়ি। মাথায় ফিরিজী খোঁপা ও কাঁটা দেওয়া বিজ্‌কুড়ী ফুলের বেহদ বাহার! ফুলেরা কাঁটা পরে যেন সর্কটক মৃণাল উপরিস্থ পদ্মিনীরে উপহাস কছে। পরিধান শাস্তিপূরে কালো ডুরে ও নীলাঘরী! কারু কারু তছপরি এক একখানি ৯০ সালের ট্যাসেলদার সবুজ নেটের ওড়না। কেহ কেহ ঠিক শ্রীবৃন্দাবনের গোয়ালিনী সেজে বসে গ্যাছেন, পোষাকের নিম্নভাগ জাম্বুদেশ অতিক্রম কর্তে লজ্জিত হচ্ছে। কোন দিকে রূপোবাঁধা হুকোতে ধূমপান চলেছে, কেহ কেহ খেলোতে সাধ মিটাচ্ছেন। ছুঁভাগ্যক্রমে সকলের আহার জোটে নাই, ওষ্ঠাধরসংলিপ্ত তাগ্মলরাগই অনেকের ভোজনের শেষ পরিচয়। এক একটি বধূর রূপেরও সীমা হয় না। যদি দয়ার সাগর (!) মিউনিসিপালিটি ও লাইটিং ট্যাক্সের প্রসাদে নগর ও উপনগরের গলির ভাঙা বাড়ির দেয়ালের গায় ও সাইনবোর্ডের খুঁটির উপর শতকরা ফীটে এক একটি মিড়মিড়ে তেলের আলোর লাঠন না বসানো থাকতো, বধূদের মুখগুলি নীচে থেকে দেখলে স্পষ্ট বোধ হতো যেন, এক একটি কলাবাহুড় অধোলম্বী হয়ে বারাণ্ডার কাঠ ধরে ছলছে, এক একটা পাজির শিরকাটা রক্তদম্বী গ্রহ তাহাদিগকে পড়তে দিচ্ছে না। দেখতে দেখতে সজ্জা হয়ে এলো। প্রদর্শনস্থলে আর অধিক লোক নাই।

মদের দোকানে আজ ভারি খুম! একটা কিছু পরব সব্ব হলে সহর ও শাখা নগরের (পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই) আইনকানুন মাথায় উঠে ও পোষ্টলিনিক টেশনের পিকপকেট ইচ্ছার পদতলে বিমর্দিত হয়। আজ ১০টা রাত্রির পর গাঁদাফুলের মালা পরা কলসী কলসী মদ দোকান থেকে মুটের মাথায় বাইরে

বেরিয়েছেন! সার্জন ও পাহারাওয়ালার যে লাঠানের আলো প্রতি রাত্রিতে ভক্ত-লোকদের চক্ষু অন্ধপ্রায় করে, আজ তাহা ঋতোরের শ্রায় নির্বাকপ্রায়! আজ অনেক প্রকৃত ভক্তলোক মেলাস্থলে আগমন করেছিলেন, সুতরাং অনেক বারান্দা-বারাণ্ডাকে মানভঞ্জন রজনীর নিকুঞ্জবনের শ্রায় শ্রীহীন হয়ে থাকতে হলো। অনেক বাড়িতে বিরহ গীতের হব্বা উঠে গ্যালো। বোধ হলো যেন, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্তে গ্যাচেন, কমলিনী শূন্য কুঞ্জবনে বৃন্দে দূতী প্রভৃতির কাছে “গেল শর্বরী, অহুমান করি, কৃষ্ণ এলো কৈ?” বলে বিলাপ কচ্চেন। বড়াই ও ললিতা প্রভৃতি দূতীরা যেন “রাধে ধৈর্য্যং প্যারী ধৈর্য্যং” বলে ঠাণ্ডা কচ্ছে। বাস্তবিক বেষ্টালয়গুলি যেন কঁাদতে কঁাদতেই বন্ধকার হয়ে গ্যালো। আজ দ্বিতীয় দিবস।

আজ মঙ্গলবার। অনেক প্রকার দর্শক নয়নগোচর হতে লাগলেন। রাস্তায় ভারি ভিড়। আজ এক টাকা করে টিকিট বিক্রি হচ্ছে। কাল পাঁচ টাকা ছিল। টিকিট ব্যবসায়ীরা কাল ২৬০০০ টাকা লাভ করেছেন! আজ টিকিট সস্তা দেখে অনেক মাঝারি কেতার ভক্তলোক আগমন করেছেন। পুলিশের বন্দোবস্তের গুণে পশ্চিম দ্বারে অসঙ্গত গাড়ির ভিড় হলেও কোন গোলযোগ হতে পাচ্ছে না। টিকিট বিক্রয়ের বন্দোবস্ত মন্দ হয় নাই। দর্শকদলে মেলাস্থল পূরে গ্যাচে। কলের নিকটে অসঙ্গত ভিড়। পশুশালা ও পক্ষীশালার কাটগড়ার বাইরেও ঠেলে সৈঁধোনো ভার। মাঝে মাঝে তাঁবু টাঙানো উইলসন ও স্পেল হোটেলের ব্র্যাঞ্চ হোটেল বসে গ্যাচে। জিব, ফ্রু, হ্যাম, ফাউল, মটন, সেরি, স্ম্যাম্পিন, কগ্‌নেগ ও ব্রাণ্ডী বেথড়ক বিক্রি হচ্ছে। ছিপি আঁটা সোড়া ওয়াটার ও লিমোনেডের বোতলেরা জ্যেষ্ঠতাতদিগের প্রিয় শিশুগণের অনবরত উমেদারী কচ্ছে। পুকুরধারে ও ঘাসের উপর ভাঙা চেঁচারি ও তেকাটা চড়া খোঁট্টা হোটেল খাপ্‌খুলে সর্বদাই হাজির। টকো ও ছাতাপড়া কমলালেবু, শেষ বাজারের ফেরত পক্কান্ন, কচুরি ফুলুরিরা লঙ্কা ও প্যাঁজভাজা মাথায় করে হিন্দুকুল উদ্ধার কচ্ছে। টোল খাওয়া পিতলের গেলাস, বিড়ে বাঁধা ফাঁপা পানের খিলি ও ঝাঁবের আটার রিপু করা খেলো হুকোদের আজ একাধিপত্য! তাহাদের সৌভাগ্য দেখে উড়িষ্কার জগন্নাথক্ষেত্র আপনার একচেটে প্রভুত্বের হানি হলো ভেবে, হৃৎখে ত্রিয়মানা হচ্ছেন। দিবাকাল এইরূপে বিদায় হলেন, চৌরঙ্গীর গির্জের ঘড়িতে অরগ্যান কোয়ার্টার ও এটা বাজা শব্দ শুনা গ্যালো। সূর্য্যদেব আর সূর্য্যায় মুখ দেখাতে পারবেন না বলেই যেন, আন্তে আন্তে পশ্চিমাচলের রাঙা মেঘের আড়াল দিয়ে

স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। ওয়েলার ও অষ্ট্রেলীয় ভাজী বাজী জোড়া বগি ও কেটন গাড়িরা গড়্ গড়্ শব্দে রাস্তা মাতিয়ে চলো। কেরাচিরাও যাত্রার নকিব সাহেবের মত কলুবুঝু করে নাচতে নাচতে পশ্চিম দ্বার পাতলা করে চলে গ্যালো। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত।

আজ একাদশী। গগনমণ্ডলে সনস্কৃত একাদশ কলা কুমুদবান্ধব উদয় হলেন। রাস্তার লার্গনের আলোকমালা চন্দ্রমাকে দেখে অভিমানে মিড় মিড় কর্তে লাগলো। যুবকদল গোছসই বারাণ্ডার নীচে গিয়ে উর্জমুখ হলেন। বারাণ্ডাস্থ বধূরা গর্ভবতী রমণীর স্তনযুগের আয় নত্নমুখী হতে লাগলেন। রাজপথ চন্দ্র ও কুমুদিনীর সন্দর্শনের আয় অপূর্ব শোভা ধারণ কল্লেন। এইখানে ফিলজফারদের আবিষ্কৃত লৌহ ও চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি সার্থক হলো।

বীডন সাহেবের প্রসাদে ও কল্কেতার ভারতবর্ষীয় সভার যত্নে আমরা কৃষি-প্রদর্শনে নানা প্রকার মনোহর জবা দেখে যেরূপ সমুদ্র হয়েচি, রাজপথের রংবেরং দ্বিপদ জানোয়ারগুলি দেখে তদপেক্ষা বহুগুণ ছুঃখ অনুভব কচ্চি। দুর্ভাগ্যক্রমে মীরা বেলবিড়িয়ার উজ্জানপ্রাক্ষণে যেতে পারেন নি, তাঁরা পথের জানোয়ারগুলিকে দেখে ঘোলেই ছুঃখের পিপাসা মিটিয়ে নিচ্ছেন। কাননস্থ মৃগশাবকগণ যেমন করভ দর্শনে সচকিতনেত্রে দূর বনে পলায়ন করে, শশক, বরাহ ও কুরঙ্গদল যেমন স্বাপদ জন্তু ও শিকারী মানুষ দেখে সভয়চিত্তে বন্যভাস্তরে লুকায়িত হয়, আমাদের নবরসিক কুঞ্জরেরা তেমনি, পাছে কেউ দেখে, এই ভয়ে মুখে চোখে কাপড় ঢেকে, লাহোরের ধারের দরোজার ভিতর ঢুকে পড়েন। সেইখান থেকে সপ্যাঙ্ক ফাউল কট্লেট ও মটপ্প হাজির করবার ফরমাস্ হচ্ছে। বিবির সকা সকা বিয়ার ও ডিষ্টিল্ড রম জুগিয়ে রেখেছিলেন, কিছু কিছু টেই নিয়ে তবলায় চাটি আরম্ভ হলো! “চলো প্রেমসরোবরে, নবীন নাগর রসের সাগর, কালার গীরিতে নমস্কার” প্রভৃতি সাদা ও দাগুরায়ের খোলা খেঁউড়ের আগুন উঠতে লাগলো। জুতো, বাপাস্ত ও শতমুখী ফাঁক যাচ্ছে না। পূর্বের বলতে ভুলেচি, যখন সব শাল দোশালা গর্তে চোকবার ভিড় হয়, সেই সময় নূতন বসন্তকাল পেয়ে, হু এক ডজন উড়ুনিও পেশ হয়ে গ্যাচে।

১ পাঁচালিওয়াল দাশরথি রায় বড় মন্ব কবি ছিলেন না। তিনি উত্তম গীত বাঁধতে পারতেন। তাঁহার অনুপ্রাসগুলিও প্রশংসনীয়, কিন্তু দাগুরায়ের খোঁড়ার আমাদিগকে কমা করবেন, তাঁহার উপহাসরসিকতা প্রবল দেখে গায়কবিশেগের মধ্যে তাঁহাকে গণনা করা যায় নাই।

হুঃখ বলতে হাসি আসে, মাঝে মাঝে খুঁজে দেখতে দেখতে ডজন ডজন ক্রেবার ফেলোও বাহির হয়ে পড়লেন। তাঁহাদের অনেককে ব্রাহ্ম সমাজের শাখায় বসে^২ চোখ বুজে চুলতে ও কাঁদতে দেখা গ্যাচে। তাঁহাদের আর অস্ত্র বাসা নাই, জাতিভেদেরও তকা রাখেন না, সকলই সেইখানে সম্পন্ন হতে পারবে। কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা ভাল ঘরে ঢুকে পারেন নি, মনে মনে সামাজিকতার ভয় আছে; পাছে কোন চেনা লোকের সঙ্গেই দেখা হয়ে পড়ে। মনে মনে সকলেই মনোচোর! তাঁরা যে ঘরে ঢুকেচেন, সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা গত বৎসর গ্রীষ্মকালের বিঘনয়নে পড়েছিলেন, আজো তাঁহাদের গ্রহ স্প্রসন্ন হয় নাই; সূতরাং তাঁহারা নরু অপেক্ষাও হিংস্র এবং হায়না^৩ অপেক্ষাও ভয়ানক! এই আসূচে ফাণ্ডনে রে^৪ কাটিয়ে গা ঝেড়ে উঠবেন এমনি সম্ভাবনা।

এখন শ্রীমতীদের মূর্তি অতি চমৎকার। হনু ও দন্ত বহির্গত, চক্ষু কোটারান্তর্গত, মেরুদণ্ড কঙ্কালসার, আকৃতিখানি যেন গরাণের খুঁটির উপর ছুটি ছুটি টাঁচা গাঁট বসান রয়েছে। মস্তকগুলি ঠিক পল্লীগ্রামের বাঁশতলার ওলদিগের রংদার ফটোগ্রাফ! মাঝে মাঝে হস্তকুশের ছায় ছু চারগাছি শিখা থাকতে, চাঁদবদনীরা যেন শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের দ্বারের পাণ্ডা অপেক্ষাও বেয়াদু দেখাচ্ছেন! নায়কেরা তাই ধরে পরচুলো, দড়ি ও মল্লিকে ফুল পরিয়ে সাজাচ্ছেন, আর সেই সকল চাঁচর কেশের প্রেইজ কছেন! এক জন উমেদার ব্রাহ্মণ তাঁহাদের এক পার্টির মদ বওয়া মুটেগিরি কর্ম পেয়েছিলেন, অধিক দিন উমেদার থাকতে থাকতে বাবু বা সায়েবের নজরে পড়ে যেতে পাল্লেন, একদিন না একদিন কপাল ফিরে দাঁড়ায়। এ উমেদারেরও সেইরূপ একাদশ বৃহস্পতি! রাত্রি ১১টার পর মদ ফুরিয়ে এলো, বধুবিলাসীরা তাঁহার মদ আনতে পাঠালেন। তিনি রাস্তায় বেরিয়ে দেখলেন, তখনও রাস্তায় লোকারণ্য। খাতায় খাতায় লোক এসে এর তার দরোজার ধারে উঁকি মাচ্ছেন। কেউ কেউ পথ ভুলে স্ত্রাক্রার দোকান ও কাপড়ের আড়তে ঢোকবার উজ্জুগ করাতে বেহদ মার খেয়েচেন, অবশেষে খুঁটিতে বাঁধা আছেন, কাল সকালে পুলিশে চালান হবেন। এক জন দর্জী একটি ভদ্র রমণীর পেছু লেগে ভূত সেজে অজুনাসিক শব্দে রাস্তা ঘোর করে

২ এই পরিচ্ছেদে ও পরিচ্ছেদান্তরে যে সকল ব্রাহ্মের কুক্ৰিয়ার হাটহুদ আছে, তাঁহারা বক বিভাল অপেক্ষাও ৫০০ গুণ ভণ্ড। প্রকৃত ও মিরপেক ব্রাহ্মগণ কমা করবেন, লেখক সমাদান ধর্মকে কলঙ্কিত করে আপনাকে অপরাধী কর্তে অগ্রসর হয় নাই।

৩ গোবাধা।

ছিল, শেষে এক ভদ্রলোক তাহারে ধরে ভূতমন্ত্ৰ ঝাড়িয়ে দেন। আজ রাত্রিতে প্রায় পাহারাওয়ালা রাস্তায় নাই। পরবের রাত্রি। আমোদ ও চুরি করবার “এলাওয়েল” থাকতে পারে! পদ্মপুকুরের মোড়ে এক জন পুলিশ ইন্স্পেক্টর আধ ডজন মাতাল ঘেঁটিয়ে রিকাইন কেতার মার খেয়েছেন। সকল স্থানেই প্রায় পুলিশ ইন্স্পেক্টরের আসর জারি সমান, ফলে তাঁহাদের অনেকেরই এইরূপ ছুর্দশা! ইন্স্পেক্টরদিগের অনেক প্রভুকে বারভূতে পেয়েচে।

উমেদার মুটে স্বচ্ছন্দে মদ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ওদিকে বাবুদলে মদের অপ্রতুল হওয়াতে “ড্যাম দি স্ট্রী ডেভিল” বলে গাল চলেচে, আর শুধু চাটু খেয়ে আশ মিটান হচ্ছে। এমন সময় মদ এলো। এক জন দলের মধ্য থেকে উঠে, মুটেকে ধরে “বাবা! তোমার এত দেরি কেন ভাই?” বলেই গুমুসু করে এক কিল মাল্লেন। সকলে হিপ্, হুরে, ব্রাভো বলে চৈচিয়ে হেসে উঠলেন। বধ্যা করতালি দিলেন। আবার ডিশ, ক্রমাল, গেলাস ও ডিম আসরে নামলেন; আন্ধের উজ্জুগ হতে লাগলো। বাবুরা স-মধু বারবধুর মুখামৃত পান করে আমোদ কর্তে লাগলেন। ছুই এক জন দাঁড়িয়ে উঠে “আমরা সুপারিশেনের চেইন ভেঙে সমাজমধ্যে লিবার্টি লাভ করেচি, সেকেলে বুড়ো ফুলদিগের মত জাতবিচার ও সন্ধ্যা আঙ্গিক করে কাল কাটাতে হয় না। হে পরমাত্মন! তুমি আমাদেরকে তোমার সংপথের পথিক কর, আমরা তোমারি দত্ত ইনটুইশন প্রভাবে তোমার প্রিয় কার্য সাধন করিতে প্রাণপণে ক্রটি কচ্চি না। ওঁ তৎ সৎ!” এইরূপ স্তোত্র পাঠ কল্লেন! পবিত্র স্থান হলে বোধ হতো যেন, লেজিসলেটিব কোর্সিলের রাজকুমার ও মৌলবী সভ্য এবং নূতন হাইকোর্টের ফ্যাশানেবেল উকীলেরা স্পিচ ও গ্লিড্ করে ফিরে গ্যালেন। উপাসনার পর পুনর্ব্বার পান আহার সারা হলো, সকলে মত্ত হলেন। সমস্ত রাত্রি এইরূপে চল্লো। তোপের পূর্বে একটু বিশ্রাম করেছিলেন, পরদিন উঠতে বেলা লয়ে গ্যাচে, স্ততরাং ব্রেকফাস্ট সেইখানে সারা হলো। তার পর ১০টার সময় পোশাক ও আঙুলে “এসা দিন নেহি রহেগা” আঁকা আংটি পরে মেলা দেখতে বেরুলেন।

হা হতভাগ্য বঙ্গভূমি! তোমার সন্তানেরা বিদেশীয় সন্তানদের নিকটে এত অপদস্থ কেন? জগতের মধ্যে একমাত্র নিত্য যে ব্রাহ্মধর্ম, তাহাও ইহার বিকৃত করে তুল্চেন। রাজা রামমোহন রায়ের সময়াবধি যদি ইহার উন্নতি চেষ্টা হতো, ব্রাহ্মধর্ম কি এতদিন ভূমণ্ডলে বিরলপ্রচার থাকে? শতকরা এক জনের অধিক প্রকৃত ব্রাহ্ম নাই, মূল ব্রাহ্মসমাজ ও সেই এক জন ব্রাহ্মের অনবধানতাই সকল

অনিষ্টের নিদান হয়েছে। ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যদি সমাজের কর্তৃপক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য না হতো, সেকেলে রাজাদের কণ্ঠার বিবাহের শ্রায়, “যার মুখ দেখবো তারেই হুহিতা সম্প্রদান করবো” এইরূপ ব্রাহ্ম করা পণ যদি না থাকতো, ব্রাহ্মধর্ম কি এতদিন ভূমণ্ডলে বিরলপ্রচার থাকে? আমরা লোকের কাছে স্পর্ধা করে গল্প করে থাকি, আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয় অ্যাডিসন, দ্বিতীয় বিজ্ঞানবিৎ নিউটন ও গ্যালিলিও, প্রধান বায়ী ডিমস্ট্রিনিস ও সিসিরো, ধর্মপ্রচারক মহাত্মা সক্রোটসের শ্রায় ব্যক্তিসকল জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁহারাও ঐ কথা বলে অভিমান করে থাকেন, কিন্তু একমাত্র বাহ্যাদম্বর সকল গুণকে অতিক্রমণ করে, মেঘাচ্ছন্ন শশাঙ্কের শ্রায় মলিন করে রেখেছে। এই সকল কথাতে কেউ কেউ মনে কর্তে পারেন, ব্রাহ্মদিগকে নিয়ে এত পীড়াপীড়ি কেন? যঁারা এরূপ মনে করবেন, আমরা তাঁদের কাছে এই কথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করি, “যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।”

আজ বুধবার। টিকিটের মূল্য ৯০ আট আনা। অনেক দর্শক সমুপস্থিত হয়েছেন। প্যারিসস্থ পটু'গাল সাহেবের উৎকৃষ্ট ফোয়ারা, ব্রহ্মদেশ থেকে সমাগত কল, কল্কেতার ব্রাউন ও লিপেজ কোম্পানির নানা প্রকার কল ও উদ্ভো সাহেবের জলতোলা কলের নিকটেই আজ অধিক লোক। ছোট টাটু বোড়াটিও অনেকে দেখেছেন। সকাল সকাল দেখা সেরে যে যার বাসামুখো হলেন। লেফটেন্যান্ট গবর্নরের ঔদার্য্যগুণে গবর্নমেন্ট আপিসের কর্মচারিগণের খেলা দেখবার অনুমতি ছিল। তাঁহাদের অনেকে আজ আগমন করেছিলেন। নকল-নবিস কেরাগীরা কখনো ভাল করে খেতে পরতে ও আমোদ কর্তে পান না। আজ সহরের পাঁচ প্রকার তামাশা দেখে আফ্লাদে আত্মবিস্মৃত হয়ে গ্যালেন, কেউ কেউ বাঁধা গরুর দড়ি ছেঁড়ার মত ছু একটা আনুকা গৈলে ঢুকলেন। হাউসের চণ্ড, মুণ্ড ও লম্বোদর লিপোর্ডদের ত কথাই নাই; তাঁরা রাজারও রেয়েত নন, সেধেরও খাতক নন, বাজার বুঝে কাজ করেন, আর গাঁত বুঝে পা ফেলেন। তাঁদের প্রদর্শন দেখা তথৈবচ, যঁারা মোদাগাড়িতে উঠে এসেছিলেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গ্যালেন, আজ ঢাকাইচাঁদ বাবুর বরানগরের বাগানে ভারি ভোজ! দ্বঃখের বিষয় এই, যুগান্তর উপস্থিত হওয়াতে এখন আর পূর্বের মত সমুদ্রপারের অভ্যাস নাই, গাড়িতে বেতে দেরি হয়ে পড়লো। সন্ধ্যার পূর্বে প্রদর্শন দর্শকদিগের সকলেই প্রায় ভিড় ভেঙে পাতলা হলেন, কেবল কয়েক জন সাহেব ও হোটেলওয়ালার যা কিছু গুল্জার করে রাখলেন। এইরূপে তৃতীয় দিবসের আমোদ শেষ হলো, রাত্রি পূর্ববৎ সমারোহে কেটে গ্যালো, কাল চতুর্থ দিবস।

আজ বৃহস্পতিবার। টিকিটের মূল্য ১০ চার আনা। দর্শকের ভিড় অধিক। ভবানীপুর, কালীঘাট, চৈতলা, চক্রবেড়ে, বেলতলা, পাকুড়তলা ও কাঁসারীপাড়া হৈকে গ্যাচে। কাঁসারীদের রাস ও *নগরের * * * মণ্ডলদিগের* চৈত্র মাসের রাসের* সময় কেবল জনকয়েক লোক এই সকল স্ত্রীপাট শোভিত করেন, কিন্তু এই কৃষিপ্রদর্শনে এ বৎসর বিস্তর লোক জমা হওয়াতে ঐ সকল দেবালয়ে স্থান সমাবেশ হয়ে উঠলো না, সুতরাং অনেককে সিদ্ধেশ্বরী দর্শনার্থী হয়ে উত্তরবাহিনী* হতে হলো।

প্রদর্শনের অবশিষ্ট শুক্র ও শনিবার সমান জনতা ও সমান আমোদে শেষ হয়ে এলো। লোকের উৎসাহ ও ফলাধিক্য দেখে লেক্টচার্ট গবর্নর আর এক সপ্তাহ সময় বাড়িয়ে দিলেন। মাঝে মাঝে টিকিট কিন্তে হয় নাই। অনেক স্ত্রীলোক এই সময় দর্শন করেচেন। বাঙ্গালা দেশ আর কখনো এরূপ উপকার লাভ করেন নি। সিসিল বীডন এই চার বৎসর কাল প্রকারান্তরে পিটাস'নের মত কার্য্য বিশেষে উৎসাহ দিয়ে বেড়িয়েচেন। গ্রান্ট, লঙ ও হরিশ দরিদ্র প্রজাদের যত উপকার করে গ্যাচেন, ভারতবর্ষীয় সভার “বাহাছুর” মিত্র, পাল ও মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালার মারীভয় ও এই কৃষিপ্রদর্শনের সাহায্য দান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই সেরূপ তেজস্বিতা দেখাতে পারেন নি। যা হোক, লেক্টচার্ট গবর্নর ও ভারতবর্ষীয় সভাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য। তাঁহাদের প্রসাদে প্রদর্শনের অব্যবস্থিতি দেখে আনন্দ লাভ করা গ্যাচে। দুঃখের এই হয়েছে, যে দেশে প্রদর্শন হলো, সেই বাঙ্গালা দেশ থেকে কোন ভাল কল প্রভৃতি প্রদর্শিত হয় নাই। কেবল দু এক জন কল্কেতার বাবু চালমাড়া ও খড়কাটা কল দিয়েছিলেন। ডফের স্কুলের কয়েকটি বালিকার কৃত কার্পেটের ছবি অতিশয় মনোহর হয়েছিল। স্বত, মাখন, মিছরি, কচু, ইক্ষু, মটর, মুগ, ধান, চাল ও মোম প্রভৃতি উত্তম হয়েছিল। মোরগ, গেক, ময়ূর, কপোত, শুক, ময়না প্রভৃতি পক্ষী, মহিষ, ছুধে মেঘ, ছাগ, গাভী, খরগোস, হরিণ, বলদ ও অশ্ব প্রভৃতি পশুও অতিশয় প্রীতিকর। বাঙ্গালা দেশে

৪ এই বংশের এক জন মণ্ডল একটি ইতর স্ত্রীলোকের প্রতি অতিশয় নিরলঙ্ঘ ও হৃৎস ব্যবহার করেছিল, সেই জন্ত তাহার একটা কুৎসিত খেতাব হয়ে গ্যাচে। স্থপিত বিষয় বলে তাহার নামধাম লেখা গ্যালো না। ইহার ধনী ও জমিদার।

৫ চৈত্র মাসে গাজন হয়, এই আমরা জানি। রাসের বাসুদেবের মধ্যে গোসাঞী, মণ্ডল এবং আজকাল এক পাড়ারগেয়ে ঘোষ নুতন শির খাড়া করেচেন।

৬ উত্তর অকলের শোভার বিষয় সরস্বতী পুজা পরিলেছে দেখ।

লম্পটের ভাগই অধিক ! আমরা ভরসা করি, প্রতি তিন বৎসরে যে প্রদর্শন হবে, বাজালা দেশ তাহাতে অন্ততঃ বর্ষার তুল্য কলও দেখাতে পারবেন। লাম্পটের সহিত আলস্তের ছাস না হলে তাহা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নাই। আদর্শস্বরূপ প্রথম দর্শনেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গ্যালা। আহ্লাদের বিষয় এই, ছ এক জন দেশ-হিতৈষী সম্ভ্রান্ত জমিদারের গৃহে ও উচ্চানে উত্তম উত্তম কল ক্রয় করে রাখা হয়েছে।

অনেকে অনৈসর্গিক অদ্ভুত বস্তু ও জন্তু দেখবেন মনে করে এসেছিলেন, তাঁদের মর্শ্মান্তিক ক্ষোভ হয়েছে সন্দেহ নাই। বীডন সাহেব যদি কাটগড়ার ধারে ধারে ছর্যোধনের উরুভঙ্গ, জনক রাজার ধনুর্ভঙ্গ, ভীষ্মের শরশয্যা, সত্যভামার দর্পচূর্ণ, ক্রীকৃষ্ণের ক্লম্বিণী হরণ, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ, অর্জুনের লক্ষ্য বেঁধা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, বিড়ালের হস্তী প্রসব, আধ মণ বেগুন, রাজমহিষীর কাক প্রসব প্রভৃতি মাটির ও কাঠের সঙ করে দিতেন, অনেক দর্শক চরিতার্থ হয়ে যেতেন সন্দেহ নাই। কল্কেতার সহরে অনেক প্রকার আমোদখোর দ্বিতীয় কিউপিড্ আছেন, তাঁরা যদি অধ্যবসায় সহকারে লম্পট প্রদর্শন করেন, দেখতে পান, কত বড় সমারোহ হয়। নীলবানরের নাচ ও হাওয়া খাওয়া সঙ দেখা আমাদের পুরানো হয়ে পড়েচে।

কৃষিপ্রদর্শন সমাপ্ত।

৭ কামদেব। ইহাদিগের দ্বারা আসল কন্দর্পের বিস্তার উপকার করে থাকে, সুতরাং ইহাদিগকে কিউপিডের অবতার বলে পেশ করা যেতে পারে।

সরস্বতী পূজা

“কল্কেতা সহর রত্নাকরবিশেষ। এখানে যা না আছে, এমন জানোয়ার পৃথিবীর কোন চিড়িয়াখানায় নাই।” ছতোম এ কথা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করেচেন। আলীপুরের একজিবিশন শেষ হতে হতে সহরে সরস্বতী পূজার উজ্জ্বল হতে লাগলো। অনেক বাড়ির প্রতিমে একমেটে হয়ে গ্যালো। লোকেরা আমাদের খইচুর হয়ে ফেটে ফেটে পড়্চেন। শরৎকালের সহিত অনেক বাবুর বাবুয়ানা রসাতলশায়ী হয়েছিল, এই কয় মাস আমরা তাঁদের চক্রবাকের দলেই গণনা করে রেখেছিলাম। তাঁহাদের বাবুগিরি সুস্নিগ্ধ কমলিনীর অনুচরী। হিমাগমে নলিনীর সহিত তাঁহাদের জাঁকজমকও পঙ্কমধ্যে বিলীন হয়ে যায়! পাঠকগণ মনে করুন, আমাদের এই শ্রেণীর আউটষ্টুডেন্ট ষ্টুডেন্ট বাবুরা কল্কেতা সহরে গ্রীষ্মকালের বড়লোক। মনে করুন, বৎসরের আট মাস কাল যাঁরা সদর্পে কন্দর্পের শরাশম-জ্যাঃ ছিন্ন করে বেড়িয়েচেন, শীতসমাগমে কাশ্মীর ও তিব্বতের পশুপালের অনুগ্রহ শুভদৃষ্টির অভাবে তাঁদের সম্ম্যাসী অপেক্ষাও তুর্দশা! ডুরে উড়ুনি ও মলমলের পিরান তাঁদের সম্মান রক্ষা কর্তে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং মন্থথের শরপাতের ভয়েই যেন, তাঁহাদিগকে হোটেলের বিল-সরকারী, বাইসম্যানের দোকানদারী, বোতল আছে বিক্রী, ছদ্মবেশে পূর্বপরিচিত তীর্থমন্দিরের দালালী প্রভৃতি এমপ্লয়মেন্ট গ্রহণ কর্তে হয়েছিল। এই সময় সময় পেয়ে দক্ষিণানিলের সহায়তায় উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শুভদিন দর্শন দিল। তাঁহারা মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করে, শিকের হাঁড়ি থেকে ডুরে চাদর, রবারের জুতো, নিম্ব, মলমলের পিরান পেড়ে ত্রীঅঙ্গে ধারণ কল্লেন। আলবার্ট ফ্যাশান পুনরারম্ভ হলো। অনেকে নূতন ফ্যাশানের ক্রীতদাস হয়ে নীলামের বস্ত্রে এক একটি চায়না-কোট তৈয়ের করিয়ে নিলেন। আলপাকারা নবযৌবন ধারণ করে অনেকের গাত্র পবিত্র কল্লেন। কেউ কেউ আলবার্ট ফ্যাশানের জায়গায় ওয়েল্‌সী ফ্যাশানকে ভর্ত্তি করেচেন। পাড়ার্গেয়ে বারুইয়েরা তাহাদের পর্ণক্ষেত্রে (বরোজে) যেরূপ আল দেয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ।

১ কুইন ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স যন্তকের মধ্যভাগ থেকে ষাড় পর্যন্ত ত্রীলোকের সিতির ভায় চুল ফিরোন। রাজকুমারের পিতা প্রিন্স আলবার্ট বাঁকা সিত্তি কাটিতেন। পিতাপুত্রের চুল ফিরোনোর অনুকরণকে আলবার্ট ফ্যাশান ও ওয়েল্‌সী ফ্যাশান বলে।

এক দিন বেলা ১০টার সময় এক জন গন্ধবেণে বাবু ওয়েলসী ক্যানাশানে চুল
কিরিয়ে চায়না-কোট গায় ও ষ্টিকিং পায়ে দিয়ে তালতলার বড় রাস্তা দিয়ে ধর্ম-
তলার দিকে যাচ্ছিলেন, নেউগীপুকুর লেনের ঠিক উত্তরে একজন সোনাকপোর
পোন্ধারের দোকানের ঠিক মাথার উপর এক জন ভদ্রলোক রাস্তাপানে চেয়ে
বসেছিলেন, নুতন রকম বাবু অথবা জানোয়ারটিকে দেখে, তাঁর বড় ইচ্ছা হলো
যে, একবার তাঁকে কাছে এনে ভাল করে দেখেন। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করবার
জন্তে বাবুটিকে সম্বোধন করে বলেন, “মহাশয়! আপনারে যেন চেন চেন কচ্ছি,
একবার এইখানে এসে তামাক খেলে ভাল হয়।” বাবু এই কথা শুনে, তাঁর
মুখপানে তাকিয়ে “রডী ফুল আবার চেন চেন করে কেন?” মনে মনে এই কথা
বলে, ষাড় নেড়ে চৈঁচিয়ে বলেন, “আই হ্যাভ মেনি বিজনেস টু পারফর্ম, গোইঙ টু
দি অফিস, মিষ্টার গ্যাম্পার ইজ ওয়েটিং ফর মি, আই অ্যাম দি হেডম্যান অফ
হিজ ডিপার্টমেন্ট, ছাট ইজ অ্যান্ আর্টিকেল্ড ক্লার্ক, সারভিং ফাইফ ইয়ার্স, গেটিং
এইটি ক্লপীজ পার মেলেম, আই শ্যাল শুন পাস্ অ্যান এক্সামিনেশন, অ্যাণ্ড
টরণ টু এ ব্যারিষ্টার। কান্ট ওয়েট বাবু! আই হ্যাভ সো মেনি বিজনেস।”
ভদ্রলোক এই সকল কথা শুনে মনে কল্লেন, এ ব্যক্তি উহার অন্নপ্রাশন অবধি
জীবনবৃত্তান্ত আওড়ায় না কি? যা হোক, উহারে আনতে হয়েছে। এই ভেবে
পুনরায় বলেন, “বাবু! আপনি ও সকল আত্মবিবরণ বলছেন কেন? আমি
ও সকল শুনতে চাচ্ছি না, একটি কথা শুনে শীঘ্র বিদায় করে দিচ্ছি, একবার
অনুগ্রহ করুন।” বেণে বাবু বলেন, “বেটা উল্লুক কিছুতেই ছাড়চে না; করি কি?
যেতে হলো।” এই ভেবে উপরে উঠতে লাগলেন। ভদ্রলোক ওদিকে মনে
মনে হেসে, কিঞ্চিৎ নারকেল তৈলে আধ বাণ্ডিল চীনের সিঁতুর গুলে সাজিয়ে
রাখলেন। বণিক্ যাইবা মাত্র “আসতে আজ্ঞা হোক, তামাক দে রে।” বলেই
ওয়েলসী সিঁতি পরিপূর্ণ করে তেল সিঁতুর লেপে দিলেন। চমৎকার খোলতা
বেরুলো! চাকরেরা ওদিকে জোড়া শাঁক বাজিয়ে ছলুই দিলে। বোধ হলো
যেন, সাক্ষাৎ মা কুলকুগুলিনী চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী তালতলার বারাণ্ডায় বিরাজমানা
হলেন। সভাবাজারের এক জন বাবুও ঐরূপে এক ব্যক্তিকে ভগবতী সাজিয়ে

* আমারে অনেক কাজ নির্বাহ কর্তে হবে। আপিসে যাচ্ছি। গ্যাম্পার সাহেব
আমার মুখ চেয়ে আছেন। আমি তাঁর আপিসের কর্তাবাবু। ৫ বৎসর কাজ কচ্ছি।
মাসে ৮০ টাকা বাইনে পাই। শীঘ্র পরীক্ষা দিয়ে ব্যারিষ্টার হবো। দেরি কর্তে পারি না
বাবু! আমার এত কাজ।

দিয়েছিলেন ! আজ কাল যেক্ষণ অনুকরণের ধুম, তাহাতে এইরূপ করাই ভাল ।

এদিকে মাঘ মাস শেষ হয়ে এলো । ফাল্গুন মাসের প্রথম দিনেই মা বীণাপাণি পৃথিবীতে আবির্ভূতা হবেন । দশ দিন থাকতেই সহর যেন অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে । সোনাগাজী, বাগবাজার, সিমলা, মেছোবাজার, গরাণহাটা, বাঁশডালা, মাথাঘসা, চোরবাগান, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চাঁপাতলা, হাড়কাটা, সেন্ট জেমস চর্চ, বোঁবাজার, গুড়ের মা, ইমামবাগ, চাঁদনী ও জানবাজার প্রভৃতি পীঠস্থান সকল যেন জন্ম জন্ম কচ্ছে । দিন নাই, রাত নাই, বাঁক বাঁক পীল ইয়ারের দল ঐ সকল তীর্থে সমাগত হচ্ছেন । ঐ স্থানেই অনেকের আফিশিয়াল চেম্বর ও আরটিফিশিয়েল ট্রেনিঙ অ্যাকাডেমী । প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা জাঁকালো গার্ডেন ফিষ্ট করে, উদ্ভানেই ক্লব টেনে ট্রাইঅ্যাঙ্গেল এঁকে জিওমেট্রির নূতন নূতন প্রপোজিসন প্রভ কছেন ! আল্‌জেরা গুণ্ডভাবে লক্ষ্য বস্তু অ্যাকারম্ কচ্ছে । সরস্বতী পুজোর দায়ে পড়ে, অনেকে হাতে পাতে বিলক্ষণ পুরস্কার লাভ করেছেন । টাকা দিয়ে জুতো ও বাঁপাস্ত গাল ক্রয় করে লয়, বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন বোধ করি পৃথিবীর আর কোন অংশেই এরূপ জলজীয়ন্ত জানোয়ার অন্বেষণ করে পাওয়া কঠিন ! শক্রমুখে ছাই দিয়ে এই সকল ক্যাটোফরাসের আজকাল চীনের শূকরের মত বংশ ও মুচির কুকুরের মত শ্রীবৃদ্ধি ।

সকলেই অনুভব করে দেখবেন, বাগবাজারের নবরত্ন, মদনমোহন, সিদ্ধেশ্বরী ও নিমতলা ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে এসে, ঠিক দক্ষিণ দিকের পশ্চিমাংশে, পায়রার খোঁপের মত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারাণ্ডা নয়নগোচর হয় । ঐ সকল বারাণ্ডা ও স্থানবিশেষের রকমসই চিক্‌ফেলা বারাণ্ডারা যেন প্রকৃতির রমণীয়তা দেখাবার নিমিত্তই প্রকৃতিরূপ মাল্য পরিধান করেছে । নির্লজ্জ পবন তাহাদিগের স্পর্শসুখ অনুভব করবার নিমিত্তই যেন, এক একবার দক্ষিণ দিক্‌ থেকে ছুটে ছুটে আসচে । ভবানীপুরে যে সকল বুট্টা কারচুবির উল্লেখ করা গ্যাচে, এখানে সেগুলি সাঁচ্চা ! বিশেষতঃ বাইজী, খেমটাওয়ালী, কীর্তনী ও কলকৈতার কোন কোন তেলি, সোনার-বেণে, শুঁড়ী ও ছুতোর বড়মানুষদের রাখিত মেয়েমানুষগুলির সজ্জা ও গৃহশোভা সর্বাপেক্ষা চমৎকার ! বাইজীর চমরী গরুর পুচ্ছ, ও শিকারোদ্ভূত বনবৈজির লেজের মত চুল এলো করে, ছাতে ছাতে পায়চারি কছেন, আর ইঁরাণীর ধোঁয়া উড়াচ্ছেন, পথিকেরা হাঁ করে আকাশপানে চেয়ে অপূর্ব কেশছটার তারিফ কছেন । বসন্তঃ চিংপুর রোডের হুথারি বেঞ্চারায় থাকতে, বারো মাস ত্রিশ দিন আর

পান্থদিগের চক্ষু মাটি দেখতে ইচ্ছা করে না। অনেকে টেকোর খেয়ে নর্কমায় পড়েন, অনেকে গাড়ি ঘোড়ার ধাক্কায় অঙ্গহীন হছেন। বাঁরা সমুদ্রগর্ভস্থ জাহাজের “কম্পাস” দেখেন নাই, তাঁরা এই রাস্তার ভ্রমণকারীদিগের চক্ষু দেখুন। অর্ধবপোত যে দিকেই যাক, কম্পাস যেমন ঠিক উত্তর মুখেই থাকে, আমাদের পশ্চিক ক্রীটের গতি যে দিকেই হোক, চক্ষু কম্পাস বারাগুর মুখগুলি লক্ষ্য করেই আছে। ছুখের বিষয় এই, পাড়ারগোঁয়ে নবীন সুরসিক পুরুষ বিহঙ্গদিগের পাখা নাই।

ছূর্ভাগ্যক্রমে যে সকল সুখীর বারাগু নাই, তাঁরা গাঁদাফুল মাথায় দিয়ে, মল বাজিয়ে, হাতে পায়ে ঠোটে আলতা পরে, রাস্তার লহোরের ধারেই বার দিয়েছেন। গরাগহাটা, চুপাগলি, চাঁদনী ও জানবাজার প্রভৃতি স্থানেই এইরূপ দল অধিক। ইহাদের শ্রেণীবদ্ধের নিয়ম অতি চমৎকার। দিনের বেলা কে কোথায় থাকেন, জেনে উঠা যায় না, সূর্য্য অস্ত হতে হতে তারকাগুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে মধুক্রমের মধু-মক্ষিকার শ্রায় সার গোঁথে উদয় হন। ইঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন, পশ্চিমধ্যে বুড়ো গোবিন্দ অধিকারীর মানভঞ্জন যাত্রা হচ্ছে, সখীরা স-রাই বংশীধারীকে ঘিরে নিয়ে “কালচাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়ালো।” বলে গীত গাচ্ছে। বাস্তবিক ইহাদের মুখারবিন্দ থেকে “হৃদি সরোজে রাধিব, অধর সুধা পান করাব, এসো যাছ আমার বাড়ি আমি দিব ভাল বাসা। প্রাণ তোমার কি বিবেচনা, চিনলে নাকো রাং কি সোনা।” প্রভৃতি সুধা ক্ষরণ হয়ে থাকে। নূতন লোক ইহাদিগকে দেখলে সহসা মনে কর্তে পারেন, যেন গবর্ণর জেনেরলের “লিবির” দিন সিপাহী ও গোরা সেনারা সারি সারি দাঁড়িয়েচে, অথবা অপদার্থ নূতন পুলিশের এক পাল নবধূত অধর্ক ধোপা কনষ্টাবলের প্যারেড্ বা ভল্লুক নাচ হচ্ছে। উপর নীচে এই সকল শোভা দেখে শুনে, কোন্ ভাবকের মনে না নব নব ভাবের উদয় হয়? সঙ্ক্যার পর একটা ঝড় উঠলো। কামিনীরা ঝড় খেয়ে, শোকে নেয়ে, দোর দিয়ে পালিয়ে গ্যালেন। ঝড়ের পর করনোয়ালিস স্ট্রীটের হাফ ইন্সলভেন্ট বাবুর বাড়ির ঠিক নৈঋতকোণে, মামার বাড়ির ঠিক সম্মুখে, এক জন প্রাচীন কবির মুখ ফুটে স্বর বেরিয়ে পড়লো। তিনি এই কতক্ষণ ও পাড়ার শোভা দেখে ফিরেচেন।

রাম কবিতা।

মরি মরি কিবা শোভা ! আহা কি বাহার !

প্রকৃতি পরেছে যেন, প্রকৃতির হার ॥

পাখা নেড়ে, উড়ে উড়ে, বেহায়া পবন।

খুলে দিলে সকলের গায়ের বসন ॥

ছি ছি ছি ছি বায়ুরাজ ! মানো না দোহাই ।

আপনি নিলাজ বলে সবাই কি তাই ?

শুখেতে দেখিতেছিহু রমণী রতন !

অরসিক নাই আর তোমার মতন !

কবি এইরূপে খেদ করে সিম্‌লের হেদোর দিকে প্রস্থান করেন। ক্রমে রাত্রি হয়ে পড়লো। আজ অমাবস্তা। সরস্বতী পূজোর আর পাঁচ দিন আছে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, তথাপি ইয়ারদলের শব্দ অথবা বিরামের নাম নাই। হতোম নিশীথ বর্ণন সময়ে বলেচেন, “চার দিক্‌ ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ, মাঝে মাঝে বেকার কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ রব ও সার্জ্জন পাহারাওয়ালার গুম্‌স্‌ গুম্‌স্‌ পায়ের শব্দ শ্রবণগোচর হচ্ছে।” কালের কি বিচিত্র পরিবর্তন ! হতোম আজো ছবছর হয় নাই বাহির হয়েছে, ইতিমধ্যে রাস্তার চৌকিদারের পদশব্দের স্থলে পাল ইয়ারদের জুতো ও ছড়ি সবুটিটিউট ! বেকার কুকুরেরা একচেটের ডাক্তো, এখন বৌ কথা কও ও কোকিলেরা তাহাদের দোয়ারকী কছে। সকল বেষ্টাবাড়ির দরজাতেই প্রায় জুড়ি, তেঘুড়ি, চৌঘুড়ি খাড়া রয়েছে। গৃহমধ্যে লালপানির চক্‌চক, চেনাচুরের ছপ্‌ছপ ও বোতল গেলাসের ঠনঠন শব্দ শুনা যাচ্ছে। কোথাও এক বাবু তাঁহার প্রিয়তমা বিবিকে চাবুক বসিয়েছেন, সে তাহার মাতা, দাসী ও দরোয়ানের নাম করে উচ্চৈঃস্বরে রোদন কছে, আর বাবুকে অনবরত গালাগাল দিচ্ছে। বাবু পুনরায় “বগি ছইপ্‌” কসিয়ে পালাচ্ছেন। কোথাও ডোরা^২ ও চেতা^৩ আগমন করাতে বোধ হচ্ছে যেন, গগনমণ্ডলে বসন্ত মেঘ গর্জ্জন কছে। কোথাও এক বাবু তাঁহার বধুর বাতায়ন থেকে একখান পাছাপেড়ে কাপড়, একটা তেলের বাটি, একটা দস্তার মুখনল, একখান লৌহের কজা, আর একটা কলী হুকো চুরি করে প্রস্থান করছিলেন, দরোয়ান তাঁকে ধরে গোল করাতে ছয় বাড়ির লোক একত্র হয়ে তাঁকে বিলক্ষণ প্রহার করে, অবশেষে পাহারাওয়ালার হস্তে সমর্পণ করে দিলে। অনেক পাহারাওয়ালার যেমন শিক্ষা ও যেমন অভ্যাস, তদনুসারে এগারটি আধলা পরস্পর পেয়ে ছেড়ে গিয়ে গ্যালো। কোথাও বা এক বাবু বিবিকে সুরাপানে মত্ত ও ক্লরোফরমযোগে অচেতন করে সমস্ত অলঙ্কারগুলি লয়ে পলায়ন করেচেন। বিবির মুখ দিয়ে প্রকাশ হলো, সে রাত্রি তাঁহার ঘরে দু জন অগ্রদানী পাড়ার ঠাকুর ছিলেন ! ঠাকুর চোর অনেক আছেন, কিন্তু পুলিশ ইহাদিগকে ঠাকুরগোষ্ঠী বলে ভয় করে চলে থাকেন। সরস্বতী পূজোর খরচের কল্যাণে অনেক স্থলে গাঁটকাটা,

রাহাজানি, সিঁদ, হস্তা, ডাকাতি, জুয়াচুরি ইত্যাদি ঘটনা হচ্ছে। সহর টলটোলে।
ওদিকে কলকাতার মনিমার্কেটের তাপমানে ৯৮।° ডিগ্রী পারদ ছাপিয়ে উঠলো।
এই দারুণ উত্তাপের প্রকৃত কারণ আগ্নেয়গিরির ধাতু ও অগ্নি প্রভৃতির স্রাব
অপ্রকাশিত রয়েছে; কিন্তু এদেশের দু-এক জন শূন্যদর্শী এঁচেছেন, লেড সাহেব
ও ব্যাঙ্ক ইহার কারণ।

হুতোমের বাক্য সার্থক করবার নিমিত্তই যেন, সমস্ত “নদীর জলের স্রাব, বেষ্টার
যৌবনের স্রাব ও জীবের পরমায়ুর স্রাব” সৌখীন দলের হাত ছাড়িয়ে চলে যেতে
লাগলো। রজনী ছই প্রহরের মাথায় পদার্পণ কল্লে। নক্ষত্রমালা আজ চন্দ্রমাকে
দেখতে না পেয়েই যেন, ছোট বড় সকলগুলিকে জাগিয়ে সহস্র ২ প্রদীপ
ছেলে তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলো। ঝিঝিপোকারা ইমনের রাগ ভাঁজতে
লাগলো, শেয়ালেরা খেয়াল ধল্লে, রাস্তার শোয়া কুকুরেরা পাটাতনের নীচে থেকে
আলাপচারী আরম্ভ কল্লে; আমরাও তাল বুঝে চরা কর্তে বেরুলেম। পথেই
অনেক সহাধ্যায়ী ও সমধর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। পরমাপ্যায়িত হয়ে শেকহাও
কল্লাম। গুডনাইটের এমনি একটা হরুরা উঠলো, দূরের লোকেরা মনে কল্লে,
কাশীমিত্রের ঘাটের ফেরতেরা হরিবোল দিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। শেষে আমরা মাঝের
বড় রাস্তা ধরে উত্তরমুখে যাচ্ছি, এমন সময় একটা ঘরের ভিতর থেকে, কালোয়াড়ের
তালমুদ্র একদল ফাষ্টরেট মাতাল ছুটে বেরলো! ছেলেবেলা আমরা মাঝের
কোলে শুয়ে যে রকম “হুনচুপড়ি বেদে বুড়ীর” গল্প শুনতুম, সেই রকমের একটি
হুনচুপড়ি বাই তাড়কা রাক্ষসীর মত আগুন ও চিম্টে হাতে করে তাদের পেছু
সার কল্লে। সার্জন সাহেব “হাম টোম শালালোক সবকো পুলিশে চালান কড়ে
গা।” বলে ক্ল ও লাঠন নিয়ে আমাদের ধর্তে এলেন; আমরা চৌচা দৌড়ে
দক্ষিণ দিকে পালিয়ে গেলুম, কেউ কেউ * * কাস্তে সাহসে ভর করে খানিক
দূর এগিয়ে গ্যালেন, তার পর তাল থেমে গেলে আবার ফিরে এসে নদর কিল
অপ কল্লে। আমরা যে পথে যাই, সেই পথেই নূতন নূতন আজগুবি দেখতে
পাই। কোথাও একপাল পাগড়িবাঁধা কর্ণধারের পোস্তুর আপিস ফেরত (এতক্ষণ
কোথায় ছিলেন, সকলেই জানেন) বারাণ্ডার নীচে নীচে “রামভদ্রর খুড়ো” বলে
টোঁচিয়ে উঠ্চেন, বারাণ্ডা থেকে ধুধু ও বাপাস্তুর শোভাস্তরী উপহার পড়্চে।
কোথাও মুখে আসে না। এক বৎসর দোলের সময় ঐ রকমের এক উজ্জন স্রাব
আবার মেখে রাঙা টকটকে হয়ে রাস্তায় শুয়ে বসে গড়িয়ে কাদা মেখে আসছিলেন।
তাঁহাদের সকলের হাতেই এক এক সেতার। সহরের পুখ্য চার পোয়া, হুতরার

তাঁরা তাহার আঁক গুড়িয়ে মার খেয়ে (কেউ কেউ ঝোলার উঠে) শ্বাস্থ্যভব করেছিলেন। দিনকতক এক জন ঘোষ বাবু দস্তকচন্দ্রিকার মতানুযায়ী এক বিবি ও আট জন বরাথুরে মোসাহেব নিয়ে পাড়া বেড়ানো আরম্ভ করলেন। মোসাহেবদের পৈতে গোচ্ছা করে গলায়, আলবাটি কেতায় চুল ফিরোনো, চাদর পাকিয়ে গলায় ফেলা। গা আতুড়! ঘোষ বাবু একবার এই সকল সভাসদ ও মেমসাহেবকে নিয়ে টাউন হালের এক মিটিঙে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর জুতোস্ত পুরস্কার লাভ হয়েছিল। কত লোক এই রকমে দেউলে হলেন, নীলামে জুতো পর্যন্ত বিকুলো, স্ত্রীর হাতের বাজু, মেয়ের পায়ের মল চুরি করা হলো। এক জন ওবরসিয়ার সাহেব সিমুলের একটি হিন্দুকুল পবিত্র করলেন। কত লোক স্ত্রীঘরে ঢুকলেন। কত কশাই কালী, কত মহাদেব ও কত বেকস দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো, বছর বছর তার এক একখানি ডিরেক্টরী না করে রাখলে, তর্জমা করে বুঝানো যায় না।

আজ রাত্রিতে বেহুদ তামাশা হয়ে যাচ্ছে। বাঁক বাঁক সেলর এসে আশ্বিন কান্তিক মাসের লম্পট কুকুরদের মত মেয়েমানুষদের দরোজায় ঢু মাচ্ছেন। দালালের তাঁহাদের বন্দোবস্ত করে মিশ খাইয়ে দিচ্ছে। সেই সকল দাঁড়ানো বাঁকেরই এই সকল খালাসী অতিথি! অনেক লার্গনওয়ালাও ইহাদের দালাল! রাজা গুরুদাসের স্ট্রীট ও নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের মোড়ে রাসবিহারের মৃত যুবরাজের গিরিশ বাবুর মঠ। রাজা বানরেন্দ্র তাঁহারে বিহারে নিয়ে চালান করেছিলেন, এখন সেখানে দাঁড়াকাকে বাসা বেঁধেচে। এই সকল দেখতে দেখতে রাত্রি শেষ হয়ে এলো। সহরের বাবু, যুবতী, ছুঁড়ী, বৃদ্ধা, ব্রাহ্মণ ও বেষ্টারা গঙ্গাস্নানে বেরলেন। ময়দা পেয়া, ঘানিগাছ ও স্কাভেঞ্জারের কোঁ কোঁ শব্দ আরম্ভ হলো। বারমুখো বাবুদল কাকেদের সঙ্গে সঙ্গে ঘরমুখো হলেন। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে প্রভাতসূচক তোপধ্বনি সকল কলরব ভেদ করে নগরের অন্ধকার দূর করে দিলে। গঙ্গাজলের ভারী, ওড়া ও হাঁটা কাক, উড়ে বেহারা ও বেতো বুড়োরা স্ব স্ব কর্ণে অ্যাটেন্ট দিতে চল্লো। সূর্য্যদেব পূর্ব কোণ থেকে উকি মারতে মারতে ছায়াপথের (Milky-way) নিকটবর্তী হলেন। নগর কোলাহলে পরিপূর্ণ।

আজ প্রতিপদ। পূজার আর দিন নাই। কারিকরেরা বামুনবাড়ির পুরুতদের মত রঙের চেঙারি মাথায় করে এবাড়ি ওবাড়ি ছুটোছুটি কচ্ছে। কুমোরটুলীর নগ্না সরস্বতীরা বেধড়ক বিক্রি হয়ে মুটের মাথায় উঠছেন। কুমোরেরা শেষকালে আর যোগাতে না পেরে, বাড়তি দোমেটে করা জগদ্ধাত্রী ঠাকুরণের হাতী ও সিঙ্গী

ভেঙে ছুখানি হাত কেটে, ও ঘাড় বেঁকিয়ে সাদা করে স্থান পূর্ণ করে। রাজপথ যেন সরস্বতীময় বোধ হচ্ছে। ডাকের সাজকর, মিঠাইকর, সোনার পদ্মফুল ও গাঁদাফুলের দোকানে আজ অসঙ্গত খন্দের। ফোঁজদারী বালাখানার রেড্, হোয়াইট্, ব্লু ও পর্পেল ঝাড়লাঠনেরা খাতায় খাতায় ভাড়ায় বেরিয়েচে। বেকার বাবুরা মহা ব্যতিব্যস্ত। রাধাবাজারের সঙ্গে কমিশন দরে একটুটা বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

কলকাতা সহরের সকলই সৃষ্টিছাড়া। এখানে গৃহস্থবাড়ির চেয়ে বেশ্যাবাড়ির সরস্বতী পূজার সংখ্যা ও জাঁকজমক শতগুণে অধিক। অনেক বড়মানুষ নিজ বাড়িতে বুট ও বীরখণ্ডী বরাদ্দ করে, মুদীর দোকানে বরাং দিয়ে, ছ হাজারী তোড়া নিয়ে নূতন বাড়িতে হাজির হলেন। এখানকার দাবু, পূজো, ধর্ম, ঠাকুর ও বেশাদিগকে ধন্যবাদ !!

আর্কফলানিন্দিত চৈতন্যফক্স ও বর্ণমালানিন্দিত উপাধিধারী ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণেরা চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠার প্রগ্র্যাম স্থির কর্তে ব্যস্ত হলেন। যাঁদের তিন পুরুষের মধ্যে টোলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই, আজ তাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে গোবর ঝেঁটিয়ে খোলার ঘর ঝেড়ে টোল ফেঁদে বসলেন। মস্ত্র ও ঔরসজাত ছাত্র সংগ্রহ করা হলো। কেহ কেহ কোন বড়মানুষের আস্তাবল ঘিরে নিয়ে এক এক মেটে বীণাপাণি খাড়া করে দিলেন। বাছা বাছা বড়মানুষদের দরোজায় যাওয়া আসা হতে লাগলো। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কালিদাসের মেঘদূত রিফাইন করা অন্তর্দৃষ্টি কৃষাতে নূতন বিয়ে করা কনের দর্শনী ছুধের মত উথলে উঠলো, মুকুবোধ ব্যাকরণের একোদ্বিষ্ট জ্ঞান হতে লাগলো। গঙ্গামৃত্তিকা ও রুদ্রাক্ষমালারা প্রগ্র্যামের ভীষণ ভূমিকম্পে জড় সড় হয়ে টোলের মধ্যে প্রবেশ কল্লে। সেখানে আস্তাবলওয়ালাদের পেটে, নাকে, কানে, হাতে, বুকে, কপালে ও কণ্ঠে উঠে আড়ষ্ট হয়ে রইলো। কোঁচানো গরদ, চেলীর দোবজা, ধোয়া নয়ানসূকের ঘোড় ও নামাবলীরা দড়ির আল্লায় রাধাকৃষ্ণের দোলের মত কুলতে লাগলো। আজ আমাদের নবীন অধ্যাপক মহা বিগ্রহদের অতীতপূর্ব চটক দেখে কে ?

এদিকে বেশ্যালে ছোট ছোট মেয়েদের তালিম দেওয়া আরম্ভ হলো। তবলা, মন্দিরে ও তানপুরা বাজতে লাগলো। কুমারীদের নাম ফিরিয়ে নাম রাখার এই এক সময়। জন্মভূমিতে যারা খুঁদী, চাঁপী, কুড়ুনী, সাগুরি ও ভূতি নামে বিখ্যাত ছিল, এখন তাদের নাম গোলাপ, টগর, কামিনী, আতর ও হেলেনা। অনেকের টুকুনী গ্রহণের বয়স হওয়াতে প্রতিনিধির দ্বারা ভার লাঘবের চেষ্টা হচ্ছে। সেই

সকল প্রতিনিধির নাম কমল, কুমুদ, আদর, মোহিনী, কুম্ম, সারদা, লক্ষ্মী ও টেবা। জয়মঙ্গলা ও উজ্জ্বলা প্রভৃতি দুই বাইয়েরা ভেড়ুয়াদের সঙ্গে কুমারীগণকে নৃত্তন নৃত্তন গীত, সোনাররেশেদের মত ছাকা ছাকা কথা ও “সুচা, লুচা, নিস্ত, নিচা” প্রভৃতি সাঙ্কেতিক বাক্য অভ্যাস করাকে। সহরে এখন পূর্বের মত নামজাদা মেয়েমানুষ দুলভ হয়ে পড়েছে। আজকাল সোনাগাজীর বিখ্যাত স্বর্ণবাই যা কিছু কল্কেতার মান রেখেচেন।

এদিকে বাবু ও পেশাদার যাত্রা, পাচালি, খেমটা, হাফ আখড়াই ও ফুল আখড়াই দলের তালিম হচ্ছে। অনবরত তানপুরা, সারঙ, বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গ বাজছে। স্পিরিট, চরস ও গাঁজা অবিশ্রাম চলছে। গায়কদের সাধা গলার সুস্বর চীৎকারে বাকবাণী আর এ তিন দিনও অপেক্ষা কর্তে পাচ্ছেন না। আজি যেন আসরে মূর্ত্তিমতী হন হন হয়েচেন!

হা! বাঙ্গালা দেশের সঙ্গীতশাস্ত্রের কি দুর্দশা! এই মনোহর ও লোকপ্ৰীতিকর সঙ্গীতবিজ্ঞা যেন এদেশকে এককালে পরিত্যাগ করে গিয়েছে। পূর্বে আকবর শাহ বাদশাহের আমলে ও ইংরাজ অধিকারের সময়ে (২০।২৫ বৎসর হলো) উত্তর পশ্চিম অঞ্চল থেকে কয়েক জন উত্তম কালোয়াত ও খেয়ালগায়ক এদেশে আগমন করেছিলেন। কল্কেতার বাবুরা তাঁহাদের নাম জানেন, তথাপি নব্যদলের মনে করে দিবার নিমিত্ত কয়েকটি নাম বলা যাচ্ছে। তানসেন, গোপাল নায়ক, বয়জু বাউরা, আমীর খসরু, হস্‌সু খাঁ, দেলবর খাঁ, শা-সাহেব, (বহুরূপা) দক্ষী বাই, বড়মিয়া, ছোটমিয়া (রহিম বক্স), নেকীবাই, বন্দাবন দাস, ফিরোজ খাঁ (রবাবী) প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। চুঁচুড়া নিবাসী বাবু রামচন্দ্র শীল, বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায়, মৃত বাবু গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, হাটখোলার বাবু রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ভবানীপুরের বাবু ভোলানাথ চৌধুরী, শ্রীরামপুরের বাবু রামদাস গোস্বামী, বঁড়িশার বাবু চন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি পূর্বোক্ত কালোয়াতদিগের কাছে উত্তমরূপ গীত শিক্ষা করেছিলেন। ইহাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন, তাঁরা এবং এন্দোদোলা, জামীর খাঁ, রমুল বক্স, হায়দর বক্স, মুরাদআলী খাঁ, রমাপতি বাবু ও বিষ্ণু বাবু প্রভৃতি আজো বাঙ্গালা দেশে সঙ্গীতবিজ্ঞার মান রেখেছেন। তাঁরা যদি এক এক মায়াজালে জড়িয়ে বেহাতী না হতেন, ক্রমে এই বিজ্ঞার উন্নতি দেখা যেতো। বিশেষতঃ রমাপতি বাবু ব্যতিরেকে তাঁহাদের কাহারো এমন যত্ন দেখা যায় না যে, সেই সকল হিন্দি সুর ও রাগ বজায় রেখে ভাল ভাল বাঙ্গালা গীত প্রস্তুত করে লন। কবিতাওয়ালা রাম বসু, হরু ঠাকুর, ঠাকুরগণবিষয়গায়ক রাম-

প্রসাদ সেন, টিলাওয়ালা নিধু ও শ্রীধর বাবু এককালে এ বিষয়ে প্রাশংসা লাভ করে গ্যাচেন। পক্ষী ও ধীরাজ উপস্থিত গায়ক। আলী রেজা, হোসেন রেজা, গোলাম রেজা, সা-ইমাম বক্স উত্তম সেতারবাদক ছিলেন। বাবু মাধবচন্দ্র ঘোষ, বাবু আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু), বাবু রাজনারায়ণ বশাক, সিঙুরের শ্রীনাথ বাবু (নবাববাবু), বাবু শিবচন্দ্র পাল, বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বাবু নবীনচন্দ্র গোস্বামী উহাদের সাক্ষরেন। লাল কেবল কিষণ, গীরবক্স ও গোলাম আব্বাস উত্তম মৃদঙ্গ বাজাতেন। মৃত বাবু শ্রীরাম চক্রবর্তী, বাবু কেশবচন্দ্র মিত্র, বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু পঞ্চানন মিত্র তাঁহাদের কাছেই মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন। এখন অনেক বড়মানুষের গাওনা বাজনার সখ আছে, কিন্তু হিন্দী গীতের আর তাদৃশ গৌরব নাই। বাঙ্গালা দেশে বিজাতীয় ভাষার কেনই যথেষ্ট আদর থাকবে? তথাচ হিন্দীর আধিপত্য বড়। নীলামের ডিগ্রিম প্রচারকের ছায় যারা তবলায় হাত ফেলতে শিখেচে, তারাও মাথা নেড়ে হিন্দীর তান ভাঁজে। যারা পাড়ায় পাড়ায় চামর মন্দিরে নেড়ে মনসা, মাণিকপীর ও বিবি ওলা ঝোলার গীত গেয়ে বেড়ায়, তারা এবং পথভিখারীরাও হিন্দী গেয়ে বাহাছুরী নিয়ে যাচ্ছে। দূতী-সম্বাদ ও রামযাত্রার সঙ, সখা ও নকিবেরা হিন্দী গায়। একে ত সেই সেকলে পেট উচু যশোদা, লম্বা লম্বা দূতী, খেড়ে বাসুদেব, শ্যাকড়ার খোঁপা বাঁধা পৌনে ৪ হাত কয়াধু, মুখোস পরা পাট জড়ানো হনুমান, খড়িমাখা কালুয়া ভুলুয়া ও ঝান্টা কাটা সাঁকুতির ছল কানে ম্যাথরাণীর মুখে :—

“নারদ আর কি কৃষ্ণধনে পাবো।”

“কোথা যাবে শ্রামচাঁদ, দাসখৎ এনেছি বেঁধে।”

“একবার বাঁকা হয়ে দাঁড়াও শ্রীহরি।”

“প্রহ্লাদ রে কি নাম শুনালি আবার বল।”

“জানকী হারিয়ে রঘুমণি হে।”

“বাবু কাঁহে বোলাওয়ে আপনে।”

“ল্যাড়কা মাগে মাল্পো রুটি, চেড়ী উড়ী—”

এইরূপ স্তম্ভিত গীত, এবং তবে বলো, তবে শোনো, এখন একে ত ভালই লাগে না, তার উপর আবার পঞ্চ গব্য হিন্দী বোল উপসর্গ। ঊনবিংশ শতাব্দীর এ সভ্যতা নয়। সঙ্গীত ও ব্যায়াম এক কালে উঠে গ্যাচে দেখে অনেকে আক্ষেপ করে থাকেন, রাজা যখন যে বিষয়ের উৎসাহ দেন, তখন সেই বিষয়ের জয় জয়কার হয়! সঙ্গীতে রাজার উৎসাহ আশা করা সাহায্যেতে জলসেচনের তুল্য। তাঁদের

নিজের গীত বাজ্ঞ একপ্রকার দিল্লীকা লাড্ডু^৩ হয়েছে। এদেশের লোক নিজে কিছু করবেন, তার আঁচড়েই পরিচয় আছে। কেউ একটু মনে মনে বড়লোক হলে, সখের যাত্রা, সখের পাঁচালি, হাফ্ আখড়াই ও গুলীর আড্ডা করে জাঁকিয়ে বসেন। কিছুদিন গোণে মদের ভাঁটি বসবে। এখানে এখন কেবল শূণ্যগর্ভ, আড়ম্বরপূর্ণ, বৃথা বাক্যব্যয়, ঘোরতর আত্মাভিমান, অদ্ভুত উপহাসরসিকতা ও অসম্ভব লম্পটতাই বিদ্যমান রয়েছে। তারাই আমাদের “ইণ্ডিয়ান হিঠেবিশী” সভার অফিশিয়েটিও সভাপতি ও অর্ডিনারী সভ্য। ছেলেবেলা ইতিহাসে দেখা গ্যাচে, পূর্বের মুরশিদাবাদ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক এক পরিবার এমনি সৌখীন ছল্লাল ছিলেন, তাঁরা যখন যে নগরে পদার্পণ কর্তেন, সে নগরের সমুদায় দেবীমন্দির দর্শন না করে প্রত্যাবৃত্ত হতেন না। আজো দাক্ষিণাত্য ও পূর্বদেশ মুরশিদাবাদের পেছ পেছ যাচ্ছেন; কিন্তু কল্কেতা সহর সকলের টেকা। এখানকার অনেক জহরী রমণী মণিমন্দিরের মরকতশিলায় উপবেশন করে চুলের দড়ি, টিপ ও এদিক্ ওদিক্ নানাবিধ কোশল শিখছেন! অথচ আমাদের মুখ ফুটে পবলিক ক্লাবে মাথা নাড়া সুরে বাঁকা চোরা তালে এইরূপ বক্তৃতা হয়ে থাকে :—

ইয়ং বেঙ্গলী স্পিচ্।

এই অসীম—এই অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, এই অখণ্ড মণ্ডলাকারা জগৎ, আমাদের পরীক্ষা-ক্ষেত্র, মঙ্গলময়, চিন্ময়, বিশ্বপতি, সর্বসার, সর্বশক্তিমান্ বিভূ আমাদিগকে রিওয়ার্ড দেন নাই। (ক্ল্যাপ্।) আমাদের উচিত আছে, তাঁহার পবিত্র মঙ্গল ইচ্ছা সকল, মঙ্গল নিয়ম সকল এবং মঙ্গল আজ্ঞা সকল পালন ও তাঁহার প্রসাদ স্বরূপ বস্তু সকল উপভোগ করিয়া তাঁহার নিকটে ট্রাইরেল দিই, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। (অ্যাপ্লাজ্!)।

রিফর্মেশনের দিন আগত। সুপারিশ্বৈশনের আসন্ন দশা উপস্থিত! আইডলেটরির ডেথ্বেড্ প্রস্তুত! সত্য জ্যোতিঃ, সত্য ধর্ম, সত্য দীপ্তি সকল এখন জানানো মধ্যে, নগরী মধ্যে, অট্টালিকা মধ্যে, প্রাসাদ শিখরে, জঙ্গল মধ্যে, গিরি গহ্বরে, অন্তরীপকেন্দ্রে, সমুদ্রে বিবরে প্রকাশ পাইতেছে। ইত্যাদি (হিপ্-হিপ্—হরে ব্রাতো!)

ওঁ তৎ সৎ।

৪ বাহারা ইংরেজদের থিয়েটারে (নাট্যশালায়) সায়েব বিবির তামাশা দেখেচেন, তাঁহারা পস্বেচেন, আর বাঁরা না দেখেচেন, তাঁরাও পস্বেচেন। এ দিনে কেবল শুঁড়ী হয়ে জন্মান তাল, অসম্ভব উৎসাহ পাওয়া যায়।

ওদিকে তালিম, তামিল ও মওলা দিতেই দুদিন কেটে গ্যালো। রাত্তার ধারের পোড়ো বাড়িতে ঝাঁকড়াচুলো যাত্রাওয়ালাদের মওলার “হায় হায়” শব্দ শাম্লে। আজ বুধবার। হাটবাজার আরম্ভ হলো। বেলোয়ারী চুড়ি, মেটে ও চীনের সিঁহুর, মিসি, একসচেঞ্জ গেজেট ও বাঙলা খবরের কাগজ মোড়া মাথাঘষারা অ্যাকুডক্টের উপর তক্তার গায় রুলে ও চৌকি চোড়ে রাত্তাপানে চেয়ে, হাসতে লাগলো। ফেরীওয়ালারা আজ বেগুনে বস্ত্র, ময়ূরপুচ্ছ দেওয়া চূড়ো ও চিত্রকরা বাড়ি নিয়ে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে। আবীর, আত্মমুকুল, অজ্র ও যরের শীষেরা তাহাদের হাঁড়ির ভিতর থেকে উঁকি মারছে।

ক্রমে বেলা ছুই প্রহর। দিনমণি যেন এক স্থানে থেকে, জগতের সমুদায় শোভা সন্দর্শন কর্বেন মনে করেই, নভোমণ্ডলের মধ্যভাগ থেকে রশ্মিমালাক্লপ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর্বে লাগলেন। বাড়ি বাড়ি প্রতিমে সাজানো আরম্ভ হয়েছে। এক বাড়ির বিবির আগে উজ্জুগ হয় নাই, দিন গ্যালো দেখে তিনি তাঁহার বাবুর গলায় অভিমানে গামছা দিয়েছেন। বাবু তাঁর পিতামহীর সিঁহুক ভেঙে ছুছড়া চাঁদী কাটা পৈছে ও একটা সিঁহুরচুপড়ি চুরি করে তাড়াতাড়ি মাটির কাজ আরম্ভ করে দিলেন। পটোরা একেবারে খড়, মাটি, মৃণ্ড, মাজনখড়ি ভাঙা বেল, হাঁসের ডিম ও রং নিয়ে নায়েকবাড়ি উপস্থিত হয়েছে। ঢুলীরা ঢোল, কঁাসি ও সানাই কলাচ্ছে। আচাষি ও মালীরা গাঁদাফুল, বিষপত্র, সোলার পদ্ম ও দুর্বো সংগ্রহের ধূমে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে। মিঠাইওয়ালা ব্রাহ্মণ, ময়দাওয়ালা খোঁট্টা, ফুলুরি ও চেনাচুর-ওয়ালা মুসলমান, সন্দেশ ও বীরখণ্ডীওয়ালা ময়রা, দধি ও মন্তওয়ালা গোয়ালা ও শুঁড়ীদের এক দণ্ড নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ নাই। বাবুর বাড়ির দরওয়ান, খানসামা ও আরদালীরা নূতন নূতন পোশাক, তক্কা ও উর্দি পরে এবাড়ি ওবাড়ি কছে। মোসাহেব ও উমেদারেরা আজ নিমেষ মাত্র বাবুর কাছছাড়া হচে না। ইংরাজি স্কুলের আউট ষ্টুডেন্ট জ্যাঠারা সে দিন ক্রিষ্টমাস ও বিলিতি নব বৎসর উপলক্ষে অনেক প্রকার আমোদ করে উৎরে উঠেছেন, স্মতরাং তাঁদের আর বড় একটা আড়ম্বর দেখা যাচ্ছে না। তথাপি কতকগুলির ভিতরে ভিতরে বাগান, বিবি ও শুঁড়ীর সঙ্গে ফ্রেডিতে বন্দোবস্ত হয়ে রয়েছে।

একজন ব্রাহ্ম মাটির সরস্বতীর চূড়োর উপর “ওঁ তৎ সৎ” লিখে পৌত্তলিকদের ঢাক ঢোলের পরিবর্তে পিয়ানো এবং হারমোনিয়ম বাজিয়ে ছু দণ্ড আয়েস কর্বেন স্থির করেছেন। তিনি এক্ষণ দোষী হতে পারেন না। যখন ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম অন্নপ্রাশন, ব্রাহ্ম জাতকর্ম, ব্রাহ্ম স্মৃতিকাপুজো ও ব্রাহ্ম উপনয়ন প্রভৃতি চল্ছে,

তখন ব্রাহ্মমতে সরস্বতীপূজা ও দুর্গোৎসব না হতে পারে কেন ? হতভাগ্য দুর্গা ও সরস্বতীরা তবে কি অপরাধ করেচেন ! গল্পে আছে, এক ব্যক্তি উপদেশ দিয়েছিলেন, ষাঁর ইচ্ছা হয়, তিনি পৌত্তলিকেরা যেকল্প করেন, সেকল্প না করে, অন্তের বাড়িতে কিছু কিছু দিয়ে তাহার নামে সংকল্প করলেই দোষ ক্ষালন হতে পার্বে। লোকে পেড়াপিড়ি করে “আমি করি নাই, ঠাকুরমা করেছিল” এই কথা বলে সেরে নেবারও পথ থাকবে। গল্পে যাই থাক, কিন্তু নাই বা পথ থাকলো, ১২৭০ সালে এই যে এক দল মফস্বলে ব্রাহ্ম বারোইয়ারি পূজাতে মেতে উঠলেন, তাঁদের রিফরেশন স্কুলের সর্কার পোড়ো আপনার বাসাবাড়িতে কাদের বাসা দিলেন, কৈ তাঁদের কি হয়েছে ? আজো কি তাঁরা (ব্রাহ্ম বলে) লোকসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করেন ? ব্রাহ্মধর্ম যেন ছেলেদের খেলবার লাটিম ও দুর্গাবাড়ির লাড়ু মুড়কির দলে গণ্য হয়ে পড়েচেন !

লোকের উৎসাহ ও রৈরৈকার আমোদের পরাকাষ্ঠা দেখে দিনকর যেন কাতর মনে রক্ত মেখেই অস্ত গেলেন। সন্ধ্যাবধু সরস্বতীকে ধূলবর্ণ বস্ত্র পরিধান কর্তে দেখে ঈর্ষাভরে নীলবসনে অবগুষ্ঠিত হয়ে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে। লোকের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হলে অবিলম্বেই পতন হয়, এই কথা সপ্রমাণ করবার নিমিত্তই যেন, চন্দ্রমা নভোমণ্ডল থেকে কর বিস্তার করে অভিমানিনী সন্ধ্যার বস্ত্র হরণ করলেন। ভূমণ্ডল কৌমুদীময় হয়ে গ্যালো। সরোবরের কুমুদিনীরা বারাণ্ডার সপত্নীদের গর্ব দেখে ক্রোধে বায়ুভরে হেলতে ছুল্লে লাগলেন। ক্রমে জোড়া-সাঁকোর ব্রাহ্মসমাজের দরোজায় ব্রাহ্ম ও দর্শকদের গাড়ির আমদানী হতে লাগলো। বাজায় ও উপাসনার সামগ্রী উপস্থিত হলো। গ্যাস জ্বলে দিয়ে “জ্ঞানমনস্ত” প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ, বক্তৃতা পাঠ ও পাখোয়াজ বাজিয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত আরম্ভ করা হলো।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী কেদার। তাল তিওট।

“মনোরে আমার ! এ কি ভ্রান্তি তোমার।

ভাবনা কেন রে ? ভাব না কেন রে ?

অরূপ স্বরূপ সার ॥

শিশির বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,

যে জন করিল এ সব সৃষ্টি,

যে জন দিয়েছে নয়নে

তাঁরে ভাবো একবার ॥

দিবাকর, নিশাকর, লোয়ে ঘাঁর ভাস ।

দিবানিশি, করে করে তিমির বিনাশ ॥

নিয়ত নিয়ম করিয়া লক্ষ্য,

রাশি, রাশি, রাশি, প্রকাশে পক্ষ.

অহরহ রহ করিয়া সখ্য

বার বার ভ্রমে বার ॥

অনিত্য বিষয়ে কেন ভ্রমো ভ্রম আশে ?

ভজ নিত্য, নিত্য বিত্ত, চিত্ততীর্থ বাসে ॥

হৃদয়-নিলয়ে পরম রতন,

সে ধনে তুমি হে না করো যতন,

বৃথায় করিছ শরীর পতন,

অসার ভাবিয়া সার ॥” ১

রাগিণী দেশ । তাল আড়া ।

“অজ্ঞানো তিমিরো বলো, কোথা রবে আর ?

সুখদ সরল শশী, স্বভাবে সঞ্চার ॥

ঘুচাও বিপক্ষ ভয়, করো রিপু পরাজয়,

আলোকে পুলকময়, অখিল সংসার ॥

শশি-শোভা আচ্ছাদন, যদি করে নবঘন,

নাশে যথা সমীরণ সেই অন্ধকার,

মেঘাস্তে যামিনী-কর, হন পুন শোভাকর,

মনোহর নৃগধর, সুধার'আধার ॥

সে রূপ করিয়া ক্রম, বিবেক পবন সম,

মহামোহ মেঘ তম, করহ সংহার ॥

পরিপূর্ণ জ্ঞানজ্যোতি, প্রকট প্রদীপ্ত অতি,

প্রবোধ-পীযুষ পতি প্রভাবে প্রচার ॥” ২

রাগিণী বেহাগ । তাল আড়া ।

“তোমার ভোগের নহে, এ ভব বিত্তব ।

ভাবের ভবন-ভব স্বভাবে সম্ভব ॥

তুমি আমি নাহি রব, রবে মাত্র এক রব,

যত সব, তত শব, এই সব, এই শব ॥

ধরি হে চরণ তব, মন রে প্রসন্ন ভব !

কাম আদি মনোভব, করো পরাভব ॥” ৩

ছজন বিক্রমপুরী বাবু আজ নূতন কল্কেতা দেখতে এসেছিলেন। মেছো-বাজারের শোভা দর্শনই তাঁহাদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। মস্ত একটা তেতালা বাড়িতে আলো জ্বল্চে ও গানবাজনা হচ্ছে দেখে, গড়্ গড়্ শব্দে উপরে উঠতে লাগলেন। ব্রাহ্ম যাচ্ছেন মনে করে গ্রহরীরা বারণ কল্লেন না। তাঁরা সমাজঘরে ঢুকেই হতাশ হলেন! এক জন বলেন, “এখানে তা নয়, আমরা যাহার লাগ্যে আইচি।” দ্বিতীয় বাবু “অয় বাগ্য!” বলেই নেমে গেলেন। পূর্বদেশে এইরূপ অনেকগুলি পেট উঁচু গুরিয়া পুতুল আছেন, এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু কয়েক জন ভদ্রলোক উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখে উত্তম উত্তম রাজকার্য্যে (বিচারকের পদ প্রভৃতিতে) নিযুক্ত হয়েছেন। অধিকাংশ পাটোয়ারিগিরি অভ্যাস করে আদালতের আমলাগিরি প্রায় একচেটে করেছেন। যা হোক, পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে ঢাকা আজকাল অপেক্ষাকৃত সভ্যতম স্থান হয়ে উঠ্চে।

ওদিকে বাঙাল ছুটি নেমে গেলে পর, হারমোনিয়ম থামলো, পাঁখোয়াজের চাটি এবং ওঁ তৎ সতের সঙ্গে সমাজ ভঙ্গ হলো। অকপট ধর্ম্মাবলম্বীরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কল্লেন। ছদ্মবেশী তপস্বীরা সরস্বতীপুজোর বাঁকে গিয়ে মিশলেন। এতক্ষণের পর পালের চটক বেরুলো। উড়ে বেহারাদের কল্যাণে অনেক এম্টি হাউস্ আরমানী, যিহুদী ও ইংরেজী বিবিতে পরিপূর্ণ হয়ে গ্যালো! এই সকল খালি বাড়ি বিলিতি সতীত্বের কষ্টিপাথর ও বদমায়েশির প্রধান আশ্রয়।

বৃহবার এইরূপে বিদায় হলেন। আজ বৃহস্পতিবার। চতুর্থী। পুজোর পূর্বদিনটি দেখতে দেখতে কেটে যায়। আসর সাজানো, দেবীঘট, নারকেলের মুচি ও আত্মশাখা সংগ্রহ কর্তেই দিন শেষ হলো। রাত্রিতেও অনেক কাজ শুছিয়ে রাখা হলো। অনেকের নিদ্রাই হলো না। রেজিমেন্টের মত ফুলবাবুর বাঁক গড়া গড়া গুয়ে পড়লেন; কিন্তু শয়ন কর্তে কর্তেই শৃগাল, কাক ও কুকুট ডেকে উঠলো। তোপের গুমুস ও স-করতালি “বোমকালী” ইত্যাদি শব্দ শুনা গেল। উড়ুসু কাক, জলের ভারী, গঙ্গানান্নের যাত্রী, বেতো বুড়ো ও স্বাভেজ্বরের গাড়ি

চতুর্দিকে বেরুলো। ডাক্তরেরা প্র্যাক্টিসে বেরুলেন। বাড়ি২ ঢাক ঢোল ও রোশনচৌকি বেজে উঠলো। বেঞ্জালয়ের সকলে শয্যাভ্যাগ করে গাত্রোথান করলেন। একটি কামিনী হাই তুলে আলস্ত ত্যজ্ঞে দেখলেন, তিনি তাঁহার দোলন নখের বিলিতি মুক্তোর নোলকটা উক্ষণ করে ফেলেচেন। যাঃ !!

আজ শুক্রবার। ত্রীপঞ্চমী। পাঠকগণ মনে করুন, আশ্বিন মাসের শারদীয় পঞ্চমীর মত এ পঞ্চমীর তত মাহাত্ম্য নাই, তথাপি সহরে আমোদের স্রোত ধরচে না। পাঠশালার ছোট ছোট ছেলেরা সকাল সকাল কাপড় ছেড়ে, কেউ নেয়ে, দোত, কলম ও দণ্ডুর ধুয়ে আঁবের বোল, যবের শীষ মুখে দিয়ে, সাজিয়ে দিচ্ছে। কুল খাবার আছলাদে চন্দনের টিপ করে, পুষ্পাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত ভট্‌চামিদের উমেদারি কচ্ছে। ইংরাজী স্কুলের পিতামহ স্কলারেরা তাদের “অর্থোডক্স, হিপোক্রিট” বলে উপহাস কছেন। তারা তাতে ক্ষেপও কচ্ছে না। সংস্কার আছে, সরস্বতী না খেলে বালকেরা যদি কুল খায়, বিচার অশুভ দৃষ্টি পড়ে। ক্রমে বেলা হয়ে পড়লো। “আলু পটোল উচ্ছে, চাই ভালো ঘোল, কাপড় ওয়ালা আয়া মেম সাব, ছানা মুরগী চাই” প্রভৃতি ফেরিস্বর কর্ণমধ্যে প্রবেশ কর্তে লাগলো। পরামাণিক, শিপ্‌সরকার, রেলওয়ে ও কোন কোন সদাগবেব বাড়ির কেরানী পাগড়ি বেঁধে বেরিয়েচে। ইহাদের কোন পার্বণেই প্রায় অবকাশ নাই। দালালেরা এক কানে কলম, আর এক কানে পেলিল গুঁজে, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলেচেন। রাজপথ পাগড়ি, সেলর, রুল কাঁধে কালো পুতুল, কোম্পানির কাগজের বেণ্ডার, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি, নেড়ে, হকার, কুকুর ও জুয়াচোরে পুরে গ্যাচে।

ওদিকে পূজো আরম্ভ হয়ে গ্যালো। ধূপ, দীপ, ঘণ্টা ও ঢাক ঢোলের গঞ্জে ও শব্দে চার দিক্ মাতিয়ে তুলে। বারান্দা পল্লীর কথাই এক স্বতন্ত্র। সেখানে সহরের রকমারি আমোদের ও আমোদপ্রিয় দলের মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম যেন ইয়ং বেঙ্গলদের ভয়ে, ধুনো, শাঁক, গঙ্গাজল ও পবিত্রতায় আচ্ছাদিত হয়ে ঐ সকল কুঞ্জে লুকিয়ে রয়েছেন! পালে পালে মেঘপালের স্নায় বাবুর পাল অনবরত ঘুরছেন। এক একটা বুলডগ্‌ তাঁহাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন। ইহারা বলেন, আমরা সখের খাতায় বর্ধমানের মহাতাপর্চাঁদ ও কল্‌কেতার জয়মিত্র অপেক্ষাও সরেস। কিন্তু যে দিন জয়কৃষ্ণ খালাস হন, সে দিন অনেকের নিষ্কণ্টক বাবুগিরির ভূমিকম্প হয়েছিল। এদেশের জাতিভেদ ও সমাজবন্ধনকে ধ্বংসবাদ। আজ অনেক ব্রাহ্মণ গঙ্গামুক্তিকার ছাপ নিয়ে, তিলক

কেটে, গামছা নিয়ে বেশীদের দ্বারে দ্বারে আতপ চাল, বীরখণ্ডী ও ছোলা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন। ইহাদের অনেকে শ্রায়লঙ্কার, শিরোমণি ও বাচস্পতি। ছুঁর্তাগ্যক্রমে আমাদের দেশের অধিকাংশ নিরক্ষর পণ্ডিতই সমাজের অধ্যাপক, কবিরাজ ও মোস্তার। অধ্যাপকেরা না লাগেন এমন কর্মই নাই। এক বছর এক জন পাড়ারগৈয়ে মুচ্ছদীর বাড়িতে ছুঁর্তাগ্যসবের সময় এই ধাতুর এক পুরুত ছিলেন। মনে করুন, আমরা প্রাচীনা ধাতুর নাম কচ্ছি। পুরুত ঠাকুর আর এক বাড়ির পুজোর অষ্টমীর দিন চুপকালি মেখে রামযাত্রার ভিত্তি সেজেছেন। সন্ধিপুজোর সময় তিনি নূপুর পায়ে, মশক ঘাড়ে, তালে তালে নৃত্য করছেন, এমন সময় সন্ধিপুজোর ঢাক বাজলো। ওদিকে মুচ্ছদীর বাড়ির পুরুতকে পাওয়া যাচ্ছে না। বলিদানের সময় বয়ে যায়। খাঁড়া হাতে কামার ও সরা হাতে খান্সামারা পথে ঘাটে ও জঙ্গলে পুরুত খুঁজে বেড়াচ্ছে। এদিকে পুরুতের চটকা ভাঙলো। তিনি মশক ফেলে পুহুরে ডুবে রং ধুয়ে, তাড়াতাড়ি পঞ্চগুড়ির আসনে গিয়ে বসে পড়লেন। পাহার ভিজে কাপড়ে আসনের ফটোগ্রাফ উঠলো। তখন লজ্জা পেয়ে ভেড়ার আসনে বসে অনামিকা অঙ্গুষ্ঠে নাক ধরে শ্বাস আরম্ভ করলেন। আমাদের মত কামার হলে সেই সময়েই ভিত্তির খোলস বদলানো পুরোহিতের শিঙে সিঁছুর মাখিয়ে মার খর্বরে ধরে দিতে পারতো। মুচ্ছদীর কপালক্রমে পুরো নবমীতে একটা চারপেয়ে ছাগল এনে ছুপেয়ে ছাগলের মস্তে উৎসর্গ করে কোপ কর্তে হলো। এদেশের পুরুতদের জীবনচরিত খুঁজে দেখলে অনেক ভিত্তি, ছলুয়া ও বিভীষণ পাওয়া যেতে পারে।

এদিকে সরস্বতীপূজা হয়ে গ্যালো। ঢাক ঢোল বেজে উঠলো। ছেলেরা নৈবিদীর ধারে দাঁড়িয়ে সচন্দন ফুল বিষ্ণপত্র নিয়ে “সরস্বতৈ নমো নিত্যং” বলে অঞ্জলি দিলে। ফুল কানে গুঁজে বীরখণ্ডী ও কুল খেলে। সূর্য্যদেব মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিমে একটু গড়িয়ে পড়লেন। পরামাণিক ও রিপূর কর্ম শেষ পাক ঘুরে ফিরে গ্যালো। গুড়ুম করে একটার তোপ পড়লো। পথে কোর মাখানো কাপড়পরা ছোঁড়া এবং আধখানা বুকখোলা হাঁ করা ছুঁড়ীগুলো গাড়ির ভিড় ঠেলে এবাড়ি ওবাড়ি ঠাকুর দেখে বেড়াচ্ছে। যাত্রাওয়ালার মুটেরা ভারে করে মুখোস, ঢোলক ও বাখারির হাতী নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। বওয়াটে মিলেগুলো হো হো শব্দে তাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুচ্ছে। ক্রমে ছটো, তিনটে, চারটে ও পাঁচটা বেজে গ্যালো; সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। রাস্তার গ্যাসের লার্টন মাথায় খুঁটিরা মই কাঁধে মুটেদের হাত ধরে মহানগরীকে মাণহার উপহার দিতে লাগলো। গলির ভিতরের

তেলের আলোরা জোনাক পোকাদের স্পর্শ করে মিড়্ মিড়্ করে জ্বলে উঠলো। দেবীশালার আসরের ঝাড় জ্বলে দেওয়া হলো। চার দিকে বাঁধা রোশনাইয়ের খোলতা দেখে কুমুদিনীনাথ যেন, অভিমানে শরীরের ছু ভাগ ঢেকে তৃতীয়ংশ বিকাশ করলেন। প্রতিমে দর্শনের সময় উপস্থিত হলো। আরতি হয়ে যাচ্ছে, বাজনাবাদি চুপ করেছে। এমন সময় বাবুদের কোচম্যানেরা কপিধ্বজ জুড়ে আনলে। বাবুরা সসৌন্দর্য্য তাহাতে আরোহণ করলেন। তকমাপরা আরদালীরা খেত চামর কাঁধে ঝুলিয়ে পেছনে উঠলো। ছ এক জন কেনা রাজার আশাসৌটাঁবরদারেরা কোচবাক্সে বসলো। লোকের ভিড়, গাড়ির শব্দ ও সইসের “সাম্নেওয়ালা, সজ্জওয়ালা” চীৎকারে রাস্তা হুর্গম করে তুলে। ইতিমধ্যে এক জন মোসায়েরব ছেঁড়া উড়ুনির পাগড়িবাঁধাসুদ্ধ তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে, দেড় পয়সার পানের দোনা কিনে নিয়ে গেলেন।

দর্শকেরা এইরূপ রাজবেশে দশ বাড়ির ঠাকুর দেখে আমোদ করে বেড়াতে লাগলেন। এক এক বাড়ির বড় কর্তা প্রতিমের সম্মুখে জনতার ছল করে দর্শকদের আলিঙ্গন দিয়ে তুললেন। আদরের সামগ্রী যেরূপে গ্রহণ কর্তে হয়, কল্কেতার বাবুরা তাহা বিলক্ষণ জানেন। আতরদান্ গোলাবপাশ হস্তে এক এক জন লম্বোদর প্রায় সকল বাড়ির প্রতিমের সম্মুখে হাজির আছেন। তাঁরা নিমন্ত্রিতাগণের মুখে, চোখে, বকে গোলাপ বৃষ্টি কচ্চেন, আর আড়ে আড়ে হাসছেন।

সহরে এখন আহার ব্যবহারের অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। কেবল ছ এক জন খাঁটি হিন্দুর বাটিতে কতক কতক পূর্ব্ভাব দর্শন করা গিয়া থাকে। কমলা এখন ইয়ং বেঙ্গলদের ভয়ে যে সকল শ্রীবৃন্দাবনের নির্জন গুহার আশ্রয় নিয়েচেন, যে সকল স্থানে এখন ধুনোর ধোঁয়া, শাঁকের শব্দ, গজাজলের ছড়া ও বাছ পরিপাটীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী বাঁধা আছেন, সেখানেও কতকাংশে ফলারভক্তদের লোলরসনা পরিভূপ্ত হয়। নচেৎ গুপ্ত হিন্দুদের মাথালো মাথালো বাড়িতে ব্রাহ্মণেরা খই দই খেয়ে ছ পয়সা দক্ষিণে পেয়ে বিদায় হন। ৪ ইঞ্চ ভাগের ছ অংশী দাড়িসুদ্ধ হুগুগ কোম্পানির ম্যানেজার সাহেব, পৌনে ছ হাত দাড়ি ও কাবুলী তাজ সুদ্ধ ইন্টারলোপার মৌলবী সাহেব, মন্ডী ক্যাপ ও মোগলী পাগসুদ্ধ জম্মফলারে বাবুজী সাহেব, গড়্গোড়ে গাড়িতে গাড়িবারাণ্ডায় ঝাড়া হবা মাত্র, উপর ঘরের খাস চেয়ারে পাকা পাকা খানার কুরুক্ষেত্র হয়ে যায়। মটকপেরা লজ্জা পেয়ে চারপেয়ের গানের পরিবর্তে ছপেয়ের উদরভূষণ হয়! এও

বয়ঃ ভাল। কিন্তু অনেক স্থলে আবার গবর্ণর জেনেরলের দরবারের মত গোলাপী খিলির দোনা দক্ষিণা ও প্রণামী আদান প্রদান আরম্ভ হয়েছে। স্থানবিশেষের উদরসর্ব্বশ্ব নাটককার ফলারে প্রোফেসরেরা ঐ সকল স্থানে বঞ্চিত হয়ে ফিরে আসেন। অনেক বাবু আপনানাই আপনাদের জঠরজালায় জগৎ ভস্ম করেন। একটি গল্প আমাদের জঠরপরায়ণ কুস্তকর্ণের জীবনচরিত উজ্জ্বল করে রয়েছে। সেই গল্পের নায়ক উদরায়ণ বাহাদুর উত্তম আহাৰ কৰ্ত্তে পারতেন। এক দিন তাঁহার গো-পাল চাকর এক ঝুড়ি খড় কেটে গরুর জাব দিতে যাচ্ছিল, বাবু দেখতে পেয়ে হজুরী সুরে জিজ্ঞেস কল্লেন, “কি হ্যা, রামহরি?” চাকর উত্তর কলে, “আজ্ঞা, বিচিলি কৰ্ত্তা!” আমাদের উদরায়ণ বাহাদুর তৎক্ষণাৎ হাস্তমুখে বলেন, “হাঁ: হা: হা:! দে যা না ভাই চাটি খাই!” রামহরি আমাদের বাবুর আজ্ঞাবহ ভূত্য। আজ্ঞা মাত্র সমুখে ঝুড়ি ধরে, বাবু মুঠো মুঠো করে ঝুড়িটি নিষাড়ী কল্লেন! এই ত: !!

এক এক বাড়িতে নিষ্খুম গোছের পাঁচালি, এক বাড়িতে উমেশ মিত্রের (গোপালে উড়ের) যাত্রা, এবং অনেক বাড়িতে হাফ আখড়াই আরম্ভ হয়েছে। কেবল এক এক জন খাস হিঁদুর বাড়িতে কবি নেমেচে। কোন কোন বাড়ির কৰ্ত্তাগিন্নি পাত্র টেনে আপনানাই আসর রেখেচেন। এক বাবু তালে তালে নাচতে নাচতে জড়িত জিহ্বায় নিম্নলিখিত গানটি ধরেচেন :—

তাল তাড়াঠেকা।

“দিবানিশি তোরো লাগি, কোরে আমার ছু নয়ান।

পরেরি মন্তুণা শুনে পাষাণে বেঁধেছো প্রাণ ॥

আগে প্রাণ দিলে কি ভেবে,

এখন বৃষি কেড়ে লবে,

দস্তাহারী লোকে কবে,

তাতে কি বাড়িবে মান?”

বিবি তবলা বাজাচ্ছেন। বাবু নানা প্রকার সুরে “ক্যান্ লো এমন হলি প্রাণপ্রিয়সী সই?” “অনুগত আশ্রিত তোমার।” “কড়ির লোভে কাকুর কাছে যেও না ছুখিনীর বাছা।” “এ কি ভাব দেখি বিধুমুখী কথা কও বিধুবদন

৫ সহরে যাত্রা কবির সময় যে রকম সমারোহ হয়ে থাকে, তদ্বিবর প্রথম ভাগ হতোম পাঁচাল নক্শার বারোইয়ারি পূজা গৰ্ভাঙ্কে দেখু।

তুলে।” প্রভৃতি গীত গাচ্ছেন, আর ঘুরে নাচ্ছেন। ঘুরে—“বেল ফুল,—চাই বরোকে।” ফেরিওয়াল। ডাকচে। এমন সময় দক্ষিণ দিক্ থেকে পাঁচ জন মাতাল বাবু এসে “মদন আগুন জ্বল্চে দ্বিগুণ” বলেই দোর ঠেলেন। বাবু অমনি বাড়ির ভিতর থেকে কালোয়াতী আওয়াজে “কে এলি শঙ্করী এলি উমা এলি মা।” এই গীতটি ধরে দোর খুলে দিতে গেলেন। বিবি সাহেব অমনি পেছন দিক্ থেকে “আরে করুরো কি ?” বলে কাপড় ধরে টানাটানি কস্তে লাগলেন। বাবু ঘাড় বঁকিয়ে পশ্চাতে চেয়ে “কে মা শুভঙ্করি। পদ্ম থেকে উলে এলি ক্যান বাপ ?” বলে বিবিকে নিয়ে প্রতিমের উপর বসাতে চলেন। শুভঙ্করী হাত পা নেড়ে চৈচিয়ে বক্তৃতা কস্তে লাগলেন। এইরূপ আধ ঘণ্টা আমোদের পর দোর খুলে দেওয়া হলো। মাতালেরা অগুরটেকারের মত বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে, সরস্বতীরে দেখে “মা আমার বসে রয়েছে যেন লন্দোদরী দশানন।” বলেই সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করলেন। বাড়ির কর্তা “কম্ হিমার মাই জলী ফ্রেণ্ডস্” বলে শেক্খাণ্ড করলেন। বাড়িওয়ালী বোতল ও গেলাস নিয়ে “এই এসো।” বলে রিসিভ করলেন। সকলে মদ খেলেন। বাবুদের এক জন তাঁর লবঙ্গ মাসীর রান্নাঘর থেকে একটি ঝাড়ালো লাদুলবিশিষ্ট শাদা দধিঘুঘী মেনী বেরাল চুরি করে এনেছিলেন, সেইটি মা সরস্বতীর স্ত্রীপাদপদ্মে উপহার দিলেন। একটা হাসির গরুরা উঠলো। যাঁর বেরাল, তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ করে বসে রইলেন। আর এক বাবু তাস খেলতে খেলতে উঠে এসেছিলেন, তাঁর বগলে একখানা তাস ছিল, তিনি সেই তাসখানা আছড়ে ফেলে, ঘাড় হেঁট করে বল্লেন, “এই এসো। আমার এবার চিড়েতনের টেকা। ছোট বউ তুফুফ কর, মন্দোদরী পাস দে যা। আমি বিবি ধরি।” অবশেষে সকলে মিলে :—

গীত

ভাল আড়াঠেকা।

“সখী সঙ্গে রঙ্গে কে মা বিরাজে রাজকুমারী !

বীণায়জ্ঞ করে ধরা, শিরে চূড়া শুভঙ্করী।

হস্ত পদ শির বাঁকা, খেত শতদলে ঢাকা,

খেত ভস্মে অজ মাখা, তুই কি অষ্টাবক্র নারী ?”

মাতলামি পেশাটি বড় আমোদের পেশা। মাতালেরা সকল সম্বলিশেই বাওয়া আসা করে থাকেন। কাজেই ভাল ভাল কবিদের বাঁধা ভাল ভাল গীত

ও কবিতা অনেকগুলি কণ্ঠস্থ আছে। আজ সময় পেয়ে এক জন বল্লেন,
 “ভাই! আর বছর সেই—রাধাবাজারের সভাকান্ত বাহাদুরের—(ঐবিষ্ণু!!)
 সভাবাজারের রাধাকান্ত বাহাদুরের বাটীতে তিন জন ইয়ার বাবু সেই দেশরাষ্ট
 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাবাজীর ছাপাকরা—দূর হোক নাম আসে না—সেই মোহিনীবাবুর
 মেয়েমানুষটির নাম কি হ্যাঁ? (দ্বিতীয় বাবু বল্লেন, “ইন্দুমতী।”) ঐ বটে! ঐ
 বটে! ইন্দুমতী বিলাস নাটক, হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ইন্দু কি খাস নাটক পড়ছিলো,
 তাইতে যে সব তারামায়ের নাম আছে, তারি কটা ছেড়ে দিই”—

সরস্বতীকে পুনর্ব্বার হেরিয়া।

গীত।

রাগিণী সূহিনী বাহার। তাল তিওট।

“রমণীর শিরোমণি, রূপে মুনিমনো হরে।

জিহুবন-মনোলোভা, ধরাতে না শোভা ধরে ॥

শশধর ধরে শশ, কি তার রূপের যশ,

পরিপূর্ণ সুধারস, চাক্রমুখ সুধাকরে ॥১

অধরে মধুর হাসি, ক্ষরে সুধা রাশি রাশি,

চেতন হরিল আসি, কুটিল কটাক্ষরে ॥২

এ যে অতি রূপবতী, গতি জিনি গজপতি,

রতি ছেড়ে রতিপতি, রতি লোভে পায়ে ধরে ॥৩

কেশ-দ্বেষে জলধর, হইয়ে গগনচর,

বরযায় নিরন্তর, ডেকে ডেকে কেঁদে মরে ॥৪

আর দেখো বিষধরী, কেশ দ্বেষ-বিষ ধরি,

মাঝে মাঝে ফণা ধরি, রাগে ফোঁষ ফোঁষ করে ॥৫

হেরি কর পদ্মরাজে, নলিনী মলিনী লাজে,

কলঙ্ক-কণ্টক সাজে, প্রবেশিল সরোবরে ॥৬

খঞ্জন-গঞ্জন কর, রঞ্জন নয়ন বর,

অঞ্জন কি মনোহর, মানস রঞ্জন করে ॥৭

কটি মানে মানী মানী*, নহে আর অভিমানী,

এ কটিরে ক্ষীণ মানি, অপমানে বনে চরে ॥৮

বদন রতন রাজে, উপমা না তাহে সাজে,
কনক মুকুর সাজে, মুকুতা কি শোভা করে ? ৯
সুসজ্জিত বাসের বাসা, মরি কি সুন্দর নাসা,
নিখাসে চপলা হাসা, শীতল সমীর সরে ॥ ১০
অধর ললিত রাগে, বিষফল কোথা লাগে ?
রাগ দেখে, রাগে রাগে, রেগে শেষে গোলে মরে ॥ ১১
কুচ কলিকার কাছে, কদম্ব কোথায় আছে,
নিহরি শিহরি পাছে, আপনি আপনি ঝরে ॥ ১২
ললিত লাবণ্য কায়, চোলে যেতে গোলে যায়,
বিধি বুঝি এ কায়ায়, গোড়েছে নবনী শরে ॥” ১৩

নৃত্য ।

(ধেই, ধেই, ধেই, তাধেই, তাধেই,
ধিস্তাক্তা, তিস্তাক্তা, ধিস্তাক্তা, তিস্তাক্তা ।)

গীত ।

শ্রামাবিষয় ।

রাগিনী বেহাগ । তাল একতাল ।
“কে রে, বামা, বারিদবরগী, তরুণী ভালে ধরেছে তরগি,
কাহারো ঘরগী, আসিয়ে ধরগী,
করিছে দমুজ জয় ॥ ১’
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অমুপরূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ,
চরণ শরণ লয় ॥ ২
বামা, হাসিছে, ভাবিছে, লাজ না বাসিছে,
হৃদকার রবে, সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে, বিপদ নাশিছে,
আসিছে বারণ হয় ॥ ৩

বামা, টলিছে, ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
 সন্ধানে বলিছে, গগনে চলিছে,
 কোপেতে জ্বলিছে, দগ্নজ দলিছে,
 ছলিছে ভুবন ময় ॥ ৪
 কে রে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,
 করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
 হোয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা,
 আসবে মগনা রয় ॥ ৫

নৃত্য ।

তিনাক্ ধাঁদা, তিনাক্ ধাঁদা, ধাঁ ধাঁ ধাঁ
 তিতুড় তিতুড় । ধাঁ ধাঁ ধাঁ-তিতুড়্ তিতুড়্ ।)

গীত ।

শ্রামাবিষয় ।

রাগিণী বেহাগ । তাল একতাল ।

“কে রে, বামা, ঘোড়লী রূপসী, সুবেলী, এ, যে, নহে মাগুঘী,
 ভালে শিশু শলী, করে শোভে অসি,
 রূপ মসী চাক্ ভাস ॥ ১

দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প, মারিছে লক্ষ, হতেছে কম্প,
 গেলো রে পৃথ্বী, করে কি কীৰ্ত্তি,
 চরণে কৃন্তিবাস ।

বামার, চরণে কৃন্তিবাস ॥ ২

কে রে, করালকামিনী, মরালগামিনী, কাহারো স্বামিনী ভুবনভামিনী,
 রূপেতে প্রভাত করেছে যামিনী,
 দামিনী-জড়িত হাস ।
 বামার, দামিনী-জড়িত হাস ॥ ৩

কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির সঙ্গে, ঝগড়সঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটীলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে,
করিছে তিমির নাশ ।

বামা, করিছে তিমির নাশ ॥ ৪

আহা ! যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্ব, হইল খর্ব, গেলো রে সর্ব,
চরণ সরোজে, পড়িয়ে শর্ব,
করিছে সর্বনাশ ।

বামা, করিছে নর্বনাশ ॥ ৫

দেখি, নিকট মরণ, করো রে স্মরণ, মরণ হরণ, অভয়চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদ বরণ,
মানসে করো প্রকাশ ।

আমার, মানসে করো প্রকাশ ॥” ৬

গীত ।

নাচের তালে হাফ জং ।

“হুর্গাবাড়ি, হুর্গাপূজা, বড় দেখি জাঁক রে ।
মঙ্গলেতে মঙ্গলার, যাত্রী ঝাঁকে ঝাঁক রে ॥
দামা বাজে, কাড়া বাজে, বাজে ঢোল ঢাক রে ।
তুরী বাজে, ভেরী বাজে, বাজে ঘণ্টা শাঁক রে ॥
রেখেছে ছাগল কেটে, রক্ত গায়ে মাখ্ রে ।

বাবা, রক্ত গায়ে মাখ্ রে ॥

কালী কালী কালী কালী, কালী বোলে ডাক্ রে ।
ডাক্ রে, ডাক্ রে, ডাক্ রে, শ্রামা মারে ডাক্ রে
হুর্গাবাড়ি, হুর্গাপূজা বড় দেখি জাঁক রে ॥

এখনো রয়েছে কেন, হোয়ে তীর্থকাক রে ।

যত পারো, তত খাও, মধুভরা চাক্ রে ॥

মুখে দিলে, বুজি বাড়ে, শুদ্ধিটুকু চাক্ রে ॥

কেন বাছা, থাকো কাঁচা, ভালো কোরে পাক্ রে ।

নিজে তুমি সিদ্ধ হবে, সিদ্ধ হবে বাক্ রে ।

বাবা, সিদ্ধ হবে বাক্ রে ॥

কালী কালী কালী কালী, কালী বোলে ডাক্ রে

ডাক্ রে, ডাক্ রে, ডাক্ রে, শ্রামা-মারে ডাক্ রে

দুর্গাবাড়ি, দুর্গাপুজা, বড় দেখি জাঁক রে ॥”

— — —

গীত ।

জড়িত জিহ্বায় ।

নাচিতে নাচিতে ।

“ও মা, দিগন্তরি—! নাচো গো ! শ্রামা, রণ মাঝে

পতির বুকেতে পদ, যোগিনী যোগায় মদ,

মা গো মা ! দেখে মরি লাজে ॥

ও মা দিগন্তরি !—

(কোন্ হায় তোম্ ! বাবা, কোন্ হায় তোম্ !

ভাঁড়ে মা ভবানী, ভোলা বোম্ বোম্ বোম্ ।

বাবা বোম্ বোম্ বোম্)

— — —

ভজন ।

“কোহি জাংকো না মানো বাবা,

না মানো দেবী দেবা ।

একি মন্সে, কালী মাষ্টকো, পাঁওমে করো সেবা ॥

বাবা, পাঁওমে করো সেবা ॥

যব্ হি যেলা, আয়ে মন্মে, তেস্বে করো ভোগ ।

ছোড় দেও সব, খুঁওকো বাৎ, তুকা যাগ যোগ ॥

বাবা, তুকা যাগ যোগ ॥

আব্ কি নারী, পব্ কি নারী, যেস্তি মেলে সঙ্গ ।

নেহি ছোড় দেও, ক্যা খুসি ছায়, কাম দেও কিঙ্গর ॥

বাবা. কাম দেও কি রঙ্গ ॥

এস্মে পাপ, ওস্মে পুণ্য, এছো খুঁজ কি বাৎ ।

মরণ্ সে যব মুক্ত হয় তব্,

পাপ্ যাগা কোন্ সাৎ ॥

বাবা, পাপ যাগা কোন্ সাৎ ॥

দিন্ দিন্ দিন, পাওমে ঢালো, সবহ গজাজল ।

তবু তেরে কি শোধন হোয়েগা, জঠরভরা সব মল্ ॥

বাবা, জঠর ভরা সব্ মল ॥

কামবাজারেসে, লুট্ করো সব, কাঁহে রহতো ভাকা !

এহি লোগ্ মে, ভোগ করো সব, কাঁহা পরলোগ্ ফাকা !

বাবা, কাঁহা পরলোগ ফাকা ॥

কালী চামারা প্রাণপেয়ারা, কালী হামারা জান্ ।

কালীকো পাওমে, প্রণৎ করো সব, আউর না জানো আন ।

বাবা, আউর না জানো আন্ ॥

গীত ।

তাল জলদ কাওয়ালি ।

“নেশাতে ঢুলু ঢুলু করিছে নয়ন ।

কোথা রহিল আমার সে বিধুবদন ॥

না বুঝে করেছি নেশা, ত্যজিয়ে প্রেয়সীর আশা,

এখন আমার এ ছুর্দশা দেখে কোন জন ॥

আগেতে কি জানি মনে, এতো হবে সুরাপানে,

এখন আমি মরি প্রাণে, বিহনে সে জন ॥”

এই জমার্ট্ আমোদের পর এক জন একটি কামিনী মণিকে ধরে “বাওয়া ! তুঁ একটি গাওনা বা ।” বলে অমুরোধ করলেন । বাওয়া তখন খোলা প্রাণে বৃন্দ হয়েছিলেন, অমুরোধ পড়বা মাত্র তৎক্ষণাৎ “কেমন মাসীর বোন্‌পো তুমি দেও দেখি আঁজ গঁথে মালা ।” গাইতে গাইতে কুমুর আরম্ভ করে দিলেন ।

এঁরা বেক্লপ রমণীমণি, কোন স্থানই অগম্য নেই, সুতরাং তিনিও ঈশ্বরচন্দ্র কণ্ঠের তৈরি করা এই গানটি গাইলেন :—

রাগিনী বাহার । তাল খেমটা ।

“দিন ছপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত পোয়ানো ভার ।

হোলো পুন্নিমেতে অমাবস্তে, তেরো পহর অন্ধকার ॥

এসে বিন্দাবনে বোলে গেল, বামী বষ্টমী,

একাদশীর দিনে হবে, জন্ম অষ্টমী,

আর ভাদ্র মাসের সাতুই পোবে

চড়ক পূজার দিন এবার ॥১

সেই ময়রা মাগী মরে গেল, বৃকে মেরে শূল,

বামুনগুলো ওষুধ নিয়ে মাথায় বোটে চুল,

কাল বিষ্টি জলে ছিটি ভেসে,

পুড়ে হলো ছারেখার ॥২

ঐ সূর্য্যামা পূব্ব দিকে অস্তে চলে যায়,

উত্তর দখিন কোণ থেকে আজ, বাতাস লাগচে গায়,

সেই রাজার বাড়ির টাট্টু ঘোড়া,

শিং উঠেছে, ছুটো তার ॥৩

ঐ কলু রামী, ধোপা শ্যামী, নাচতেছে কেমন,

এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে কজন,

কাল্ কামরূপেতে কাগ মরেছে,

কাশীধামে হাহাকার ॥৪

পাঁচটি বাবুর পঞ্চ মুখ থেকে এককালে “কেয়াবাৎ, জীতা রও, বলিহারী বাবা ।” প্রভৃতি শোভাস্তরী উপহার পড়তে লাগলো । এক জন এক পাশ থেকে আড়নয়নে চেয়ে করতালি দিলেন ।

চার দিকে এইরূপ আমোদ চলচে, ওদিকে নগর আলোময়, এ সময় কি লখের প্রাণের উড়ুক্ষু বিহঙ্গমদিগকে গৃহপিঞ্জরে রুদ্ধ করে রাখবার সময় ? চিংপুর রোডের মহাপ্রসাদ দত্তের স্ট্রীটের এক জন বাবু আপনার গবাক্ষ দিয়ে নগরের শোভা দেখে আর স্থির থাকতে পারেন না । বিশেষতঃ তিনি এই কতক্ষণ দশ জন গ্লাস-ক্রেণ্ড নিয়ে মন খুলে আমোদ করেছেন । দেখতে দেখতে হড়মুড় করে সিঁড়ির কপাট খুলে ফেলেন । তাঁর বৃদ্ধ পিতা শব্দ পেয়ে দরোজা খুলে তাঁরে ধমকেন । বাবু পিতার গলা ধরে বলেন, “কে ও মাইডিয়ান বাবা । আজ তোমাদের ছাড়া হবে

না ভাই। আজ তোমারে আমার মাথাঘষার নূতন বাড়িতে আমোদ কর্তে যেতে হবে। তুই বুঝ্‌লি!” বুদ্ধ এই কথা শুনে দুঃখে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর হাত ছাড়িয়ে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করলেন। অন্তঃকরণ দুঃসহ পরিতাপে দহন হতে লাগলো। বায়ু আড়ষ্ট হয়ে “শালার বাবা পালালে?” বলে টলতে টলতে নেমে গেলেন। হা হতভাগ্য কল্‌কেতা! লবণ একচেটে না হলে এই সকল অখণ্ড ছেলে আজো বেঁচে আছে জাখো?

আমোদের রাত্রি দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়, এই নিমিত্তই যেন, বিভাবরী সাঁ করে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। ক্রিয়াবাড়ির লোকেরা পরদিন সকালে যেন ঝড়-নাড়া বাঁশের মত দেখাচ্ছেন। আমোদের খোঁয়ারিতে চক্ষু মহাদেবের মত টুলু টুলু কচে। তার পর বৈকালে পুলিশের পাসের নিয়ম মতে মাকে বিসর্জন করে নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁরাও বাঁচলেন, সরস্বতীরও এক বৎসরের মত হাড় জুড়ুলো।*

সরস্বতী পূজা সমাপ্ত।

* এই পরিচ্ছেদে যে সকল শ্রেণীর লোকের নাম করা গ্যাচে, তাঁদের সকলকে হৃদয়ঙ্গবিত বলা লেখকের উদ্দেশ্য নয়।

পল্লীগ্রাম তীর্থ

মহারাজাদের চোখে চোখে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে পাপের আকর হয়ে থাকে। পল্লীগ্রামের ছেমোচাপা মেয়েগুলো পিতৃ ও স্বশুরকুলে কলঙ্কপঙ্ক ও লজ্জা সম্বন্ধে জলাঞ্জলি দিয়ে ছু পা বেরিয়ে দাঁড়ালেই চিত্রগুপ্তের রেজিষ্টারি খাতায় তাহাদের নাম উঠে যায়। রাম শ্রাম বাবা ঠাকুরেরা সেই সকল শুভ পুণ্যাহের (ফী) প্রসাদ পান। নামদাগা আফিসরেরা গ্রামের প্রকাশ্য সায়ের ও গজ প্রভৃতি স্থানে এসে আপিস খোলেন। ক্রমে উহাতে কৃত্রিম “কোর্ট অব ওয়ার্ডসের” কাজও হতে থাকে। পূর্বে অনেক পল্লীগ্রামের লোকেরা বারাজনা নাম শুনেছিল, উহা কাহাকে বলে জানতো না। প্রবাদ আছে, ১২৪২ সালের শ্রাবণ মাসে এক পল্লীগ্রামে বেশার আবশ্যক হওয়াতে ঐ গ্রামের এক মিশ্র ব্রাহ্মণ তাহাদের বাসগ্রামের এক ক্রোশ উত্তরে এক বাজারে বেষ্ঠা আনতে যায়। সেখানেও প্রকাশ্য “উহা” ছিল না। কেবল কয়েক জন ধীবরকণ্ঠা দিবসে মৎস্য বিক্রয় কর্তো, আর রজনীতে অচিরানন্ত নূতন ব্রতের অভ্যাস রাখতো। মিশ্র ঐ দলের ২১টিকে নিজগ্রামে এনে প্রতিষ্ঠা কল্পে, তদবধি ঐ সকল কুলবতীর কুল বৃদ্ধি হয়ে আদিশূর রাজার ব্রাহ্মণ পরিবারের মত পঞ্চ গোত্র ছাশ্মান্ন গাঁই ছড়িয়ে পড়েছে।

অনেক গাঁয়েই এইরূপে জঙ্গল পত্তন হয়েছে, কিন্তু আজো সকল গ্রামে উহার জন্ম হয় নাই। অনেক স্থানে ছুটি একটি গুপ্তবৃন্দাবন নয়নগোচর হয়ে থাকে। করুণাসিন্ধু শাস্ত্রিকক্ষদের এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুগ্রহ আছে, সেই অনুগ্রহ দৃষ্টির প্রসাদে অনেক বে-রেজিষ্টারী দলিলও পাস হয়ে যাচ্ছে।

পল্লীগ্রামের পতিতোদ্ধারিণীদের বীজ্ঞে ও কলমে যে সকল তরু উৎপন্ন হচ্ছে, তার চটক দেখে কে? তাহাদের মাথায় বেঙের ছাতার মত চাকা চাকা গিলটির ফুল খোঁপায় গৌজা, ঝাঁচলে রিঙে করা ১ ডজন চাবি বুলোনো, কপালে বিষ্ণুর হাতের চক্রের মত গোল গোল ফুলখড়ির কোঁটা, তার উপর এক এক কুইতন খয়েরের টিপ, দাঁতে রসাজন, চোখে কাজল, ঠোঁটে আকর্ণ পুঁইমিটুলি, গলায় চম্ভহার, নখে মেদিপাতা, পায়ে আজানু আলতা ও নাকে কাঁঠখড়ির তিলক! ইহার কসাঁ কাপড় পরে আছুড় গায়ে রাস্তায় বেরুলে বোধ হয় যেন, কতকগুলি রূপোবাধা ছঁকো দাঁড় করান রয়েছে। এই সকল দেবীই কতকগুলি সৌখীন পাড়োয়ান, দরজী, মিঠাইকর, গুরুমশাই, জমিদারের বাড়ির রসুইব্রাহ্মণ, দরওয়ান, নায়েব, গোমস্তা, পেস্কার, বোলুদে, কিস্তিওয়াল, ময়রা, গোয়াল, কাছারির আমলা,

মোক্তার, পেয়াদা, থানার মুন্সী, জমাদার বরকন্দাজ, (কোন কোন স্থলে বড়কর্তা) গন্ধবেণে, তাহাদের মুহুরী, কলু ও অকর্ষণ্য হজুরদের কলুঘনিজারিণী! ঐ সকল বধুভবন আশ্চর্য্য প্রকারে শোভিত ও নানা রাগে রঞ্জিত। এক একখানি রান-কুটীর, তাহার মধ্যে পাতিক্ষেত্র, শ্মশানের ফেরত বালিস ও রামকছা! কপিথ বর্ণের মশারি, তাতে আ-লোহিত বর্ণের ছোট বড় ছারপোকাকর ঝালর! এক একখানি গৃহে তালি দেওয়া গনিক্রথের চন্দ্রাতপ! সহরের বারান্দা ভবনে যেমন এক এক জন দাদাঠাকুর, মাসী, মেড়ুয়াবাদী দরওয়ান ও “মা” থাকে, ইহাদের তাহা নাই। যাহাদের কিঞ্চিৎ অর্থবল আছে, তাহারা এক এক জন “মা” রাখে। তাহারাই দাদাঠাকুরী ও দরওয়ানী করে, আর মাঝে মাঝে তামাক সাজে। তামাক এক পয়সায় বারো মণ।

এই সকল স্থানে যে সকল ভদ্র গণেশ আগমন করেন, তাহাদের বাঁকা লোজা মিঁথি করা চুল ফিরোনো, পটোলডাঙ্গার পম্প ও গরাধহাটার বার্গিস করা বাছুর পায়, পাকানো উড়ুনি কাঁধে ও ফুরফুরে তুলো করা আতর কানে। অবশিষ্টদের খালি পা ও গামছা কাঁধে। এই উভয় দলের অনেকেই মুদীর দোকানের ও স্থানবিশেষের খুঁটির গোড়ায় চৌকি পেতে ডাবা হুকোর মুখে আবপাতার নল দিয়ে দোস্তা খান, সংস্কৃত টোলের স্মৃতি পড়া আধবুড়ো হোঁড়াদের মত হুলে হুলে “শ্রীরামো বলেনো শুনো মৈত্রো বিভীষণ।” বুঝলে তো! “রাম বলেন মিতে বিভীষণ! শোনো।” এইরূপে রামায়ণ পাঠ ও ইন্টারপ্রিট করেন। মাঝে মাঝে কাঁদেন ও কাশেন।

অনেক বদমায়েশ, গাঁজা গুলি শুঁড়ি ও তাড়ির আড্ডা থেকে বেরিয়ে এসে পবিত্র আড্ডায় ভর্সি হচ্ছে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দে গাড়ি হাঁকিয়ে “কাপড় আকারা ভারি, কি করি!” গীত গেয়ে যাচ্ছিল, রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে, তীর্থমন্দিরে ঢুকে বাবুদের সেলাম দিলে। বাবুরা “আইয়ে ভাই সাব” বলে হাত বাড়িয়ে রিসিভ্ কল্লেন। ধান ও শর্ষে বওয়া বোল্দেরা বাইরের গাছতলায় গরু বেঁধে “বাবুর বাগানে জোড়া মোমাছি, ওদের বাড়ির—” গীত গেয়ে তীর্থে ঢুকলো, বাবুরা সরে সরে পাশ দিলেন! হতভাগ্য দেশের শাস্তিরক্ষক (!) জমাদার ও বালাগন্তিরা ১০টার পর একবার পাগড়ি বেঁধে বেরিয়ে “রোঁদে চৌকিদার” বলে টেঁচিয়ে উঠে তীর্থস্থানে রোঁদ জমালেন! এই সকল স্থানে ধেনো মদের আত্মশ্রদ্ধ, খেঁউড় গীতের কুরুক্ষেত্র ও গালাগালির পুষ্পবৃষ্টি! খাতায় খাতায় সাকুরেদী কবির দোয়ারেরা খেলো হুকোর তামাক খেয়ে, উরুদেশ চাপড়ে,

সখীসখীদের সুর ভাঁজে। ক্ষুদে ক্ষুদে ছুঁড়ীরা লকা পায়রার মত মাথা ঘুরিয়ে হাততালি দেয়। দেবীরা ভদ্রলোক দেখলে “আষ্টি এস্বে হোক,” আকাশ ডাকলে “শালার আগাশ আবার আষ্টিচে” বলে মিষ্টালাপ করে। এক একখানি ঘরে ভাঙা এসরাজ বাজে, আর তবলা তানপুরায় নাকী সুরে “ফাঁসি কে দিলে” গান চলে। ইহারিও সরস্বতী পূজা ও অশ্ব অশ্ব পাড়ারগৈয়ে পরব সরবে বেতরো আমোদে মস্ত হয়।

পাড়ারগৈয়েরা সুখে আছে বলে সহরেরা আক্ষেপ করেন। তাঁদের আক্ষেপের কারণ কেবল তিনটি রেলওয়ে। কিন্তু আজো তাঁদের যে গুমর আছে, ঢাকা পর্য্যন্ত রেলওয়ে হলে আর সে পসারও থাকবে না, ঢাকাই বাবু’ ও ঢাকাই ধুতিই বহুদূর প্রসিদ্ধ।

কতকগুলি পল্লীগাম অতি চমৎকার স্থান। সেখানে না আছে ধর্ম্মের গৌরব, না আছে বিচার আদর, না আছে একতার সম্বন্ধ, না আছে সমাজশৃঙ্খলা। অনেক স্থলে কেবল অভূতপূর্ব্ব দ্বেষাদ্বেষ, অসামান্য পরিশ্রীকাতরতা, অদ্ভুত দলাদলি এবং জুয়াচুরি বাবুগিরিরই একচেটে প্রাধান্য। আমরা কেবল দু এক জন বিদ্যানুরাগী ধর্ম্মভীরু জমিদার ও কয়েক জন ভদ্রলোককে এই সকল ধর্ম্মনীতির হস্তমুক্ত দেখতে পাই। হজুরেরা যদি বাদসাই গদি ও মকদ্দমা মামলার একান্ত দাসানুদাস না হবেন “পাড়ারগৈয়ে ভূত” শব্দটি আমাদের শ্রবণ জর্জরিত কর্তে সমর্থ হইবে কেন? ইহাদের অনেকেই অলসের বাদসাহ, চতুরের চূড়ামণি, শঠের শিরোমণি ও মকদ্দমার ধড়িবাজ। সভ্যতা দূরপরিহার, ধর্ম্ম ভয়াভিভূত এবং কর্তব্যতা ভূগর্ভশায়ী। পল্লীগামের অধিকাংশ লোক দলাদলি ও ফোজদারী মকদ্দমার চুষকপাথর। মধ্যে যখন সহরে বিধবাবিবাহ, ওয়েল্‌সী হাঙ্গামা ও জ্যেষ্ঠাধিকারের যুদ্ধ হয়, এই দল থেকে অনেক আঘাতে গল্প বাহির হয়েছিল। ইহারি পাশাকীড়া, ধূমপান, পাঁজি ও ষ্টাম্প আইনের একমাত্র আশ্রয়! যাতে লোকের উপর কর্তৃত্ব কর্তে পারেন, যাতে সকলে পায়ের নীচে থাকে, অনেক বড়মানুষের এইটি একান্ত ইচ্ছা। ইহারি বাহিরে ধর্ম্মভান ভানেন, ভিতরে ভিতরে রাইচাঁদকেও পরাস্ত করেন।

দু এক জন বড়মানুষের গল্প বল্লই অনেকে বুঝতে পারবেন, পল্লীগাম কেমন

১ ঢাকাতে চিত্তশুদ্ধি নাই, এ বাক্যের সে অর্থ নয়। ইতিপূর্বে এই পরিচ্ছেদে দরজী, পাড়ারান, মুন্সী ও হজুর প্রভৃতির যে নাম দেওয়া গ্যাচে, তাঁদের পদের সকলেই কিছু ঐ যোক্ষপদ লাভের অভিলাষী অথবা অধিকারী নন।

জিনিষ। মূলোজোড়ের এক জন ক্ষমতাবান বড়মানুষ তাঁহার এক উমেদারের অর্জাজ উপহার নিয়ে তাহাকে চাকরি দিয়েছিলেন, দর্পণেও এরূপ পলিসির অভাব নাই। আমরা এক বছর রাত্রিতে এক বাবুর কার্তিক পূজোতে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্তে গিয়েছিলাম, বাবুর মজলিশটি ভাল কেতায় সাজানো। দেয়ালে দেয়ালে ডবল ব্রাঞ্চ আঁটা শিকে ঝাড় ঝুলানো। মজলিশে ছোট বড় ১৫টি রূপোবীধা হুকো ও দুটি সটকা আলবোলা। কিন্তু কক্ষে একটি। সে নূতন বিয়ে করা কনের বৌভাতের মত একে একে সতের জনের মান রক্ষা কক্ষে! বাবু আত্মডুগায়ে আড়াই হাত উচু গদির মাঝখানে নীলগিরির জায় পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। পেটটি পাটনাই মশককেও লজ্জা দিচ্ছে। কিন্তু তিনি মুখী। গজস্কন্ধ, গৃধিনীকর্ণ, আভুস চক্ষু এবং নাভিদীর্ঘ। বর্ণ পাটকিলে। চুল ছোট। পরা সফ ফিন্ফিনে শাদা লালপেড়ে খুতি। বাবু নিজে তামাক খান না। চুরোট খান। কিন্তু আড়ম্বরগুলি সব আছে। শুয়ে আছেন ত আছেনই। হিঁদুয়ানি মাথায় তুলে, ব্রাহ্মণকে গাছতলায় বসিয়েচেন। গর্দভ ও অশ্বিনীবাংশীয় মোসাহেবেরা ব্রাহ্মণের মাথায় পা দিয়া শয়ন করেচেন। খোদ সাহাজাদা নবাব এলেও খাতির নদারং। মাঝে মাঝে সাহেব খাওয়ানো আছে, নিজেও কশাইটোলা ও অকল্যাণ্ডের অম্বদাস। হজুর যখন কাপড় ছেড়ে পাঁচালি দেখতে বসলেন, তখন বোধ হলো একটি ইজিপ্শিয়ান ভল্লুক বন থেকে নূতন ধরে এনে নাচতে শিখানো হচ্ছে। বিভ্রার মধ্যে বর্ণপরিচয় বাকি। ইহার পল্লীগাঁওয়ের বড়লোক। ১০ গণ্ডা মোসাহেব!

এদিকে ঝিঁঝিপোকার ঝিঁঝিট রাগিণীর সহিত রজনী প্রভাত হলেন। আমরাও স্বস্থানে প্রস্থান কল্পেম।

উপসংহার

ব্যভিচার সকল পাপের জননী। ব্যভিচার এদেশের উন্নতির পথ ক্লান্ত করে রয়েছে। ব্যভিচার অসংখ্য লোকের জীবন বিনাশ করেছে। ব্যভিচার এদেশকে অগ্নহত্যার স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। ব্যভিচার এদেশের দাম্পত্য সুখের মূলচ্ছেদ করেছে। ব্যভিচার অসংখ্য ধনাঢ্য পরিবারকে ছারেখারে দিয়েছে। মাদকেরা এই ব্যভিচারের ছায়ার স্রায় অনুবর্তিনী। রাজা কোথায় এই সকলের নিবারণ করে শাস্তি রক্ষা করবেন, এই ত রাজনীতি, আমরা জানি ; কিন্তু ইংরেজেরা চক্ষু বুজে হাত গুটিয়ে এই কলঙ্কডালি মাথায় নিচেন। ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনে ব্যভিচার নিবারণের স্পষ্ট ধারা নাই। মদগাঁজাতে বিলক্ষণ উৎসাহ দিচেন। আবকারি ইহাদের অপরিহার্য ব্যবসায় হয়েছে। অধিক কি, যে জঘন্য প্রথার নিমিত্ত সভ্যতম আমেরিকা সকলের নিন্দাম্পদ হয়েছে, যে মনুষ্য বিক্রয় লয়ে পরিণামদর্শী আমেরিকান সভাপতি—মহাত্মা লিঙ্কলন আমেরিকাতে তুমুল সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত করে দেহত্যাগ করেচেন, উষ্ণতর ব্রিটিশ শোণিতের চোখের উপর কুলটাপল্লীতে অবাধে সেই (বালিকা বিক্রয়) পাপের স্রোত গোপনে উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে। সাহেবদের তীব্রতর যুক্তির মুখে ব্যভিচার পাপ বলে বোধ হয় কি না সন্দেহ। ইউরোপ খণ্ডে ইহার ভয়ঙ্কর প্রাচুর্য্যব দেখে সেই সন্দেহই বৃদ্ধি হয়ে উঠছে। ইতিহাস আমাদেরকে বলে দিচ্ছে, ইংলণ্ডের রাজধানী সমৃদ্ধিশালী লণ্ডন ও ফ্রান্সের রাজধানী স্বর্গতুল্য প্যারিস এ বিষয়ে পরম সৌভাগ্যবতী! ঐ দুটি রাজ্য সভ্য রাজ্যের অধিকৃত ও সভ্যতম এদেশের শিরোভূষণ। উভয় স্থানেই বিজ্ঞানশাস্ত্রের জয়পতাকা উড্ডীন হচ্ছে! উভয় নগরেই কিন্তু ব্যভিচারের সমান আধিপত্য। কিছু দিন পূর্বে লণ্ডনে ৮০,০০০ আশী হাজার ও প্যারিসে ৯০,০০০ নব্বুই হাজার বেস্তার বসতি ছিল, এক্ষণে আভাস পাওয়া যাচ্ছে, সম্প্রতি দুই নগরে দুই লক্ষ বেস্তা সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে!

বর্তমান ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এখনকার সমুদায় নরপতি অপেক্ষা স্বার্থশূন্য ও নীতিজ্ঞ বলে প্রসিদ্ধ, তাঁহার রাজ্যে এত পাপের শ্রীবৃদ্ধি, অভিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়! লণ্ডনের কথা না ধরলেও চলে। সেখানে প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের বাস এবং ৮০ হাজার বেস্তা! এ হিসাবে কল্কেতাকে বেস্তাশূন্য নগর মনে করা বিচিত্র নয়। কল্কেতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানে প্রায় ১২ লক্ষ লোকের

অব লণ্ডন ও “ইতিলুস অব আউয়ার কন্টী” নামক ইংরাজি পুস্তক দেখ।

বসতি। ত্রৈমাসিক করে দেখলে লগুনের অধিবাসীরা কল্কেতাকে হারিয়ে দিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দিন দিন জীবিকার পড়তা দেখে কোন্ ব্যক্তি আর কল্কেতার গর্ব কর্তে পারেন ?

আজকাল ব্যভিচারের এমনি প্রাদুর্ভাব হয়ে উঠেছে যে, সুভদ্রা পুরুষেরা সুভদ্রা প্রকৃতির ভয়ে পলায়ন করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি রণরঙ্গিনী তরুণী সেখানকার বাঙ্গালি বাবুদের বাসায় অভিসার করে “বাবু সাহেব! বন্দীগী!” বলে প্রণয় যাত্রা করে থাকেন! গবর্ণমেন্ট যদি বাঙ্গালিদের মঙ্গল চান, তবে কল্কেতাতে অন্ততঃ বর্ষার ছায় স্বতন্ত্র বেশ্যাপল্লী নির্দিষ্ট করে দিন। বেশ্যারা নিজেই “কল্কেতা রিভিউ” পাঠ করে স্বতন্ত্র বাসের প্রার্থনা করচে। গবর্ণমেন্টেও বেশ্যাহস্ত নিঃসৃত দরখাস্ত পড়চে। এখানকার বেশ্যানিবাস অত্যন্ত জঘন্য ও অনিষ্টকর। গৃহস্থের বাটীর পার্শ্বে, সদর রাস্তার উপর, যেখানে ইচ্ছা, বেশ্যারা বাস কচে! অধিক কি, জোড়াসাঁকোর মূল ব্রাহ্মসমাজটি বেশ্যাপল্লীর মধ্যখানে। ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষীয়দিগের এ বিষয়ে একটি উত্তম উপায় বিধান করা কর্তব্য। মনে করুন, এটিও তাঁহাদের দেশভিত্তিক ব্রতের একটি প্রধান অঙ্গ।

বাহ্যামোদপ্রিয় মানবগণ! তোমরা মধ্যে মধ্যে যে সকল র‍্যাস্কেল কমিটি প্রিজাইড করো, তাতে কি তোমাদের ভলন্টিয়ার হয়ে হিন্দু কমিউনিটীর মাথায় উঠতে ইচ্ছে হয় না? তোমাদের কেহ কি কুকের প্রোগ্রাম করে, প্রোক্ল্যামেশন দিয়ে, বেশ্যা পুষে, মেয়ের বাপ হয়ে, নীলেমে জুতো বেচে বাইরণের মতন ফেমস্ হয় নাই? অবশ্যই হয়েছে। তবে আর কেন? গা তোলো রে নিশা অবসান—!

হে যুবকগণ! উঠো উঠো এক বার।

কত নিদ্রা যাবে? সে কি, জাগিবে না আর?

ব্যভিচার স্রোত উর্ষি সলিলেতে নেয়ে,

ভেসে যান জগদুন্মি, দেখিবে না চেয়ে?

পল্লীগ্রামস্থ বানুদের দুর্গোৎসব

[১৮৬৮ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত]

গীত

বাউলের সুর।

কি মজার বাউলা দেশ।

ছেলে বুড়ায় মদে রাঁড়ে, মুরগী মারে এক শেষ ॥

দেখ আশে পাশে লোকে হাসে, কিবা সিঁতি কাটা কেশ ;

হলো চাষার ঘরে ধর্মপুত্র, বড়মানুষের ধর্ম্যে ঘেঁষ।

যারা হিঁছুর টোপর ধরে, তারা লোক-সমাজে ডরে,

কিন্তু, লুকিয়ে লুকিয়ে মদ মারে, রেতে ঐ নটবর বেশ।

খাবার সময় ব্রাহ্মধর্ম, সদা তাই করে অধর্ম,

না বোঝে ধর্মের মর্ম, ঔ ঔ কেবল মুখেই শেষ ॥

১২৫০ শাল ২৫শে আশ্বিন সোমবার। আজ ষষ্ঠী। গ্রামের চার দিকেই বাজনা বাদি হচ্ছে, বাজন্দররা ঢোল পিঠে করে বাড়ি২ ঘুরচে, ঢাকীরা হেঁড়া ঢাকে তালি দিয়ে বাজাতে২ ছুটছে। সজ্‌নাখাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সেই অন্তর্ধান করেছিল ; কেউ বা “ধামা সারাবে গো” বলে বেতের আঁট কাঁধে করে ভোমর নিয়ে পাড়ায়২ দেখা দিয়েছিল, কেউ বা ঢাক ফেলে জুতো গড়তে আরম্ভ করেছিল। ছ-মাসের পর আজ তাদের আনন্দের দিন ! পূজোবাড়িই বাজাবে, আর তিন দিন ভরপুর লুচিমণ্ডা খাবে। পাড়ারগোঁয়ে পূজায় তিন দিন লুচিমণ্ডার বড় দেখা শুনো নাই, বামনবাড়ি হলে কেবল ভাতের কেন্দন হয়, চাষাভূষারা তাই খেয়ে থাকে ; তবে সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় এক সের ময়দাব লুচি ভেজে ছুর্গাকে দেখান হয়, শেষে বাড়ির ছেলেপিলেরা তাই খায়। তেতো-গুড়ের নারিকেল লাড়ু, আর আধরাঙা মুড়কি, এ তো অপর সাধারণের জন্ত বরাদ্দই আছে। কায়স্থ বা অস্ত্রাশ্র জাতির বাড়ি ছপুরবেলা ছ পাঁচ জন বামন খায়, তা চার হাত পা উচ্চিই না করলে সে ‘লুচি’ হেঁড়া যায় না, ও জল না খেলে গলা দে ‘সন্দেশ’ ওলে না। ভিলি মালী গন্ধবোণের বাড়ি তাও ঘটে না। পল্লীগ্রামের পূজোর এই তো জী, তাতে যে ঢাকী ঢুলীরা লুচিমণ্ডা খেতে পাবে, সে মিছে কথা ; তবে তাদের মনের আশা, আর হাজার হোক পূজোবাড়ি। লোকের বাড়ির দরজায় ছই২ কলার গাছ আর পূর্ণঘট, তার উপর আমের পল্লব ও এক একটি নারিকেল দেওয়া হয়েছে। পাড়ার হেঁড়ারা সব মরিয়া হয়ে নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে ; মা ভগবতীর আগমনে

সর্বত্রই আনন্দে পরিপূর্ণ। বিদেশী চাকরেরা সব “মাল্ভরা” ব্যাগ নিয়ে বাড়ি এসেছেন; পূজোর আমোদের সঙ্গে সঙ্গেই যত সন্ধ্যার আগমন হতেছে, তত তাঁদেরও আনন্দ বাড়চে, তাঁরা সদানন্দে প্রিয়তমার সহিত মধুপানে বামিনী-যাপন করবেন, কেউ বা ছুঁচো ধরে খাবেন। দেশের ছেলেরা নূতন শান্তিপুরে ধুতি ও ডুরে উড়ুনির বাহার দিয়ে, খাতায় ঘুরচে, ক্ষুদে ছেলেরা সাজ পরে ল্যাজ-ওয়ালা পাগড়ি মাথায় দিয়ে, গুরিয়া পুতুলের মত ঘুর করে বেড়াচ্ছে। গয়লা, ছুতোর, কামার ও কুমারেরা কালাপেড়ে কোরা ধুতি ও ধোয়া মলমলের চাদর গায় দিয়ে চুল ফিরিয়ে বাবু সেজে বাহার মারচে। আজি তাদের ভারি আনন্দ, “আমাদের বাবুদের বাড়ি ছুগোৎসব!”

প্রায় ছ-শ বৎসর হলো, আমাদের বাবুর পিতামহ নবাবের সরকারে চাকরি করে বেশ দশ টাকার সংগতি করে যান, তার পর স্বর্গীয় কঠীমহাশয়ও নানা কলে কোশলে তা হতে বেশ রোজগার করেন; করে, একখানি তালুক ও কিকিৎ জমি জমাৎ ও আবাদ করে যোত্রাপন্ন হয়ে উঠেন, কাজেই দোল ছুগোৎসব রাস প্রভৃতি ঝাঁক দিড়েন না। আমাদের বাবু বিলক্ষণ হিন্দু, সুতরাং তাঁকেও পৈতৃক প্রথা অনুসারে সে সকলিই কর্তে হয়, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগকেও বিদেয় আদায় দিতে হয়। এ ছাড়া সময়ে সময়ে বলাৎকার ও দাঙ্গাহেঙ্গামায়ও কিছু কিছু জরিমানা ব্যয় করে থাকেন। পূজোবাড়ির উঠানে পাইল খাটিয়ে তাতে সব ঝাড় লগ্নন টাঙান হয়েছে, লোকজন সব শশব্যস্ত, কেউ বা প্রতিমার সাজ পরাবার যা বাকি ছিল, পরিয়ে দিচ্ছে, কেউ সিংগির ঘাড়ের কেশর করে দেবে বলে তুলোতে সিঁহর মাখাচ্ছে, কেউ বা কার্ত্তিকের গোঁপ করে দিচ্ছে, আর বলচে, দেখ, যেমন কার্ত্তিক, তার তেমনি মোঁচা গোঁপ হয়েছে। এদিকে বিকাল হয়ে আসতে লাগলো, সূর্য্যদেব দেখলেন, লোকের আমোদ ভঙ্গ হয়, তাই ক্রমে ক্রমে আপনার তেজ গুড়িয়ে নিতে লাগলেন। ঢাকী ঢুলীরা ডাল ভাত খেয়ে, একবার সজোরে বাজিয়ে উঠলো। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ছুটোছুটি করে বাদি শুনতে এলো। ক্রমে পূজোবাড়ি লোকারণ্য। এমন সময় আমাদের বাবুদের বাড়িতে নহবৎ বেজে উঠলো। বাবুর বাড়ি পূজো, বড় জাঁক, ১৫ দিন থেকে নহবৎ বসেছে। এখানে লুচিমণ্ডার অভাব নেই, সাত দিন থেকে ভিয়েন চলছে, অনবরত মিষ্টান্ন তয়ের হচ্ছে। এখানে শুধু লুচিমণ্ডা কেন, খুঁজলে “বিফ্টিক” পর্য্যন্ত মিলে। আমাদের বাবু গোঁড়া হিন্দু, এ কথা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু ছোটবাবু “বেশ্ম”। এমন কি স্বয়ং দেশে একটি ব্রাহ্মসমাজ করেছেন। রামমোহন রায়, দেবেঙ্গনাথ ঠাকুর ও কেশব

ক্রমে সক্ষা উপস্থিত। সজোরে নহবৎ বেজে উঠলো, ফরাসী গ্রাস সাক করে তেল দিয়ে বাতি জ্বলে দিবার উদ্যোগ কর্তে লাগলো, পুজার দালান, ধুনীর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। এ দিগে ছোটবাবুর বৈঠকখানা ইয়ারগোছের ব্রাহ্মসমাজের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ। তিনি সময় বয়ে যায় দেখে গ্রাস, জল ও কাক্কুর জন্ত চাকরদের গালাগালি দিতে লাগলেন, এই সকল দেখে শুনে দিনমণি লজ্জায় আশ্তেং গাছের আগুডালেং ক্রমেং সরে পড়লেন; বঙ্গভূমি জ্বলেদের এই সকল ব্যাভার দেখে “কুলে কালি দিলে” বুঝে, ভাবতেং কাল হয়ে গেলেন; পাখিরে সব “হুও” দিতে লাগলো; চাঁদ এই সময় তামাসা দেখবার জন্তে জানালা দিয়ে এক একবার উঁকি মারতে লাগলেন, আর হাসতে থাকলেন। এমন সময় পুরোহিত মহাশয় তন্ত্রধার সঙ্গে বাবুর বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বাবুর কাছ থেকে হবিয়েের পয়সা নিয়ে গিয়ে দিকি মাছ ভাত খেয়ে বোধন কর্তে এলেন। প্রথমে পা ধুয়ে বেলগাছে বোধন সেরে “ওঁ শ্যশানানলদক্ষৌসি পরিভ্যন্তোসি বান্ধবৈঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীরমম্ভ স্নাহি ইদং পিব” মন্ত্র বলে প্রতিমার চক্ষুদান করে বরণ করলেন। যাবার সময় বাড়ির গিন্নীকে বলে গেলেন, কাল সকালং যেন উদ্যোগ হয়, প্রাতেই নবপত্রিকা স্নান। বাড়ির মেয়েরা বড় ব্যস্ত! কেউ পাঁচ কলাই ভিজ্জছে, কেউ কটরা ধুচ্ছে, কেউ অধিবাসের উদ্যোগ

করচে, কেউ বা নদীর জল, স্রোতের জল, পর্বতমুস্তিকা, বেণ্ডাধারমুস্তিকা, এই সকল ভাগ করে রাখচে। আমাদের বাবু দালানে বসে ভক্তিতাবে মা ভগবতীর চাঁদবদন নিরীক্ষণ করছেন, আর ছ চার বেটা বরাথুরে “আহা! মার যে মূর্তি, এমন কখন দেখি নি, বাবু! প্রতিমা যা, তা আপনার বাড়িই হয়ে থাকে, এমন প্রতিমে আর কোথাও দেখি নি। বেটা কুমোর যেমন চোখ চান্কেচে, তেমনি মুখশ্রী করেছে, আর চালচিন্তিরও তেমনি হয়েছে” বলচে, তাই অবাক হয়ে শুনছেন, আর আপনাকে ধ্যুস্তান করছেন। এদিকে ছোট বাবুর বৈঠকখানায় তবলায় চাঁটি পড়চে, আর “শিবাবাং”! শব্দ উঠছে। ক্রমে বাবুর বৈঠকখানার ঘড়িতে টুন করে দশটা বেজে গেল, বড়বাবুরও মৌতাতের সময় হয়ে হয়ে এলো। বড়বাবু নিজে দলপতি, দলস্থ ও গ্রামস্থ বামুন কয়েতদের জাত রাখবার ও জাত মারবার কর্তা। সে দিন এক জন ব্রাহ্মণের ছেলে কল্কেতায় এসে মুসলমানের দোকানে পাঁউরুটি খেয়েছিল, তাইতে তাকে খুঁটান বলে, তার বাপকে জাতিভ্রষ্ট করেছেন; আর রামকেষ্ট বোস দানাপুরে কেরানিগিরি কর্তেন, তিনি সেখানে তাঁর ছোট মেয়েটিকে স্কুলে পড়িয়েছিলেন, আর বিবিদের মত ঘাঘরা পরাতেন, তাইতে তিনি পূজার সময় বাড়ি এলে তাঁকে দলচ্যুত করেছেন। অতএব বড়বাবু তো সকলের সামনে মৌতাত ভাজতে পারেন না, সুতরাং দশটা বাজতেই তিনি মোসায়বদের বিদেয় দিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। এমন সময় ঘড়ি ঘড়ি শব্দে দুখানি গরুর গাড়ি বাবুর বাড়ির দরজায় লাগলো। বাবুরা গাড়ি থেকে “খাড়া রও” বলে একেবারে টেঁচিয়ে উঠলেন; বোধ হলো যেন কাকে গঙ্গাযাত্রা করান হচ্ছে। ক্রমে তা হতে চার জন বাবু নামলেন; আর চার জন সেই গরুর গাড়ির উপরেই চিৎপাত হয়ে ছক্কেফেনিভ শয্যায় আয়েস মিটুচ্ছেন; এমন কি, যদি গাড়োয়ান ছজন ও বাবুর বাড়ির দরওয়ান না থাকতো, তা হলে বাবুদিগকে রাত্রির মত সে সুখ থেকে বঞ্চিত করা কারো সাধ্য হত না। বাবুরা গাড়ি থেকে নামলেন বটে, কিন্তু কারো বা শামলা গড়াগড়ি দিচ্ছে, কারো মোজা ঝুলছে, কারো বা এক পাটি জুতাই পাওয়া যাচ্ছে না। এঁরা সব কল্কেতার বাবু! এর মধ্যে মাছের টক ও কাঠের পুতুলও আছেন। এঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন!!! সকলেরই এক একটি কার্পেটের ব্যাগ আছে, তার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড প্যাট্রার ত্রায় চামড়ার ব্যাগ, তাতেই “নম্বর ওয়ান” এক ডজন রেশু। কেবল তিনটি পথঘরচ হয়েছে এই মাত্র!!

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত থাকতে পারেন, সকল পল্লীগ্রামে ঘোড়ার

গাড়ি বা পালকি পাওয়া যায় না ; তবে রেইলওয়ের কল্যাণে অনেক গ্রামেই এক একটি পাকা রাস্তা হয়েছে, কিন্তু, সেই রাস্তা থেকে ছই এক মাইল ভিন্ন দিকে যেতে হলেই বর্ষাকালে কাদা জলে কষ্ট পেতে হয়, সুতরাং আমাদের কল্কেতার বাবুরা পথের মধ্যে গরুর গাড়ি পেয়ে তাই ভাড়া করেই এসেছিলেন। পাড়গেয়ে ছেলেরা সহরেরদের চেয়েও ফচকে। সহরে ছেলেরা স্কুলের ভয়ে “মাথাব্যথা, গা বমি বমি” বলে পান্ন পায়, কিন্তু পাড়গেয়ে ছেলেরা বাঁশ-বনে বা কচু-ঝোপে লুকিয়ে থাকে। “সে দিন এক জন পাড়গেয়ে ছেলে পণ্ডিতকে জ্ঞান করবার জন্তে চেয়ারের পেছনে একটি প্রেক্ পুতে রেখেছিল ; পণ্ডিত মহাশয় যেমন চেয়ারে ঠেস দিয়ে টেবিলে পা রেখে ঘুমুছেন, অমনি আশ্বেৎ সে তাঁর টিকিটি ধরে প্রেকে বেঁধে সামনে গিয়ে “তানা নানা” করে চৌঁচিয়ে উঠেছে ; পণ্ডিত মশার ঘুম ভেঙ্গে গেল, তিনি যেমন তাড়াতাড়ি তাকে মারতে যাবেন, অমনি তাঁর টিকিটি ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে গেল, ছেলেরা হেসে উঠলো ; পণ্ডিত মশায় অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়লেন।” এ সব বদমাইশি সহরের ছেলেরা বড় জানেন না। যা হোক, সেই পাড়ার যত বওয়াটে ছেলে বাবুদের এই অবস্থা দেখে হাততালি আর হাসি টিটকিরি দিতে লাগলো। বাবুরা রেগে টং, মারতে উঠলেন, কিন্তু ক্ষমতা নাই, কাজেই তাঁদের মনের আগুন মনে রইল, “ছাষ্টি ভিলেজ গোটু হেল্” বলতে বলতে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। এদিকে ছোটবাবু কল্কেতার বাবুদের আগমনবার্তা পেয়েই অমনি “মধুবাভা” পড়ে, দাঁড়া গো পান দেবার জন্তে সিঁড়ি পর্যন্ত ছুটে এলেন, আর “হেল্লো গুড মর্নিং” বলে অভ্যর্থনা করলেন, আমাদের সীমা নাই, এতক্ষণের পর পূজাটা সার্থক হলো। ক্রমে আমোদ গড়বার উদ্যোগ হতে লাগলো, প্রথম চৌঁচামেচি, গোলমাল, গালাগালির পর আর কে কারে দেখে, সকলেই “পপাত ধরগী-তলে।” এতক্ষণ কাহারও বা বানরের মত ছটফটানি ধরেছিল, কেউ বা সিংহের মত ভর্জন গর্জন করছিলেন, ক্রমে সকলেই কুস্তকর্ণের পালা গেয়ে দিলেন।

পাঠকগণ, সময়ের হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, কালও যেমন গেছে, আজও তেমনি যাচ্ছে, কালও তেমনি যাবে। সময় ভালও নয়, মন্দও নয়, অল্পও নয়, অধিকও নয় ; চিরকালই সমভাবে চলে আসচে। তবে লোকে ভ্রমবশতই বলে থাকে, সূর্যের সময় শিগ্গির যায়, আর দুঃখের সময়ের অবধি নাই। বাস্তবিক মনুষ্যজীবনে একরূপ ভ্রম হয়েই থাকে। সুতরাং এই আমোদে আজকের রাতটি যেন এক মুহূর্তের মত কেটে গেল। ইয়ারকির আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই নিশানাথ অস্ত গেলেন, কুমুদিনী নাথের তর্কশা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন। অন্ধকার

স্থিরভাবে এতক্ষণ বাবুদের খেমটা নাচ দেখছিলেন ও “শিরিত চিনেছ ভাল কোলা বেঙ” গান শুনছিলেন, কিন্তু যেই “মলিন বদন কেন রে তোর হেরি রে বাপ বাতুমণি” শুনেছেন, অমনি আর সামনে থাকতে না পেরে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে জলের জালা আর পুজোবাড়ির ভাঁড়ার ঘরে লুকুলেন। কমলিনী ঘোমটা খুলে মুচকে হেসে হাতছানি দিয়ে প্রাণনাথকে ডেকে তামাশা দেখাতে লাগলেন, সূর্য্যদেবও বাবুদের বাদরামো দেখে রেগেই যেন রাঙা হয়ে উঠলেন, পাখিগুলো “যেমন কর্ত্ত তেমনি কল” বলতে বলতে চলে গেল, আমাদের বাবুর বাড়িরও নবপত্রিকা স্নানের সময় হয়ে এলো। সজ্জোর ঢাক ঢোল বেজে উঠলো, নহবতের রকমারি বোল বাজতে লাগলো, ছোট ছোট ছেলেরা ঘুমে থেকে উঠে নেংটা হয়েই পুজোবাড়ির উঠানে জমতে লাগলো, তাদের আর কাপড় পরবার অবকাশ হলো না। পুরুত-ঠাকুর তাড়াতাড়ি এসে কলাগাছ, হলুদগাছ প্রভৃতি একত্রে বেঁধে জোড়া বেলের পীনপয়োধর করে, নবপত্রিকা ঘাড়ে নিয়ে বাজনা বাজিয়ে গঙ্গায় স্নান করাতে চল্লেন। ছেলেরা শাঁখ ঘণ্টা কঁাসি নিয়ে পেছনে বাজাতে চল্লো। ক্রমে গঙ্গাতীরে লোকারণ্য! ঘোষেদের বোসেদের মুখুষ্যেদেরও নবপত্রিকা এসে জুটলো, ঢাকঢোলের বাদি, ছোঁড়াদের চীৎকার আর কঁাসি ঘণ্টার শব্দে একেবারে নভঃস্থল যেন বিদীর্ণ হয়ে উঠলো ও গঙ্গার ওপার থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে যেন “বাহবা” দিতে লাগলো। ক্রমে সহস্র কলসী ও সর্ব্বোষধি মহোষধির জলে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে শাড়ি পরিয়ে তাঁকে “কলাবো” করে দুর্গাপ্রতিমের গণেশের পাশে বেঁধে দেওয়া হলো।

আজি মঙ্গলবার, সপ্তমী পূজা। লোকের আমোদের সীমা পরিসীমা নাই। এক বৎসরের পর মা এসেছেন!!! পুরোহিত মশায় পূজার উদ্যোগ করে, আসন-শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অঙ্গস্থাস, করাজস্থাস প্রভৃতি ক্রমশঃ সমাপন করে, রাই দিয়ে ভূত ঝাড়িয়ে, আবরণ দেবতা পূজা করে, প্রতিমাস্থ দেবদেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা চক্ষুর্দান করতে লাগলেন। তদ্ব্যধার মড়ুই-পোড়া বায়ুনের মত চৌচিয়ে চৌচিয়ে মন্ত্র পড়াতে লেগেছেন। তার পর যথাক্রমে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, সিংহ, অশুর, সর্প, মহিষ, ইন্দুর, ময়ূর, প্রভৃতি সকলেরই পূজা সারলেন। “ছিড্ডিং শা ডিং ডিং” ঢাকের বোল বেজে উঠলো। একটি প্রকাণ্ড খাসী বলিদান হয়ে গেল! শেষে অঞ্জলি দেবার সময় উপস্থিত। বাইরের দালানে লোকারণ্য! নিমজ্জিত, অনাহৃত ও দর্শকমণ্ডলীতে বহির্বাটা ব্যাপ্ত! তথাপি বাড়ির কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা, সকলকেই আজ লজ্জা ছেড়ে দালানে অঞ্জলি দিতে হয়। তাতে

কোন দোষ নেই, আর অন্তঃপুরে মেয়েরা বই পড়লিই যত দোষ হয়। এঁরা এই রকম সভ্যতাই ব্যবহার করে থাকেন। হা বঙ্গভূমি! একবার চেয়ে দেখ, তোমার ছেলেরা কেমন করে তোমার মুখ উজ্জ্বল করচে!!! প্রথমে বাড়ির কর্তাকে অঞ্জলি দিতে হয়, কাজেই বাড়ির ভেতর খবর গেলো। বাবু উঠবেন কি, তিনটে রাত্রে শয়ন করেছেন, একটা “সামগ্রী” উঠে গিয়েছে! হাতে মুখে আমাদের তারকেখরের ব্রাহ্মণের রসুয় করা “বাইপেডের কারি” শুকুচে। যা হোক, কষ্টে অষ্টে তো বাবু উঠলেন, উঠলে কি হয়, তখনও চোখ ঢুলু ঢুলু করচে, এখনও কথার আড় মরে নি, ঘুমে থেকে উঠে এক হিলিম তামাক খেতেই নেশাটি আবার ভরপুর হয়ে এলো। ধোঁয়ারির মুখ, গা মাটি মাটি করচে, হাই উঠচে ও পিপাসায় কঠ তালু শুক হয়ে যাচ্ছে। কি করেন, তিন পুরুষের পূজো। মুখে জল দিয়ে লবঙ্গ এলাচ চিবুতে২ ঢেলীর জোড় পরে অঞ্জলি দিতে দালানে উপস্থিত হলেন। বলিদানের পাঠাটি জয়হরি তর্কালঙ্কারের বার্ষিক ছিল, কিন্তু “খাসী” বলে আর দেওয়া হলো না, কাজেই দুপুরবেলার কাজের জন্তে নিমখালা রকমের রোষ্ট কর্তে বলে দিলেন। ক্রমে অঞ্জলির ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে মাগীদের রজা কমে গেলে পূজক মহাশয় নাকি সুরে “দেবীমাহাত্ম্য (চণ্ডী)” পাঠ কর্তে আরম্ভ করলেন। বামন ভোজন, বাবু ভোজন ক্রমে সম্পন্ন হলে, চাষা লোকদের নারিকেল লাড়ু দান করা হলো, কাঙালী বিদেয়ের পর কাঙালী ভোজন আরম্ভ হলো; কোন পাতে ভাত পড়লো, কোন পাতে ডাল পড়লো, কেউ বা “সর্বনাশ হোক দুটি খেতে দিলে না” বলতে লাগলো। চার দিকে ভাতে ভাত! এইরূপে কাঙালী খাওয়াতে২ ক্রমে বেলা অবসান। সন্ধ্যাবধু পতিবিরহে মলিন হয়ে গেলেন, কিন্তু যেই চন্দ্রকে বেশভূষায় ভূষিত হয়ে উঠতে দেখলেন, তখন আর তিনি থাকতে না পেরে শুক্ল বস্ত্রে অবগুষ্ঠিত হয়ে এখনকার ত্রীলোকদিগের সতীত্ব যে কেমন ক্ষণ-ভঙ্গুর তাই দেখাবার জন্তে অভিসারিকা বেশ ধারণ করলেন, তারাগণও তাঁর সতীত্বের এই অবসান দেখে, হাসতে লাগলেন। এমন সময় বাবুর বাড়ি সন্ধ্যার আরতি-মূচক শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসি, ঢাক, ঢোল ও নহবৎ বেজে উঠলো। মেদিনী কম্পমান! ধূপ ধূনার গন্ধ ও ধোঁয়াতে একেবারে যেন মাতিয়ে তুলে। পুরুত মশায় প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ, কপূরের দীপ, অনন্তর পানিশিখ, বস্ত্র, ও আম্রপল্লব ছুর্গার সম্মুখে আন্দোলন করে আরতি সমাপন করলেন, আবাণ-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ভক্তিভাবে প্রণাম করে। তার পর প্রসাদী সামগ্রী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লয়েই সকলে বিদেয় হলো। এদিকের গোল চুকলো; এখন কেবল

বাবুদের বৈঠকখানায় “ইয়ার ভেজের” উজোগ হতে লাগলো। বাড়িতে “গোপালে অধিকারীর” যাত্রা। ফুরোন নেই, পেলায় যা হয়, এই তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত। কাজেই তারা রাত ৯টা বাজতে বাজতেই আসরে নেমে খোল কতালে টাটি দিতে লাগলো। ইদিকে বাবুর বৈঠকখানায় কেউ বা ভক্তিতাবে “গির্জের” করছিলেন, কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁর জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল, সুতরাং সেই মখমলের বিছানাতেই তিনি “প্লিজ্ লেট্ মি গো আউট” করে ফেলেন; অজ্ঞাত বাবুরা “বাবা! কিন্তু বলো না, হকোর জল পড়চে” বলে হোররা দিতে লাগলেন। পাঠকগণ, আমরা আজকে বাবুদের সব রকম সুখ ও সব রকম দুঃখ দেখে নয়ন সার্থক করেছি, কেবল একটা বিষয়ে বাবুদের অজ্ঞহীন ছিল, আমরা তাঁদের ইয়ারকি মহলে “সব্ চুলো” দেখি নি, তবে যদি সময় বুঝে আনা হয়ে থাকে তো, জানতে পারি নে। যা হোক যখন আমরা তা দেখতে পাই নে, তখন আপনারা কোথেকে দেখবেন, কাজেই এঁটিতে ক্ষোভ রেখে দিন।

এরূপ বাবুর বাড়িতে যাত্রা হলে যে কত রগড় হয়, তা পাঠকদের অগোচর নেই। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ বা দেখে শুনে বিজ্ঞ হয়েছেন, কেউ কেউ বা স্বয়ং ভুক্তভোগী আছেন। তবে আমরা কোন কথা বলতে গেলেই যেন গায়ে লাগে, তা তজ্জ্ঞ আমাদিগকে মাপ করবেন। বৈঠকখানায় বাবুদের গট্‌রা চলতেছে, এমন সময়ে আসরে কেট্টো নামলেন! আর বাবুদের রাখে কে? অম্নি নেমে এসে “বাবা রে হনু! তুই লঙ্কা পোড়ালি কেমন করে বল্?” বলে চোঁচাতে লাগলেন। শুনেই অধিকারীর চক্ষুস্থির!! কোথায় মানভঞ্জন, আর কোথায় লঙ্কাকাণ্ড! কি করে, অধিকারী কাজেই আপনি হনুমান সেজে দেখা দিলেন। তখন আর পেলায় ভাবনা রইল না। গ্রামের মেয়ে ছেলেরা যাত্রা শুনে এসেছিল, এসে তারা বাবুদের মজাই দেখতে লাগলো! ক্রমে বাবুদের ভাব গাঢ় হয়ে এলো। সুতরাং সকলেই হাত ধরাধরি করে হনুকে ঘেরে নাচতে লাগলেন। তাই দেখে দর্শকেরা ছিঃ কণ্ঠেঃ চলে গেল, যাত্রাও বেদব্যাসের বিজ্ঞান দিলে। ইতি সপ্তমী পূজার পালা শেষ।

আজ বুধবার অষ্টমী। কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার দিন। অনেক পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মসমাজে বড় সমাজের অনুকরণে আজকেই উপাসনা হয়ে থাকে। আমাদের ছোটবাবুও আরতির পর সমাজে যাবেন। অষ্টমী পূজাটি ঠিক সপ্তমীর মত; কেবল চতুঃষষ্টি-যোগিনীর পূজা বেশীর ভাগ। আর অষ্টমীর মহান্বানের প্রণালীটি ঠিক যেন কলার্বো স্নান। আজ আবার অষ্টমী ও নবমীর সন্ধি সময়ে

একটি পূজা হয়ে থাকে, তার নাম সন্ধিপূজা। এতেও সপ্তমী অষ্টমীর ত্যায় এঁ পূজা হয়, বলিদান হয়, আর দীপমালা প্রদান কর্তে হয়, তা আমাদের বাবুর বাড়ি তার কোন অঙ্গহীন হলো না, সকলেই যথাক্রমে সম্পন্ন হয়েছিল। বলতে গেলে পাছে পুনরুজ্জ্বল হয়, তাইতেই ক্ষান্ত হওয়া গেল।

২৮শে বৃহস্পতিবার। আজ নবমী। পূজার শেষ দিন!! পুরোহিতেরও কষ্টের অবসানের দিন!! আজ পূজা ও বলিদানের পর কাদামাটির সঙ্গে বাঙ্গালিদের সভ্যতার পরিচয় হয়ে থাকে। যঁারা আপিসে “আমি হিঁ ছয়ানি মানি নি, আমার কোন প্রেজুডিস নেই” বলে সায়েবদের সঙ্গে খানা খেয়েছেন, তাঁরা আজি কোমর বেঁধে কাদা মেখে কাদামাটি করবেন। “হিন্দুদের কুসংস্কার গেল না” বলে যঁরা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে দেশের লোককে “এনলাইটেন্” কর্তে চান, তাঁদের মধ্যেও কাউকেই আজকের কাদায় দেখতে পাই। হায়! এই রকম লোক হতেই বাঙ্গালিদের “হিপোক্রিট” নামটি সৃষ্টি হয়েছে!! এদিকে বাবুর বাড়ি পূজা হোম শেষ হলে বলিদানের উয়ুগ হতে লাগলো। আজ ভারি ধুম!! অসংখ্য বলিদান। প্রথমে মহিষ, তার পর ১০টি পাঠা, কুমড়ো, আক, শশা পর্যন্ত বলিদান হয়ে গেলো। বাজনার তাল ফিরলো, আরতির পর নাচের বাদি বেজে উঠলো। অমনি সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ। মহিষ ছাগলের রক্ত, আর হাড়িকাটের মাটি, এই নিয়ে কাদা করে, বড়বাবু থেকে ক্ষুদেই ছেলে পর্যন্ত সকলেই নৃত্য কর্তে আরম্ভ করলে। “ও মা দিগম্বরী নাচো গো” বোল বেরুতে লাগলো; ক্রমে রক্তে গড়াগড়ি। তার উপর বাড়ির চাকর ছ-কলসী জল ঢেলে দিলে, এই নৃত্য বেড়ে গেল; এমন কি, সে সময় যদি কোন ইংরাজ তার নকশা তুলে নিতেন, তো বাঙ্গালিদের উপর তাঁদের যা কিছু ভক্তি আছে, তাও উড়ে যেত। এইরূপে বাজনার তালেই নৃত্য করে আর গান গেয়ে বাবুরা গ্রামের যত পূজাবাড়ি, সর্ব্বত্রই কাদা করে শ্রীচূর্ণার শ্রীতিসাধন করে বেড়াতে লাগলেন। সূর্য্যদেব আর থাকতে না পেরে মজা দেখবার জন্তে মাথার উপর উঠলেন, পাখিগুলো ছুঁখে নিস্তক হয়ে বাসায় বসে রইল, পবনদেব ক্রোধে ভেংচাতেই অগ্নিবৃষ্টি কর্তে লাগলেন, বাবুদের মোসায়েবদের মত ধুলোগুলো সূর্য্যের তেজে তেতে উঠে লোকের কণ্টকস্বরূপ হয়ে উঠলো। শরতের মেঘ এতক্ষণ লুকিয়েই তামাশা দেখছিলেন, শেষে ছোটলোকের এই আশ্পর্ক দেখে, ধনবানের ছরবস্ত্রের সময় চিরানুগত মোসায়েবদের যে কত দূর অবস্থান্তর হয়, তাই দেখবার জন্তেই যেন ধুলোকে কাদা করে দিয়ে চলে গেলেন। আমাদের বাবুরাও ক্রমে

কাদা সেরে স্নান করে সকলে ঘরে ফিরে এলেন। গ্রামের ছেলেপুলেরা বারা বারা সঙ্গে কাদা করেছিল তাদের এক এক কাপড় ও এক এক গামছা দিয়ে সকলকেই বিদেয় করে দেওয়া হলো।

হা বঙ্গবাসিগণ! তোমরা এইরূপেই আপনাদিগকে সত্য বলে পরিচয় দিয়ে থাক! যাঁদের ধর্ম কর্ম এইরূপ, যাঁদের আমোদ প্রমোদের প্রশালী এই, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এইরূপ হিপক্ৰিট, তাঁরা আবার সত্য বলে পরিচয় দেন। ইংরাজদের স্নেহ বলেন! আর আপনাদের জাতির গৌরব করেন!! তোমাদের মধ্যে যাঁরা প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁরা বাহিরে হরিনামের তান দেখিয়ে গোপনে যাবদীয় ঘৃণিত কর্মে আসক্ত হয়ে থাকেন; আর যাঁরা নব্যসম্প্রদায়, তাঁরা তো ইংরেজদের কাপি কর্তে গিয়ে মদ মুরগী খেয়ে মম্বুরপুচ্ছ-খারী দাঁড়কাকের জায়, প্রথম কাকের দল, শেষে ময়ূরের দল হতেও চ্যুত হচ্ছেন। এ সকল দেখে শুনেও কি তোমাদের মনে একটু লজ্জা বা ঘৃণার উদয় হয় না? তোমরা লেখাপড়া শিখে কোথায় স্বদেশের উন্নতি করবে, না মদ মুরগী খেয়ে “টুপভুজ্জ” হয়ে বলমাতার মুখে চূণ কালি দিচ্ছ। এই সকল শুনেই কি তোমরা উচ্চ উচ্চ পদ প্রার্থনা কর? এই ক্ষমতাতেই কি আপনাদিগকে রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত জ্ঞান কর? এই রকমেই কি জননী ভারতভূমির পরাধীনতা ক্রেশ নিবারণ করবে? অতএব তোমাদিগকে ধিক্! তোমাদের প্রকৃতিকে ধিক্! অহুষ্ঠানকে ধিক্! ও তোমাদের অল্পচিকীর্ষা-বৃত্তিকেও ধিক্!!! পাঠকগণ! আপনারা আজ আমাদের বাবুর বাড়ির ছুর্গোৎসবের এই নবমী পর্য্যন্তই শুনে বিগ্রাম লাভ করুন; কল্যা তখন বিজয়া দশমীর পালা গাওয়া যাবে। ইতি।

ইতি শ্রীঅবতারবিরচিতে আসমানের নকশাখ্যে কাব্যে

বাবুদের বাড়ির ছুর্গোৎসবের নবমীপূজা

সমাপ্তো নাম প্রথমঃ কয়ঃ।

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমাত্তোষ ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত

রামকবচ-রচিত : শিবায়ন—মূল্য ৭৮

শ্রীসঙ্গনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

অক্ষয়কুমার বড়াল গ্রন্থাবলী

মুদ্রিত রেক্সিনে বাঁধাই মূল্য—১৫৮

একা ৩৮, দ্বাদশ ২৮, ত্রয়োদশ ২৮, চতুর্দশ ২৮, বিবিধ ৪৮।

হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী

সমগ্র রচনাবলী ২ খণ্ডে মুদ্রিত রেক্সিনে বাঁধাই। মূল্য ২০৮

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসঙ্গনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

বঙ্কিমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী **রামেন্দুসুন্দর-রচনাবলী**

উপভাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা,

পাঁচ খণ্ডে মূল্য ৪৭৮

আট খণ্ডে মুদ্রিত রেক্সিনে বাঁধাই। মূল্য ৭২৮

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

পাঁচকড়ি-রচনাবলী

কাব্য, নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

অম্বুনা-মুদ্রাপ্য পত্রিকা হইতে নির্বাচিত

মুদ্রিত রেক্সিনে বাঁধাই। মূল্য ১৮৮

সংগ্রহ। দুই খণ্ডে। মূল্য ১২৮

ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

শরৎকুমারী-রচনাবলী

অন্নদামল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা

‘ভূতবিবাহ’ ও অন্যান্য সামাজিক চিত্র।

রেক্সিনে বাঁধানো ১০৮, কাগজের মলাট ৮৮

মূল্য ৬৪০

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

নাটক, প্রহসন, গল্প পত্র দুই খণ্ডে

সমগ্র বাংলা রচনাবলী। রেক্সিনে বাঁধাই

মুদ্রিত বাঁধাই। মূল্য ১৮৮

মূল্য ১৫৪০

ব্রজেনলাল-গ্রন্থাবলী

বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী

কবিতা, গান, হাসির গান। মূল্য ১০৮

বলেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী। ১২৪০

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সাহিত্যিক জীবনী ও বাংলা সাহিত্যের প্রামাণিক ইতিহাস (১ম-৮ম খণ্ড) একত্রে মূল্য ৪৫৮

বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল

যোগেশচন্দ্র রায় (বিভানিধি) প্রণীত নূতন পুস্তক। মূল্য ৫৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

